অবরুদ্ধ আদিম

বিমল সরকার

নাভানা
পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

প্রকাশক :
শ্রী কুনালকুমার রায়
নাভানা
পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট
কলকাতা ৯২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭০

মুদ্রক :
শ্রী আনন্দ মিত্র
নভীনা প্রিন্টিং ওআর্কস
৫৯ বি গড়পার রোড
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রী চারু খান

মুখবন্ধ

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব না থাকলেও তার সার্থক উদাহরণ বোধহয় আঙুলে গোনা যায়। সম্প্রতিকালে আদিবাসী-জীবনের কিছু সফল কাহিনী উপহার দিয়েছেন কয়েকজন কৃতী কথাসাহিত্যিক, —সেদিক থেকে আমার এই প্রচেষ্টা একেবারে আনকোরা নতুন-কিছু, এমন বিশিষ্টতার দাবি করি না; কিন্তু 'অবরুদ্ধ আদিম'-এ শাদা-কালোয় যে-আলেখ্যটি আমি আঁকবার চেষ্টা করেছি তা আদিবাসী-সাঁওতালদের ছকে-বাঁধা নিয়তি-নির্দিষ্ট জীবনযাপন নয়, প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমপরিবর্তনশীল পরিবেশে সংগ্রামী জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-মুক্তি, অবরুদ্ধ আদিমতার অতিবাস্তব ও অন্তরঙ্গ ছবি। কাহিনী কতটা সার্থক হয়েছে সে-বিচারের ভার রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাদের উপর।

একালের অগ্রগণ্য রুচিশীল প্রকাশক 'নাভানা' তাঁদের সুখ্যাত গ্রন্থকার-দের তালিকায় আমার মতো নতুন লেখককে অন্তর্ভুক্ত করায় উৎসাহিত হয়েছি, একথা বলাই বাহুল্য। এবং এর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই 'নাভানা'র অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট কবি শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর সমীচীন ও মূল্যবান পরামর্শের জন্যও আমি মুগ্ধ। 'নাভানা'র সুযোগ্য পরিচালক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত কুনালকুমার রায়ের কাছেও বইটি প্রকাশের জন্য আমি অশেষভাবে ঋণী। প্রুফ-সংশোধনে কল্যাণীয়া শ্রীমতী মমতা চাকী তৎপরতার সঙ্গে যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আমার বন্ধু ও সহকর্মী শ্রী অরুণশঙ্কর দাসের সহযোগিতাও স্মরণ করছি।

পরিশেষে আর-একজনের সার্বিক সহায়তার উল্লেখ না করলে এই মুখবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাণ্ডুলিপি-সহ আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীমতী লাবণ্য সরকারের। এক কথায় 'অবরুদ্ধ আদিম' যে তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবরোধ মুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারল তার কৃতিত্বের সিংহভাগ প্রেরণাদাত্রী শ্রীমতী সরকারের প্রাপ্য। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন বা ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। শুধু কামনা করি তাঁর ইচ্ছা ফলবতী হয়েছে দেখে তিনি যেন সুখী হন।

বিমল সরকার

শ্রাবন্তী, শতাব্দী, শুচিতা

এবং

বিদিশাকে

॥ এক ॥

সাগ্নিক মোরঘাটিতে পৌঁছে রুক্ষ আমগাছের সরু ডালের নিচে দাঁড়াল। কয়েক গজ দূরেই মাথা নিচু করে বসে আছে দমন। পাশেই ওর বড় ছেলে পিংরু বসে বসে কাঁদছে। ছোটটিকে আশপাশে কোথাও দেখা গেল না। অদূরে জ্বলছে তুলসীর চিতা।

সাগ্নিক কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও দমন মাথা তুলে তাকাল না। সাগ্নিকও ওকে ডাকল না। সে প্রথমে তাকিয়ে তাকিয়ে দমন আর ওর ছেলেকে দেখল, তারপর তাকিয়ে রইল অদূরে প্রজ্জ্বলিত তুলসীর চিতার দিকে।

দূর থেকেই হামরুরা ওকে দেখতে পেয়েছিল। সহকর্মীদের কিছু নির্দেশ দিয়ে হামরু সাগ্নিকের কাছে এগিয়ে চলল।

হামরুর বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। এই বয়েসের আর-পাঁচটা আদিবাসী পুরুষের মতোই তার শরীর যেমন নিরেট তেমনি মজবুত। হামরুই এখন পাড়ার বাঁবড়ে এবং হাড়াম—পুরোহিত এবং মোড়ল। ওকে ছাড়া পাড়ার কোনো অনুষ্ঠানই হয় না, হতে পারে না। ধর্মীয় এবং সামাজিক সমস্ত অনুষ্ঠানেই তার নেতৃত্ব অপরিহার্য। তার চেয়েও বড় কথা, হামরুই হ'ল দমনের আন্তরিকজন, নিকটতম সুহৃদ্। দমনের কাজকে হামরু নিজের কাজ বলেই মনে করে। দমন আর তার মধ্যে বন্ধুত্ব এত অন্তরঙ্গ যে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে কল্পনা করা যায় না।

মুখে এক টুকরো ম্লান আর করুণ হাসির রেখা ফুটিয়ে হামরু বলে, তুই আসছু মাষ্টরবাবু?

সাগ্নিক কিছু বলল না, নীরবে হামরুর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

হামরু আবার বলে, তুলসীয়ারে মোরা পুড়াইঠি মাষ্টরবাবু। অর্থাৎ

দুঃখের মধ্যেও এটা বলে হামরু যেন একটু গর্বিত হ'ল।

কিন্তু সাগ্নিক ওটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছে না। তুলসী কেন হঠাৎ মারা গেল, কি হয়েছিল তার—সাগ্নিক এইসবই ভাবছিল।

অবশ্য ওদের কাছে এটা তো একটা বড় ঘটনা। কবর দেওয়া আর পোড়ানোর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কাঠ সংগ্রহ করা ওদের কাছে এক বিরাট সমস্যা। শুকনো ডালপালা, খড়কুটো আর লতাপাতা কুড়িয়েই তো ওরা জ্বালানির প্রয়োজন মেটায়। একটা পূর্ণবয়স্ক সুগঠিত শরীর দাহ করতে হলে তো আর ওইসব দিয়ে হয় না, অনেক কাঠের দরকার হয়, যা সংগ্রহ করা ওদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। তাই তুলসীর অকাল মৃত্যুর বেদনা বুকে নিয়েও হামরু ওকথা না-বলে পারল না। সাগ্নিকও সেটা বুঝতে পারল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই সে বলল, এত কাঠ পেলি কোথায় ?

হামরু এবার ভারী গলায় ধীরে-ধীরে বলল, দমনার ওড়াকের জো-জো গাছটা মোরা কাটছি।

দমনের বাড়ির তেঁতুল গাছটা কেটে ওরা কাঠসংগ্রহ করেছে। হামরুর কণ্ঠস্বর শুনে সাগ্নিক বুঝতে পারল তেঁতুলগাছটা কাটতে হয়েছে বলেও সে রীতিমতো মর্মাহত। সেটাই স্বাভাবিক। তুলসীর মতো তার বাড়ির তেঁতুল গাছটাও ছিল ওদের খুব প্রিয়। সাগ্নিক হামরুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল তুলসী আর তার তেঁতুলগাছ উভয়ের অকাল মৃত্যুই ওর বুকে দারুণভাবে বেজেছে।

কিন্তু এসব কথা সাগ্নিক বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না। তুলসীর মৃত্যুর কারণ জানবার জন্য ভেতরে-ভেতরে সে দারুণভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। তাই হামরুকে অন্যকিছু বলবার সুযোগ না-দিয়ে এবার সে জিজ্ঞেস করল, তুলসী হঠাৎ কি করে মারা গেলরে হামরু, কী হয়েছিল তার ?

এর উত্তরে হামরু যা বলল তা শোনার জন্য সাগ্নিক আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে।

কিছুদিন আগে তুলসীর বাঁ-পায়ের পাতায় একটুখানি অসাড়তা নেমে এসেছিল। জায়গাটার চামড়াও যেন তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছিল। দিন-দিন এই অসাড়তা বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল। ব্যাপারটা অবশেষে তুলসী, দমন, হামরু এবং অন্যান্যদেরও ভাবিয়ে তুলল। সবার পরামর্শে তুলসী শেষপর্যন্ত রারানিচের কাছে যেতে বাধ্য হ'ল। কবিরাজ ওর পা ভালো করে দেখে বড়রুয়া বলে সন্দেহ করল। কবিরাজ কিছু রানও দিল। কিন্তু সে-অষুধে কোনো কাজ তো হ'লই না, বরং কয়েকদিন যেতে না-যেতে কুষ্ঠরোগের লক্ষণগুলি আরো প্রকট হয়ে দেখা দিল। তুলসী তখন এ-অঞ্চলের সেরা রারানিচ শ্যামচকের হিমু সোরেনের কাছে যায়। হিমু সোরেন ওকে পরীক্ষা করে রানের ব্যবস্থা করে দিল। তুলসী সেই অষুধ খেয়েছিল। ভালোও বোধ করতে থাকে একটু। দিন কয়েক আগেও সে হিমু সোরেনের কাছে গিয়েছিল, একমাসের রান নিয়ে এসেছিল, সেই রান সে খেয়েও চলছিল।

ঠিক এই সময়ে কানাইচকের খালে মাটি কাটতে যাবার ডাক এসে পৌঁছয় ওদের কাছে।

মাটিকাটা হবে টেস্ট-রিলিফ স্কিমে। টেস্ট-রিলিফ স্কিমে মাটিকাটার কাজ এসব অঞ্চলে মূলত আদিবাসীরাই করে থাকে। এসব কাজ সাধারণত অনেকদিন ধরে চলে, যারা কাজ করে তারা বেশ কিছুদিন আর বেকার থাকে না। শিউলী গাঁয়ের অনেকেই যাবে কাজ করতে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। অতএব তুলসীরও যাওয়ার কথা। দমন ওকে বাধা দেয়, ওর অসুখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওকে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেকগুলো টাকা আসবে ঘরে, এই যুক্তিতে তুলসী দমনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। প্রস্তুতির সঙ্গে-সঙ্গে একটা সমস্যা কিন্তু তুলসীকেও ভাবিয়ে তুলছিল।

যতদিন কাজ চলবে সবাই সেখানেই থাকবে, কেউই বাড়ি আসবে না, কাজ শেষ করে একবারেই আসবে। তুলসীও আসতে পারবে না। তাহলে তুলসীর রান খাওয়ার কি হবে? রান কি সে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

সেখানে গিয়েও কি নিয়মিত ওকে অষুধ খেতে হবে? সেটা তো হবে আর-এক ঝামেলা। সেখানে সে রান রাখবে কোথায়? নষ্ট হবে না তো? ঠিকঠাক মনে করে অষুধ খাওয়া হবে তো?

রান-খাওয়া সংক্রান্ত এইসব সমস্যার কথা বলেও দমন ওকে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু তুলসী কোনো কথা শুনল না। উপরন্তু যাওয়ার আগের দিন রেতের বিলায় সে এক অভিনব পদ্ধতিতে রান-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলল। সব রানই সে উদরস্থ করল। ভাবল, প্রতিদিন নিয়মিত খাওয়াও যা, একরাত্রে বিরতি দিয়ে দিয়ে খেয়ে নেওয়াও তাই। পরের দিন সিতাকবিলা ওরা কানাইচকে চলে গেল।

হামরুর কথকতার মাঝে গুটি-গুটি পায়ে আরো অনেকে এসে হাজির হয়েছে। মাতাল এসেছে, এসেছে ছোটকটাই আর ট্যাংরা। তিনজনেই হামরু আর দমনের বন্ধু।

আর এসেছে বয়স্ক পূরণ। পাড়ার বাঁবড়ে না-হওয়া সত্ত্বেও বয়সের জন্য পূরণকে ওরা সম্মান দেয়। হামরু তিন বন্ধুকে দেখিয়ে সাগ্নিককে বলে, সিখানকে কি-টা হয়ে মরছে সিটা তুই উয়াদের কাছ থাকতে জানে লে মাষ্টরবাবু।

হামরুর বলা পরের দিন মানে হ'ল গতকাল। গতকাল প্রত্যুষেই ওরা কানাইচকে গিয়েছিল। তুলসীও। মাটি কাটার কাজে পুরুষরা সাধারণত কোদাল চালায়, আর ঝুড়িতে করে মাটি বহনের কাজ করে মেয়েরা। অন্যান্য কুড়ি-বহুদের সাথে তুলসীও সেই মাটি বহনের কাজ শুরু করল।

কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তুলসী কয়েকবার তালাউ গেল, ইজও হ'ল কয়েকবার। এই পায়খানা আর বমি দেখে তুলসীর নিজেরও ভালো লাগল না। মাঝে মাঝে পেটে হামো অনুভব করল। বেশ জোর ব্যথা বোধ করল। এমনি করেই চলল সারাটা দিন।

তখনো কেউ বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে। আয়ুপ-বিলায় অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। যেমন তালাউ তেমনি ইজ, পেটে অসহনীয় হামো। সারা হোড়মো ওজো হয়ে উঠতে লাগল, ফুলে

উঠতে লাগল। গায়ে প্রবল ব্যথা, ধুম জ্বর। মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে তুলসী। ওকে দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। কোনোক্রমে রাতটুকু অতিবাহিত করে আজ সিতাকবিলা ডুলিতে করে ওরা তুলসীকে ওড়াকে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

এসব কথা বলছিল মাতাল, ছোটকটাই আর ট্যাংরা। এই পর্যন্ত বলা হতেই ওরা থেমে যায়, হামরুই আবার বলতে থাকে।

ওরা যখন ওড়াকে এসে পৌঁছল, তুলসীর অবস্থা তখন করুণ, প্রাণশক্তি নিঃশেষিত প্রায়। দমনের সঙ্গে দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করল বটে কিন্তু পারল না, সেই যে চোখ বুজল, সে-চোখ আর মেলেনি। রারানিচ বা ডাকদার ডাকার কোনো সুযোগই ওরা পায়নি।

তুলসীয়ার গচ্ হ'ল। এটা যে একটা লেলহা মায়জিউর কাণ্ড, এই কঠোর মন্তব্য দিয়েই হামরু তার বক্তব্য শেষ করল। মাতাল, ট্যাংরা, ছোটকটাই এমন কি বয়স্ক পূরণও হামরুকে সমর্থন করল।

ওদের এরূপ কঠোর মন্তব্য শুনে সাগ্নিক কিচ্ছুটি বলল না। অদূরে প্রজ্জ্বলিত তুলসীর চিতার দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল, সত্যি কি তুলসী অতোটা বোকা ছিল? তার সম্পর্কে আজ যারা এত কঠোর মন্তব্য করছে এঁদের চেয়ে তুলসীর বুদ্ধি কি এতটুকু কম ছিল? সাঁওতাল পাড়ার কেউ কি কোনোদিন এমনি ধারণা পোষণ করতে পেরেছে? না, মাতাল, ট্যাংরা, ছোটকটাই, বয়স্ক পূরণ, হামরু, এমনকি পূরণের ছেলে ওই যাদু যার ভালো নাম অশোককুমার টুডু এবং যে এবার গোবিন্দপুর ইস্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে মেদিনীপুর কলেজে বি-এ পড়ছে, কেউই কোনোদিন তুলসীকে লেলহা মায়জিউ মনে করেনি। বরং সবাই এতদিন উল্টোটাই ভেবে এসেছে।

তুলসীকে সবাই পল্লীর সেরা বুদ্ধিমতী মানুষ বলে মনে করে এসেছে। তুলসীকে এরা তার জন্য শ্রদ্ধাও করে এসেছে এতদিন। সত্যি তাই, তুলসীকে এরা শ্রেষ্ঠ রমণী, শ্রেষ্ঠ বহু আর শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রেখেছিল। হয়তো সেজন্য এরা তুলসীকে খানিকটা

ঈর্ষাও করে এসেছে। এ-ঈর্ষা অবশ্য সে-ঈর্ষা নয়। এর অপর নাম তুলসীর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। তুলসীকে সত্যি এরা স্বীকৃতি আর সম্মানের উচ্চচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এরূপ সেরা কুড়িকে দমন বহুরূপে পেয়েছিল বলে সবাই দমনকে চাঁতুবঙ্গা অর্থাৎ ভগবানের আশীর্বাদপুষ্ট ভাগ্যবান মানুষ বলে মনে করত। সাগ্নিক তো সবই জানে।

তাহলে তুলসী সম্পর্কে এরা আজ এসব কথা বলছে কেন, তাকে লেলহা মায়জিউ বলছে কেন?

আসলে তুলসীর অকাল মৃত্যুটা এদের বুকে খুবই বেজেছে, শুধু দমন-হামরু নয়, সবার বুকেই বেজেছে। তাই তুলসীর ওইভাবে ওষুধ খাওয়াটাকে কেউই মেনে নিতে পারছে না। ওই কঠোর মন্তব্যের মধ্যে যেন তুলসীর প্রতি সবার অভিমান ঝরে পড়ছে।

ভুলটা খুবই বড় তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তবে এরকম ভুল তো ওরা যে কেউই করতে পারে, যখন-তখন করতে পারে, করেও থাকে। তুলসীর ভুলের পরিণাম আজ তার অকাল মৃত্যুকে ডেকে এনেছে বলেই সেটা এতবড় হয়েই ধরা পড়েছে। তাই তো এরা তুলসীকে লেলহা মায়জিউ বলতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। সাগ্নিক এদের আর এদের মানসিকতাকে সম্পূর্ণ বোঝে বলেই হামরুদের কিছু না-বলে মনে মনে ওদের ভগবান চাঁতুবঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে চাঁতুবঙ্গা, হে ঈশ্বর, এই জীবনঘাতী ভুল করার সারল্য থেকে এই মাটির মানুষগুলিকে তুমি রক্ষা করো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সাগ্নিকের ইস্কুলের কথা মনে পড়ল। সে হামরুর উদ্দেশে বলল, চলি রে হামরু, ইস্কুল আছে।

হামরু কিছুই বলল না। সাগ্নিক দমনের দিকে তাকাল, কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না, পরক্ষণেই হামরুর দিকে তাকিয়ে বলল, এবার ওর কি হবে?

ওর বলতে দমনের কি হবে। হামরু নিজেও সেটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, উটা তো মুইও ভাবিঠি

মাষ্টরবাবু।

সাগ্নিক আর কোনো প্রশ্ন তুলল না, নিজেও কিছু বলল না। সে নীরবে ভারাক্রান্ত মনে ইস্কুলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল, পেছনে পড়ে থাকল তুলসীর চিতা, শোক-সন্তপ্ত দমন আর হামরু-সহ ব্যথাহত শ্মশান-বন্ধুর দল।

সাগ্নিকের সঙ্গে যেসব ছেলেমেয়েরা এসেছিল ফিরবার সময়ে তাদের কাউকেই সে দেখতে পেল না। এ-বেলায় ওরা আর ইস্কুলে যাবেই না, সাগ্নিক বুঝতে পারল। অগত্যা একা-একাই সে তুলসীহীন দমনের ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। কিছুদুর যেতে না-যেতেই হঠাৎ তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবনা জাগল। তুলসী আর তুলসীর প্রিয়তর তেঁতুলগাছশূন্য দমনের বাড়িটা দেখবার জন্য তার মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগল। একটুক্ষণের জন্য সে দাঁড়াল, তারপর সোজাপথ ছেড়ে ডান-দিকের একটা আল ধরে এগিয়ে চলল। সামনেই দমনের বাড়ি, তার বাঁদিকে শিউলী প্রাইমারী ইস্কুল।

একটু এগিয়েই সাগ্নিক থমকে দাঁড়ায়, ছাখে দমনের বাড়ির উত্তর পাশটা বেমানানভাবে ফাঁকা। ওখানেই মাথা তুলে শাখা-পল্লব বিস্তার করে দাঁড়িয়ে ছিল সেই প্রাচীন তেঁতুলগাছটা।

সাগ্নিক আবার পা বাড়ায়, বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে ঠিক যেখানে তেঁতুলগাছটি ছিল তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাছ তো এখন নেই, কেবল অসংখ্য ঝরাপাতা আর ছোটবড় ডালপালার স্তূপ।

সাগ্নিক ভাবতে থাকে, এতবড় গাছটা ওরা কাটতে গেল কেন? দু'টি-চারটি বড় ডাল কাটলেই তো ওদের কাজ মিটে যেতে পারত। তবে কি দমন ইচ্ছে করেই গাছটাকে শেষ করল? তুলসীশূন্য বাড়িতে তুলসীর অজস্র স্মৃতিবাহী তেঁতুলগাছ ওকে প্রতিনিয়ত দগ্ধে-দগ্ধে মারবে, এই চিন্তাই কি ওকে এ-কাজ করতে বাধ্য করেছে?

তুলসীর সঙ্গে গাছটির সম্পর্ক ছিল সত্যি অত্যন্ত নিবিড়। ওই গাছের তেঁতুল না হলে তুলসী নাকি পান্তা খেতেই পারত না। ও-গাছের

তেঁতুলও নাকি ছিল খুব সুস্বাদু। সাঁওতালপল্লী আর সদ্গোপ পাড়ার সবাই নাকি তুলসীর গাছের তেঁতুলের প্রত্যাশায় থাকত। কেবলমাত্র ওই তেঁতুলের জন্য তুলসীর সঙ্গে গাছটির সম্পর্ক অতো সুনিবিড় ছিল ভাবলে ভুল করা হবে। কাজের ফাঁকে, অবসরে, কাজ-না-থাকা দিন-গুলিতে এই তেঁতুলগাছটিকে ঘিরেই তুলসীর অস্তিত্ব গুঞ্জন করত। দমন আর ছেলেদুটিকে নিয়ে এই গাছতলাতেই সে বসত, শুত, ঘুমিয়ে থাকত। এই গাছতলাই হ'ত ওদের কক্ষা, ঘর। বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে গাছটি ছিল বলেই কালবৈশাখীর সমস্ত ঝড়-ঝাপটা থেকে গাছটি তুলসীর কক্ষাকে রক্ষা করত। তাই তো তুলসী তার হেরেল আর কোড়া দুটির মতো এই তেঁতুলগাছটিকেও আপন ভাবত। সত্যি গাছটি ছিল তার কাছে স্বামী আর সন্তান দুটির মতো প্রিয়। তুলসীহীন দমনের অন্তরের হাহাকার আর বেদনাই কি তেঁতুলগাছটির অকাল মৃত্যুর কারণ? এই ভাবেই কি সে তুলসীকে হারানোর যন্ত্রণা ভুলতে চেয়েছে?

কিন্তু তাকি হয়? তুলসীর অকাল মৃত্যুর সাথে সাথে কি তুলসী শেষ হয়ে যাচ্ছে?

না, তা যাচ্ছে না, যেতে পারে না, দমনের বিপন্ন অস্তিত্বের কাছে মৃত তুলসীর অস্তিত্ব এত সহজে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। বরং দমনের ওই বিপন্ন অস্তিত্বের কাছে তুলসী ঘুরে-ফিরে বারবার আসবে। সাগ্নিক নিশ্চিত করে একথা বলতে পারে। সে যে দমন-তুলসী সম্পর্কে সব কথাই জানে, ওদের ভালোবাসার গভীরতাও সে উপলব্ধি করতে পারে। তুলসীর ওপর দমনের নির্ভরতাও তার অজানা নয়।

আদিবাসী পাড়ার সকল মানুষের সম্পর্কেই ছিল তার কৌতূহল। সে সবাইকে জানবার, অনুভব করবার আন্তরিক চেষ্টা করেছে। সবচেয়ে বেশি কৌতূহল ছিল তার দমন-তুলসী সম্পর্কে। ওদের বিবাহ-পূর্ব সম্পর্ক, বিবাহোত্তর দাম্পত্যজীবন, সবই সাগ্নিককে আকর্ষণ করত। সাগ্নিক সবার কাছ থেকেই ওদের সম্পর্কে জানতে চাইত। সবাই সবকথা ওকে বলতও। দমনের একান্ত সুহৃদ হামরুও ওকে অনেক কথা বলেছে ওই

দমন-তুলসী সম্পর্কে। তাই তো সাগ্নিক আজ এত নিশ্চিত করে দমনের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ভাবতে পারছে।

দশ বছর আগে প্রাইমারী ইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে শিউলী গাঁয়ে আসার আগে সাগ্নিক এদের সম্পর্কে, ওই আদিবাসী সাঁওতাল মানুষদের সম্পর্কে, কিছুই জানত না বলা চলে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে এখানে আসার আগে সে ওদের চোখেই দেখেনি, ওদের কথা কিছু শোনেইনি। না, তা নয়, আগেও সে ওদের দেখেছে, ওদের কথা শুনেছে। এমনকি সাঁওতালী ভাষায় ওদের কথাবার্তা কখনো-সখনো সে কানপেতে শুনেছে।

উলুবেড়িয়া আর মেদিনীপুরের মধ্যে যাতায়াতের পথে অনেকবারই সে ওদের দেখেছে। ধানবোনা, ধান রোয়া, নিড়ানো, ধানকাটা-ঝাড়াই আর মাটিকাটার মরশুমে সে কতোবার ওদের দেখেছে। দেখেছে দলে দলে মিছিল করে পথ চলতে। ওদের সেই সুন্দর সাবলীল স্বচ্ছন্দ পথ-পরিক্রমণ সাগ্নিক সেদিন অবাক হয়ে দেখত, হয়তো বা কিছুটা উপভোগও করত। ওদের হাতে তীর-কাঠ, লম্বা-লম্বা লাঠি আর গুল্‌তি, ওদের অবিমিশ্র কালো রঙ আর মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া-চুল-সমৃদ্ধ সুগঠিত শরীর, শাল পাতায় মোড়া দীর্ঘ আর জ্বলন্ত বিড়ি ওদের মুখে মুখে ধূমায়িত বলিষ্ঠ জীবন্ত মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে সাগ্নিক সেদিন নিজের মধ্যে এক অস্বস্তি আর আবেগ মিশ্রিত শিহরন অনুভব করত।

শুধু ওদের কথাই বা বলি কেন, শিউলী গাঁয়ের মতো অজ পাড়া-গাঁ সম্পর্কেও সাগ্নিকের ধারণা সেদিন স্বচ্ছ ছিল না। শিউলী গাঁয়ে আসার সময়ে সাগ্নিক সেই অদৃশ্য অস্বস্তি, আবেগ মিশ্রিত শিহরন আর সেই অস্বচ্ছ ধারণা নিয়েই এসেছিল।

শিউলী গাঁয়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে, এখানকার মানুষের সাথে আবশ্যিক সাযুজ্য গড়ে তুলতে সেদিন তাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। চাকরির প্রথমদিকের কয়েকটি বছর তো সে অতিবাহিত করেছিল ভয়াবহ রকমের অস্থিরতা নিয়ে। সোমবার সকালে

আসত, তারপর জলের মাছ ডাঙায় তুললে তার যেমন অবস্থা হয়, কতকটা তেমনিভাবে কোনোক্রমে পাঁচটি দিন কাটিয়ে শনিবার তুপুরেই সে ফিরে যেত উলুবেড়েতে, মা আর ভাইবোনের কাছে, বন্ধুদের সান্নিধ্যে, পরিচিত অন্তরঙ্গ পরিবেশে। আর তখনই সে নিজেকে খানিকটা স্বাভাবিক আর স্বচ্ছন্দ মনে করত।

কিন্তু এ-অবস্থা তো আর দীর্ঘদিন চলতে পারে না, চলেও নি। আস্তে-আস্তে শিউলী গাঁ ওকে আকর্ষণ করতে থাকে। এখানকার সবকিছুই ওর কাছে ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে ধরা দিতে থাকে। দীর্ঘদিন এই ভালোলাগাকে সে নিজের মধ্যে লালন করে চলেছে। ভালোলাগার পরিধিও ক্রমশ বিস্তারিত হয়েছে। এইভাবে এই অনুভূতি বুকে পোষণ করে একটানা দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করবার পর, এখানকার মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশার পর, সাগ্নিকের আগেকার সব ধারণাই আজ পাল্টে গেছে। আজ আর সে আগেকার সেই শহরমুখী যুবকটি নেই।

শিউলী গাঁয়ের সব-কিছুর সঙ্গেই আজ সে একাত্ম হয়ে গেছে। শিউলী গাঁয়ের মাটির গন্ধ সে শুঁকে নিতে শিখেছে। এখানকার প্রকৃতির বৈচিত্র্য আর ছয় ঋতু, এমনকি গ্রীষ্মের রূঢ়তা, শীতের রুক্ষতা, বর্ষার ক্লেদ, সবই আজ তাকে আকর্ষণ করে।

আর এখানকার মানুষ, বিশেষ করে প্রকৃতির নিকটতর সন্তান-সন্ততি ওই আদিবাসী মানুষরা? না, ওরা আর তার মধ্যে আগেকার কোনো অনুভূতিই জাগায় না। ওদের আজ সে তারই মতো স্বাভাবিক মানুষ মনে করে। ওরাই আজ সাগ্নিকের সবচেয়ে প্রিয়। ওদের সৎ সহজ সরল শান্ত স্নিগ্ধ নির্বিরোধ আর অন্যের ব্যাপারে অংশত নির্লিপ্ত জীবনের সাহচর্য, সাগ্নিকের জীবনকেও প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছে। বিশেষ-ভাবে উৎকর্ণ তুটি কান নিয়ে, কৌতূহলী আর সদাজাগ্রত তুটি চোখ নিয়ে, একটি সংবেদনশীল হৃদয় আর একটি বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে তাই তো নিরন্তর সে ওদের স্পর্শ করে চলেছে।

তুই সতীনের তালতলাতে হঠাৎ আগুনের কুণ্ডলী দেখে তাই তো

সে চমকে উঠলো নিজের মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর বিষাদের স্পর্শ অনুভব করে।

গ্রীষ্মকাল, চৈত্রের প্রথম। এরই মধ্যে দারুণ গরম পড়ে গেছে। সূর্যের প্রখর তাপে চারদিকে দাবদাহের সৃষ্টি হচ্ছে।

ইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা মাত্র তিনজন। সাগ্নিক নিজে, পুতুল চক্রবর্তী আর যুগল মাণ্ডি। যুগল স্থানীয় ছেলে, পুতুলকেও একরকম তাই বলা চলে। যুগলের বাড়ি দেউল গাঁয়ে, এখান থেকে তিন-চার মাইল দক্ষিণে। যুগল বাড়ি থেকেই ইস্কুল করে।

পুতুলরা আসলে পূর্ববঙ্গের লোক, তবে ওর বাবা অনেকদিন এপারে চলে এসেছেন। ওর বাবা রেলে চাকরি করেন, খড়্গাপুরে। রেল-কোয়ার্টার্সেই পুতুল মানুষ হয়েছে। সেই কোয়ার্টার্স থেকেই সে আগে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করত। পরবর্তীকালে তার বিয়েও হয়েছে একজন রেলকর্মচারীর সঙ্গে, একমাত্র শিশুপুত্রকে নিয়ে এখন সে স্বামীর কোয়ার্টার্সে থাকে ওই খড়্গাপুরেই। সেই কোয়ার্টার্স থেকে এখনো সে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করছে, যাতায়াত করে বাসে করে।

পুতুলের ছেলেটির শরীর ভালো নেই। সে যে আজ ইস্কুলে আসবে না কাল সেকথা বলেই গিয়েছিল। কিন্তু যুগলের তো আসবার কথা। অথচ সে-ও আসেনি। অতএব সাগ্নিক আজ একা, একলাই সে ইস্কুল চালাচ্ছে, একাই সামলাতে হচ্ছে সবদিক।

ইস্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা অবশ্য এমন কিছু বেশি নয়, সবসুদ্ধ গোটা পঁচিশেক সাঁওতাল ছেলেমেয়ে আর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মধ্যে আবার সাঁওতাল পাড়ার অনেকেই আজ অনুপস্থিত। তবুও বিভিন্ন ক্লাস তো আছে, আছে পঠন পাঠনের নিয়ম রীতি। তার ওপর আবার এই গরম।

সাগ্নিকের মনটা এমনিতেই আজ অপ্রসন্ন ছিল। এই অপ্রসন্ন পরিস্থিতিতেই সে হঠাৎ দুই সতীনের তালতলাতে ওই অনভিপ্রেত অগ্নিশিখা দেখে কেঁপে উঠল। মধ্যাহ্নের খরতাপকে উপেক্ষা করে ওই

অগ্নিশিখা ঘোষণা করছে আদিবাসী-পল্লীর কোনো প্রিয়তর মানুষের চিরবিদায়ের করুণবার্তা! সাগ্নিক যেন কতকটা আপন মনে বলে ওঠে, ওখানে আগুন জ্বলছে কেন?

আগুন যে ওখানে কেন জ্বলে সাগ্নিক তা ভালো করেই জানে। আর জানে বলেই আপন মনে কথা বলতে গিয়েও তার গলা কেঁপে উঠল।

ক্লাস ফোরে ভূগোল পড়াচ্ছিল সাগ্নিক। ক্লাসে উপস্থিত মোট চার-জনের মধ্যে দু'জনই ছেলে এবং তারা ওই আদিবাসী পাড়ার। বাকি দু'জন মেয়ে, তারা সদ্‌গোপ পাড়ার, তাদের মধ্যে একজন আবার স্বয়ং ব্রজেন ঘোষের মেয়ে পারুল। সাগ্নিকের কম্পিত কণ্ঠের ওই উৎকণ্ঠিত করুণ প্রায়-স্বগতোক্তি ওরাও শুনতে পায়। ছাত্রীদু'জন চুপ করে থাকলেও মাতলা মাণ্ডির ছেলে ধামা বলল, তুলসীয়ার গচ্‌ হইছে স্যার! ট্যাংরার দাদার ছেলে বলে, পিংকুর আয়োর গচ্‌ হইছে স্যার!

তুলসী আর পিংকুর আয়ো আসলে একই মেয়ে, একই নারী, একই অস্তিত্ব। আসল কথা দমন কিসকুর বউ তুলসী, পিংকুর মা তুলসী, শিউলী গাঁয়ের সবার পরিচিত, সবার প্রিয় তুলসীর গচ্‌ হয়েছে। সে মারা গেছে।

কথাটা বিশ্বাস করতে সাগ্নিকের কষ্ট হ'ল। স্বাস্থ্যসম্পদে পরিপূর্ণ তুলসীর আকস্মিক মৃত্যু সত্যি ভাবা যায় না। কিন্তু যা সত্যি তাকে তো অস্বীকারও করা যায় না। তুলসীর মৃত্যু যতই অপ্রত্যাশিত হোক না কেন, অদূরের ওই অগ্নিশিখা তাকে যে ধ্রুব ঘোষণা করছে।

তুলসীর মৃত্যু সংবাদ শুনেই সাগ্নিকের পড়ানো থেমে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েরাও যেন কোনো এক জাদুমন্ত্রের প্রভাবে পড়ার কথা ভুলে গিয়ে মূক হয়ে বসে ছিল। আসলে তুলসী যে একটা পরিচিত নাম, অতি পরিচিত অস্তিত্ব। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে সবার মনেই ঝাঁকুনি লাগার কথা। এই মুহূর্তে সাগ্নিক আর তার ছাত্র-ছাত্রীরাও সেই ঝাঁকুনি অনুভব করল।

সাগ্নিক একবার ওখানে যাওয়ার কথা ভাবল। ওখানে মানে শ্মশানে, তুলসীর চিতাগ্নির কাছে। দুই সতীনের তালতলা তো আর এমন দূর নয়, বড় জোর তিন-চার মিনিটের রাস্তা। টিফিনে যাবে, আবার তখনই

ফিরে আসবে।

অপ্রসন্ন আর বিষণ্ণ সময়ের মুহূর্তরা এগিয়ে চলে। এমনি করে এক-সময় টিফিন হয়। ছাতাটা হাতে নিয়ে সাগ্নিক দুই সতীনের তালতলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সাঁওতাল পাড়ার প্রায় সব ছেলে মেয়েই সাগ্নিককে অনুসরণ করে।

ওই যে মাঠের মাঝখানে একখণ্ড নাতিপ্রশস্ত অনাবাদী ভূমির ওপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে বার্ধক্যতাড়িত দুটি তালগাছ, ওরাই হ'ল দুই সতীনের তালগাছ। তালগাছ দুটির অনতিদূরে ওই একই জমিতে পল্লব-হীন শীর্ণশাখা জরাগ্রস্ত একটা আমগাছও দাঁড়িয়ে ধুঁকছে যেন। ওই স্থানটুকুই হ'ল সাঁওতালদের মোরঘাটি। জায়গাটুকু একেবারেই স্বাতন্ত্র্য-হীন। তবু এটি ওদের মহাশ্মশান। ওদের মোরঘাটি। জীবনের শেষ পারানির কড়ি ওরা এখানেই মিটিয়ে যায়।

মোরঘাটিতে যাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা নেই, হিড় বা আলপথই একমাত্র অবলম্বন। আলগুলিও প্রশস্ত না। হবেই বা কি করে? এ-পথে লোক চলাচল যে খুবই কম। সাঁওতালদের শ্মশান বলে অসাঁওতালরা তো এ-পথ খুব একটা মাড়ায় না। চাষের সময়ে অবশ্য অনেককে যাতায়াত করতে হয়। অন্য সময় কেউ এ-ধারে আসেই না। অতএব সাঁওতালদের মোরঘাটি ওখানে থাকা সত্ত্বেও আলগুলি বৈশিষ্ট্যহীন, অন্যান্য আলপথের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। তবে গরমকালে জমির ওপর দিয়েও যাতায়াত করা যায়, অনেকে করেও।

সাগ্নিক আলপথ ধরেই এগিয়ে চলেছিল। তার মন এখন তুলসীর চিন্তাতেই ভারাক্রান্ত। তুলসী হঠাৎ কিভাবে মারা গেল, এই প্রশ্নই তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওর অনুসরণকারী সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেও সে তুলসীর মৃত্যু-রহস্যের কিছুই জানতে পারল না।

শিউলী গাঁয়ের আদিবাসী সাঁওতালরা ধোরোমে যদিও দেকা অর্থাৎ হিন্দু, সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ড আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান-আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা অদ্ভুতভাবে স্বতন্ত্র, কিছু পরিমাণে উদারও বটে। যেমন এই মৃতদেহ

সংকারের ব্যাপারটাই ধরা যাক। মৃতব্যক্তির পরিবারের আর্থিক অবস্থা যদি ভালো হয়, মৃতের প্রতি যদি পরিবারের আর পল্লীর অধিকাংশ মানুষের ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা প্রগাঢ় থাকে, তবেই মৃতদেহ ওরা দাহ করবার কথা ভাবে। অন্যথায় কবর। আর্থিক এবং আরো বহুবিধ কারণে কবর দেওয়ার ঘটনাই স্বভাবত অনেক বেশি দেখা যায়। বাচ্চা বা কম-বয়সীদের ক্ষেত্রে দাহ করার প্রশ্নই ওরা তোলে না।

দমন কিসকু তার বহুকে ভালোবাসত, একান্ত নিবিড় আর একনিষ্ঠ ছিল সেই ভাগী। তুলসীও তেমনি ভালোবাসতো দমনকে। ওদের মতো প্রেমময় দম্পতি কেবল সাঁওতাল পল্লীতে কেন, সদ্‌গোপ পাড়ায়ও একটি নেই। শুধু দমনই বা বলি কেন, আদিবাসী পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ বনিতা তুলসীকে ভালোবাসত, পছন্দ করত, হয়তো বা শ্রদ্ধাও করত। আর তারই ফলশ্রুতিতে তুলসীর মৃতদেহ আজ দাহ হচ্ছে, আর তাতে এত লোক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। নইলে দমনের অবস্থা এমন নয় যাতে সে তুলসীর মৃতদেহ দাহ করতে পারত।

॥ দুই ॥

ইস্কুলে এসে দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু করল বটে কিন্তু কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারল না সাগ্নিক। তুলসীর মৃত্যু আর দমনের ভবিষ্যৎ-ভাবনা যেন একখণ্ড ভারী মেঘের মতো তার মনের ওপর চেপে বসে থাকল।

এ-বেলায় ইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি আরো কম। সাঁওতাল পাড়ার কোনো ছেলেমেয়েই টিফিনের পর আর আসেনি।

সাগ্নিক যথারীতি বসে থাকে, পড়ায় এবং অতিবাহিত করতে থাকে বিষণ্ণ সময়ের মুহূর্তগুলি। ইস্কুল ছুটি হতেই বাড়ি চলে আসে। বাড়ি মানে ব্রজেন ঘোষের বাড়ি। সদ্‌গোপ পাড়ার ধনাঢ্য ব্রজেন ঘোষের

বাড়িতেই তার আস্তানা।

সদ্‌গোপ পাড়া খুব একটা বড় পাড়া নয়। আট-দশ ঘর সদ্‌গোপ, একঘর বেনে, একঘর তাঁতী, দু'ঘর গোয়ালা, দু'ঘর মাহিষ্য, তিনঘর বাগদী আর একঘর ব্রাহ্মণ—এই নিয়ে সদ্‌গোপ পাড়া।

সদ্‌গোপ পাড়া আর সাঁওতালপল্লীর মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা কাঁচা-রাস্তা, কয়েক বছর আগে টেস্ট-রিলিফ-স্কিমে এটি তৈরি হয়েছিল। কাঁচারাস্তার উল্টোদিকে অর্থাৎ সাঁওতালপল্লীর দিকে একেবারে রাস্তার গায়েই শিউলী প্রাইমারি ইস্কুল। ইস্কুলটি গড়ে উঠেছিল দশ বছর আগে, ১৯৫৬ সালে। সাগ্নিকই ইস্কুলের প্রথম শিক্ষক। ব্রজেন ঘোষও সেই সময় থেকে ইস্কুলের সেক্রেটারি। ইস্কুল-প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ব্রজেন ঘোষের বাড়িতে আশ্রিত। ইস্কুলের ভালোমন্দের দায়-দায়িত্ব তো সেক্রেটারি রূপে ব্রজেন ঘোষের উপর কিছুটা বর্তায়, তাই হয়তো তিনি সাগ্নিককে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে থাকতে পারেন।

ব্রজেন ঘোষ যথার্থই একজন ধনাঢ্য মহাজন। একশো বিঘার ওপর তাঁর চাষের জমি। আট-দশখানা লাঙলে চাষ করেও কুলিয়ে উঠতে পারেন না। দশ-বারোটি বড় বড় পুকুর আছে, মাছের চাষ থেকেও বছরে তাঁর প্রচুর আয়। আরো অনেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিনিয়োগ আছে, সেসব থেকেও তাঁর আয় হয় অনেক টাকা। অতএব সাগ্নিকের মতো প্রবাসী, দরিদ্র অথচ অশেষ গুণসম্পন্ন প্রাইমারি ইস্কুলের একজন শিক্ষককে তিনি যদি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেন, তাতে যে তার ঘরের অকুলান হবে, চাল বাড়ন্ত হবে, এমন কথা ভাববার কোনো কারণ নেই।

এই আশ্রয় আর অন্নের বিনিময়ে সাগ্নিকও অবশ্য কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করে, মানে তাকে করতে হয়। ব্রজেন ঘোষ চারটি সন্তান-সন্ততির জনক। বড়টি মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার পরের দুটি ছেলে। বড়টি মেদিনীপুর কলেজে পড়ে, সামনেই তার পার্ট-ওয়ানের ফাইনাল পরীক্ষা। তার পরের ছেলেটি কালিয়াচক হাই-

ইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সবচেয়ে ছোটটি মেয়ে, সাগ্নিকের ইস্কুলের ক্লাস-ফোরের ছাত্রী ওই পারুল। এদের সবাইকে মানুষ করার সার্বিক দায়িত্ব ব্রজেন ঘোষ সেই প্রথম দিন থেকেই দয়া করে সাগ্নিকের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। সাগ্নিকও সে-দায়িত্ব পালন করে চলেছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

পঠন-পাঠন ছাড়াও আরো কিছু কিছু কাজও তার জন্য বরাদ্দ ছিল। সময় নেই অসময় নেই খড়্গপুরে ছোটো, মেদিনীপুরে যাও, এমনকি কলকাতা বা দূরেও যেতে হয় কখনো-কখনো। ব্রজেন ঘোষ লেখাপড়া বিশেষ একটা জানেন না বলে ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-কলেজে সাগ্নিককেই যেতে হয়। সাগ্নিককে দিয়ে ব্রজেন ঘোষ অনেক কিছু লিখিয়ে নেন, পড়িয়ে নেন। এসব ছাড়াও থাকে আকস্মিক আর অনির্দিষ্ট দায়িত্বের বোঝা।

দশবছর ব্রজেন ঘোষের বাড়িতে থেকে এই সর্বদায়িত্বযুক্ত গৃহ-শিক্ষকের পবিত্র দায়িত্ব সাগ্নিক নিরলস নিষ্ঠায় পালন করে চলেছে। পালন করতে সে বাধ্যও বটে। পরান্নভোজী, পরাশ্রিত দরিদ্র মানুষকে বুঝি এমনি করেই দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সাগ্নিক যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন সাড়ে-তিনটে বেজে গেছে। ঘোষ-দম্পতি তখন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন।

ব্রজেন ঘোষ তার নির্দিষ্ট ইজিচেয়ারের বদলে একটা মাদুরে বসে আছেন। ঘোষগিন্নী তার পাশে বসে পুরীর ঝিনুক দিয়ে স্বামীর পিঠের ঘামাচি মেরে দিচ্ছেন। ফাঁকে-ফাঁকে দু'জনেই চায়ের কাপ মুখে তুলছেন। ঘোষগিন্নীর হাতের কাছে তালপাতার একটা হাত-পাখাও আছে, মাঝে-মাঝে পাখাটা নাড়ছেন উনি।

ব্রজেন ঘোষের বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে। গায়ের রঙ ফর্সা বলে আদল গায়ে তাঁকে বেশ দেখায়, ধনাঢ্য মহাজনরূপে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। ঘোষগিন্নীর বয়স আরো কম, চল্লিশের নিচে। স্বাস্থ্যশ্রী বেশ

ভালোই। গরমের দিন, ব্লাউজ-ট্লাউজ কিছু পরেননি। বড় ছেলে রমেন গেছে খড়গাপুরে, ছোট ছেলে নরেন এখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি, পারুল ফিরে এসে রান্নাঘরে ঢুকেছে, কানার মা তাকে খেতে দিচ্ছে। সখি বা অন্য কোনো জন-মজুরও এখন বাড়িতে নেই। স্বামীর কাছে একলা আছেন বলে ঘোষগিন্নী এখন পোশাক-আশাকে এমনকি আচরণেও কিছুটা অবিন্যস্ত, ঢিলেঢালা।

ব্রজেন ঘোষ স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, তোমার পারুলের নামে মুই আরো পাঁচ বিঘা বিল কিনব ভাবিঠি—।

ঘোষগিন্নী বললেন, কাই থাকতে, কার কাছ থাকতে ?

ব্রজেন ঘোষ সে-কথার উত্তর না-দিয়ে অন্য কথা বললেন, চারটা দামড়াও মোকে কিনতে হবে—

ঘোষগিন্নী খানিকটা বিস্ময়ের সুরে বললেন, কি ব্যাপার, আবার কাউকে ধরবে ভাবোঠো নাকি ?

ব্রজেন ঘোষ এ-প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিলেন না। বরং প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বললেন, ঘামাচি মারো।

এই তো মারিঠি।

ভালো করে মারো।

ভালো করেই তো মারিঠি !

কাই ভালো করে মারোঠো ?

তোমার পিঠে, আবার কাই মারব !

সৌটা তো বুঝিঠি !

তবে ?

ভালো হয়ঠেনি।

কেনে ভালো হবেনি ? চতুর্দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঘোষগিন্নী অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, মুই য্যাখন যা করি ভালো করেই করি, তোমার মতো ফাঁকিবাজ লই, বোঝঠো ? ঘোষগিন্নীর কণ্ঠে যেন আদিরসাত্মক কৌতুক খেলা করে।

ব্রজেন ঘোষও কম যান না, কপট অভিমানের ঢঙে বলে ওঠেন, মুই ফাঁকিবাজ ?

তা লয় তো কি ? ঘোষগিন্নীর ঠোঁটে হাসি।

ফাঁকিটা কোথাকে দেখছু ?

বলব, বলব তোমার ফাঁকিবাজির লমুনা !

কিন্তু বলা আর হ'ল না। তখনই উঠোনে এসে দাঁড়ায় সাগ্নিক। ব্রজেন ঘোষ ওকে দেখে বলে ওঠেন, আসো মাষ্টার !

ঘোষগিন্নী শাড়ি বিন্যস্ত করতে-করতে বাঁকা-চোখে হেসে হেসে সাগ্নিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, খবর কি মাষ্টার ?

সাগ্নিক কিছু বলল না, বরং আশ্চর্য হয়ে দেখল স্ত্রীর মুখের বাঁকা-হাসিটা ব্রজেন ঘোষের মুখেও সংক্রামিত হয়ে গেছে। সাগ্নিক ওদের এই বাঁকা-হাসির কোনো অর্থ খুঁজে পায় না।

ঘোষগিন্নীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, উনি যখন যেটিকে ধরেন আর ছাড়তে পারেন না। এই মুহূর্তে সাগ্নিককেও উনি ছাড়লেন না। সাগ্নিকের দিকে তাকিয়ে সেই বাঁকা-হাসিটাকে আরো প্রসারিত করে ঘোষগিন্নী বললেন, মোরা অখন চা খাইঠি, তুমি খাবে তো মাষ্টার ?

ব্রজেন ঘোষ বললেন, খাবেনি কেনে, এখানকে দিয়ে যাতে বলো।

এতক্ষণ সাগ্নিক ওদের সামনে দাঁড়িয়েছিল, এবার সে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

ব্রজেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, কাই যাওঠো মাষ্টার ? আরে বসো, আগে চা খাও, পরে যাবে। স্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, মাষ্টারের চা কাই ?

ঘোষগিন্নী রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য কানার মার উদ্দেশে বলেন, মাষ্টার আসছে, অর চা এখানকে লিয়ে আসো কানার মা। পরক্ষণেই ঘোষগিন্নী বলে ওঠেন, তা মাষ্টার যে চা খাবে, লাইবেনি ?

ব্রজেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, না, আর লাইতে হবেনি। মাষ্টার তো আর ছোঁয়নি।

ঘোষগিন্নী হাসতে হাসতে বলেন, ওঃ ছোঁয়নি বুঝি ! একটু থেমে

আবার বলেন, তা শ্মশানকে তো যায়ে মরছে!

সাগ্নিক এতক্ষণে ওদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অর্থ খুঁজে পেল। সে যে তুলসীর দাহক্রিয়া দেখতে শ্মশানে গিয়েছিল সেটা পারুলের মাধ্যমে ঘোষ-দম্পতি জেনেছেন। তাই ওদের মুখে এই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ। সেটাই এদের পক্ষে স্বাভাবিক। সাগ্নিক জানে সাঁওতালদের সঙ্গে ওর আন্তরিক সম্পর্ককে ঘোষ-দম্পতি কোনোদিনই ভালো চোখে দেখেন না। তাই সাগ্নিক কোনো কথা না-বলে আগের মতোই চুপ করে রইল।

এবারও সাগ্নিককে নীরব দেখে ওরা, বিশেষ করে ব্রজেন ঘোষ, খুশি হলেন না। ব্রজেন ঘোষ মনে করলেন, সাগ্নিক বোধহয় অসন্তুষ্ট হয়েছে, ব্রজেন ঘোষ সেটা তো চান না। তাই উনি তাড়াতাড়ি বললেন, একি মাষ্টার, তুমি দাঁড়ে আছ কেনে? বসো।

সাগ্নিক লম্বা হেলান-দেওয়া বেঞ্চটাতে বসল।

ব্রজেন ঘোষ মুখে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক হাসি ফুটিয়ে বলেন, তা ঔখানকে কি-টা দেখে আসছু বলো মাষ্টার।

রান্নাঘর থেকে চায়ের কাপ-প্লেট হাতে বেরিয়ে আসে কানার মা। কানার মা বছর-চল্লিশেক বয়সের এক বিষণ্ণ গ্রামীণ বিধবা, এ-বাড়ির রাঁধুনি আর সর্বক্ষণের ঝি। সাগ্নিকের হাতে চায়ের কাপ-প্লেট ধরিয়ে দিয়ে কানার মা আবার রান্নাঘরে ফিরে যায়। চায়ের কাপ মুখে তুলল সাগ্নিক।

ঘোষগিন্নী বলেন, কই, কিচ্ছু তো বলছুনি মাষ্টার।

কি বলব? এই প্রথম কথা বলল সাগ্নিক।

কি-টা দেখে আসছু—

ওঁরা যে কি শুনতে চান সাগ্নিক তা ভালো করেই জানে। তুলসীর মৃত্যু আর তার সংকারের ব্যাপারটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহকারে আলোচনা করে ওঁরা মজা পেতে চান। কিন্তু সাগ্নিক তা হতে দিতে পারে না। সে গম্ভীরভাবে বলে, ওদের তুলসীটা আজ মারা গেছে!

ব্রজেন ঘোষ বলে ওঠেন, তুলসীয়ারে নাকি অরা দাহ করছে মাষ্টার?

সাগ্নিক মাথা নেড়ে স্বীকৃতিসূচক জবাব দেয়।

ওর এই সংক্ষিপ্ত জবাবে ঘোষ-দম্পতি আদৌ খুশি হয় না। প্রসঙ্গটাকে বিস্তৃত করবার জন্য ব্রজেন ঘোষ গলাটাকে একটু করুণ করে বলেন, তুলসীয়ার মারা যাওয়াটা সত্যি দুখের ব্যাপার মাষ্টার। অদেরও খুব দুখ লাগছে, কি বলো ?

সাগ্নিক বিষণ্ণ কণ্ঠে জানায়, প্রিয়জনের অকাল মৃত্যু হলে যা হয় ওদের অবস্থাও এখন তাই।

সাগ্নিকের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন ঘোষ মুখের মধ্যে দুঃখসূচক এক চো-চো শব্দ সৃষ্টি করতে থাকেন।

ঘোষগিন্নীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। উনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, মুখের ভিতরে খোল বাজাওঠো কেনে ? মরছে তুলসী, একটা সাঁওতাল মেয়েছ্যানা, অতে তোমার মুখে খোল বাজেঠে কেনে ?

ব্রজেন ঘোষ মুখের ওপরে নকল দুঃখের ছবি ফুটিয়ে বলেন, দুখেগো গিন্নী, দুখে।

দুখে ! ঘোষগিন্নী আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেন, দুখ কার তরে, দমনার তরে, কি তোমার লিজের তরে ?

ব্রজেন ঘোষ আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, দমনার তরে দুখ হতে যাবে কেনে ? অর লিজেরই কোনো দুখ লেই দেখগে। আজ দেখঠো বউড়ির শোকে কাতর হয়ঠে, কাল দেখবে আর একটারে ধরে লিয়ে আসেঠে।

ঘোষগিন্নী বলেন, সাঁওতালদের আর দুষটা কি বলো। এমনটি তোমরা কর না, ভদ্দরনোকেরা করে না ? পুরুষ জাতটাই যে অমনি।

ঘোষগিন্নীর কথা শুনে নিজের অজ্ঞাতেই সাগ্নিকের মুখে একটু হাসি খেলে গেল।

ঘোষগিন্নীর সেদিকে খেয়াল নেই। উনি এখনো স্বামীকে ধরে আছেন। বললেন, দমনার তরে যদি লয়, তবে দুখটা তোমার কার তরে ?

দুখটা মোর লিজের তরেই গিন্নী !

কেনে, তুলসীয়ার সৌ বুকের লাচন আর পাছার কাঁপন—

এই, এই গিন্নী!

এরকম কথাবার্তার পর সাগ্নিক স্বভাবতই আর বসে থাকতে পারে না, সে উঠে দাঁড়ায়, নিজের ঘরে যাবার জন্য আবার পা বাড়ায়। ব্রজেন ঘোষ বাধা দেয়, বসতে বলে। সাগ্নিক বসে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওই-রকম কথাবার্তার পরও ব্রজেন ঘোষ কেন তাকে যেতে দিলেন না, সাগ্নিক তা বুঝতে পারে না।

ব্রজেন ঘোষ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সাগ্নিককে শুনিয়ে-শুনিয়ে বললেন, দেখ গিন্নী, মুই বিষয়ী মানুষ, দুখটাও তাই মোর বিষয়গত। এই বিষয়গত দুঃখের সাথে তুলসীর মৃত্যুকে মিলিয়ে এর পর ব্রজেন ঘোষ যা বলে গেলেন সেটা কেবল তাঁর পক্ষে ভাবা বা বলা সম্ভব।

ব্রজেন ঘোষ অন্যান্য মজুর-কামীনদের তুলনায় সাঁওতালদেরই বেশি পছন্দ করেন। কেননা সোলাঙ্কী, তাঁতী, বাগদী, মুসলমান প্রভৃতি জাতের মজুর-কামীনরা যেমন করে কাজে ফাঁকি দেয়, এই সাঁওতাল জাতটা তা পারে না। বিদ্যেটা এখনো ওরা ভালো করে আয়ত্তে আনতে পারেনি। ওদের মধ্যে আবার ওই তুলসীটা ছিল তুলনাহীন। সে কোনোদিন কারো কোনো কাজে ফাঁকি দেয়নি, নিজের অজ্ঞাতেও কখনো কারো কাজে এতটুকু ফাঁকি দিত না। ওটা সে জানতই না। ধানরোয়া, নিড়ান দেওয়া, ধানকাটা, ধানঝাড়াই, মাটিকাটা, সব কাজই সে করত পরম নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, সে জমিতে থাকলে অন্যান্য মজুর-কামীনরাও কাজে ফাঁকি দিত না, দিতে পারত না, সে-সুযোগই তারা পেত না।

ব্রজেন ঘোষের সঙ্গে তুলসীর সততা আর আন্তরিকতা নিয়ে সাগ্নিকও একমত। সত্যি, তুলসী ছিল অনন্যা, অতুলনীয়া। যেমন মজবুত ছিল তার শরীর তেমনি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক তার মন। এই অনুপম-স্নিগ্ধ সততা আর পবিত্রতা তার চরিত্র আর ব্যক্তিত্বকে চিরকাল বেষ্টন করে রেখেছিল, অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করেছিল। এরকম সততা আর শুচিতা

ছিল বলেই সে কখনো কাজে ফাঁকি দিত না, সে যার কাজই হোক না কেন। সেই কারণে তার কোনদিন কাজের অভাবও হ'ত না। চৈত-বোশেখের বে-মরসুমে যখন কেউ কোথাও কাজ খুঁজে পেত না, তখনো তুলসীর কাজের অভাব হ'ত না। তখনো ভোর হতে না-হতেই তুলসীর বাড়িতে গিয়ে অনেকেই ধর্না দিত। অতএব এহেন একজন সৎ আর একনিষ্ঠ কামীনের অকাল মৃত্যুতে ব্রজেন ঘোষের মতো মহাজনের দুঃখিত হওয়াই স্বাভাবিক। এতে বিস্ময়ের কিচ্ছু নেই। সাগ্নিক খানিকটা বিস্মিত হয় ব্রজেন ঘোষের পরবর্তী মন্তব্য শুনে।

স্বামীর ওইসব যুক্তিতে ঘোষগিন্নী বোধহয় পুরোপুরি খুশি হতে পারেননি। তিনি আবারো খোঁচা মেরে বলেন, এই কথা, মুই ভাবছিনি তুমি বোধহয় অর সৌ বুকের লাচন আর পাছার কাঁপন কুছুতে ভুলতে লারোঠো—

ব্রজেন ঘোষ স্ত্রীর কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, হ্যাঁ, অর অই বুকের লাচন আর পাছার কাঁপন দেখেও অরে মুই কামে লিতি, কেনে জানু?

ঘোষগিন্নী তো বটেই, এমনকি সাগ্নিকও আগ্রহী হয়।

ব্রজেন ঘোষ উভয়কেই লক্ষ্য করে বলেন, অর অই বুকের লাচন আর পাছার কাঁপন দেখবার তরে আর সব জন-মজুররাও অর সাথকে কাজ করতে চাইতি। তুলসী কাজ করবে শুনলে মোকে অন্য মজুর খুঁজে মরতে হ'তনি, সবাই ছুটে আসতি। এবার মোর দুখটা বোঝাঠো গিন্নী?

কথা শেষ করে ব্রজেন ঘোষ উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন, হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ান। পরক্ষণেই আবার হাসি থামিয়ে বলেন, যাকগে, মুই একটুকু অদের পাড়া থাকতে ঘুরে আসিঠি।

পদ্মপুকুরে কাল মাটি কাটতে হবে, মজুর দরকার।

ব্রজেন ঘোষ টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় নেমে গেলেন।

॥ তি ন ॥

স্বামীকে উঠে যেতে দেখে ঘোষগিন্নীও উঠে দাঁড়ান, একটা হাই তোলেন, তারপর পাশের বাড়ির উদ্দেশে এগিয়ে চললেন।

সাগ্নিক একলা হয়ে যায়, একলাই বসে বসে ভাবতে থাকে। আলোচনাটা কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় এসে কিভাবে শেষ হ'ল! তুলসীর অকাল-প্রয়াণ নিয়ে শুরু হ'ল আর শেষ হ'ল তার বুকের নাচন আর পাছার কাঁপনে গিয়ে। বড় বিচিত্র ঘোষ-দম্পতির মানসিকতা!

ঘোষ-দম্পতির ওই বিচিত্র মানসিকতা সাগ্নিকের কাছে আরো একটা বড় প্রশ্ন রেখে গেছে। তুলসীর অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হওয়ার সকারণ যে-ব্যাখ্যা ব্রজেন ঘোষ নিজের স্ত্রী এবং প্রকারান্তরে সাগ্নিককেও শুনিয়ে দিয়ে গেলেন, সেটা কি নির্ভেজাল সত্যি কথা? তুলসীকে পছন্দ করবার অন্য কোনো কারণ কি তার মধ্যে ছিল না? তুলসী সম্পর্কে কি তার আর কোনো আগ্রহ ছিল না? কোনো দুর্বলতা?

এ-প্রসঙ্গে ঘোষগিন্নীর মতামত অস্পষ্ট নয়। ঘোষগিন্নী মনে করেন অন্য ব্যাপারও ছিল। তুলসীর সেই বুকের নাচন আর পাছার কাঁপন ব্রজেন ঘোষকেও আকর্ষণ করত। ব্রজেন ঘোষ যতই লুকোবার চেষ্টা করুন না কেন, ঘোষগিন্নীর স্থির বিশ্বাস, উনি সে-আকর্ষণের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। সাগ্নিকেরও তাই বিশ্বাস। সে-ও মনে করে ঘোষগিন্নীর ধারণা অমূলক ছিল না। একটানা দশবছর ব্রজেন ঘোষের কাছাকাছি থেকে সাগ্নিকও বুঝেছিল, তুলসী-সম্পর্কে ব্রজেন ঘোষের মনেও দুর্বলতা ছিল। তবে ব্রজেন ঘোষ নিজের মনের সেই দুর্বলতাকে সর্বদাই একটা বৈষয়িক আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেন।

তুলসী কি এতই সুন্দরী ছিল যার জন্য সে ব্রজেন ঘোষের মতো ধনাঢ্য মহাজনের মনেও দোলা দিতে সক্ষম হয়েছিল? হ্যাঁ, সে সুন্দরী

ছিল। নাটক-নভেল পড়ে বা সিনেমা দেখে যারা আদিবাসী রমণীর রোমান্টিক শরীর আর রূপের কল্পনা করে তারা যেমন তুলসী-সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌঁছতে পারবে না, তেমনি যারা অহর্নিশি দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় দীর্ণস্বাস্থ্য আদিবাসী রমণীদের দেখে দেখে তিক্ত ধারণা গড়ে তুলেছে, তারাও তুলসীর শারীর-সৌন্দর্য কল্পনায় ধরতে পারবে না। তুলসী ছিল আদিবাসী পাড়ার সত্যি সব চেয়ে মোঞ্ছ মায়জিউ, সেরা সুন্দরী রমণী। তার অবশ্য কারণও ছিল। কিন্তু সে-কথা থাক, আগে দেখা যাক ওর সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য কী ও কতখানি।

স্বীকার করতেই হয় সুন্দর ওর দেহের গড়ন। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ওদের চাঁন্দুবঙ্গা ছেনি-বাটাল দিয়ে কুঁদে-কুঁদে নির্মাণ করেছেন। চোখ-কান-নাক-মুখ-গলা-চুল-হাত-পা সবই যেন আশ্চর্যরকমের সুষম এবং সুন্দর। স্বাস্থ্যের বাঁধুনিও পরিপূর্ণ নিটোল। দশ আর পাঁচ বছরের দুটি সন্তানের জননী সাতাশ-আটাশ বছরের তুলসীর শরীরে যৌবন যেন আজও তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছিল। ওর বুক আর নিতম্ব? ঘোষগিন্নীর কথাটা একটু অশ্লীল ঠিকই, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থটি ধ্রুব, খাঁটি সত্যি। সত্যি তার বক্ষ দুটি সুন্দরের আমন্ত্রণ, নিতম্বে ফুটে উঠছে ছন্দোময়-নয়নাভিরাম কম্পন। ধানরোয়া, নিড়ানো, ধানকাটা, ধানঝাড়াই বা মাটি বহন করবার সময়ে, এমনকি সে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, ওর দেহের কালো বর্ণ কাউকে আকর্ষণ না-করলেও, লাউয়ের বীচির মতো সুন্দর শাদা দু-পাটি দাঁতের প্রতি কেউ না-তাকালেও, ওর আশ্চর্য স্বপ্নময় দুটি চোখের প্রতি কারো দৃষ্টি না-পড়লেও, ওর বুকের স্বাস্থ্য আর নিটোল শরীর কেউই অস্বীকার করতে পারত না। ওর অর্ধ-আবরিত বক্ষ আর তানপুরার মতো নিতম্বের দিকে না-তাকিয়ে কেউই থাকতে পারত না। ব্রজেন ঘোষও পারতেন না। ব্রজেন ঘোষও ভেতরে ভেতরে তুলসীর বুকের সৌন্দর্যে, সারা শরীরের সুষমার আকর্ষণে অসংযত হয়ে উঠতেন।

ঘোষগিন্নীও সেটা জানতেন, বেশ ভালো করেই জানতেন। আর জানতেন বলেই স্বামীকে সতর্ক করবার সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার

না-করে ছাড়তেন না। তবে একটা ব্যাপারে ঘোষগিন্নী নিশ্চিত ছিলেন —কোনো অঘটন ঘটবে না।

ঘোষগিন্নীর এ-ধারণাটাও ঠিক। তুলসীর শরীরের প্রতি যার যত প্রলোভনই থাক-না কেন, সকলেই জানে কিছু হবে না, কিছুই ঘটবে না। ব্রজেন ঘোষের প্রৌঢ়বুকে যতই ঝড় উঠুক না কেন, ঘোষগিন্নী জানেন কিছুই ঘটবে না। কিছু যে ঘটতে পারে না, সেটা অঞ্চলের সবাই জানে। এমনকি ব্রজেন ঘোষেরও তা অজানা নয়। আজ পর্যন্ত কেউই কিছু ঘটাতে পারেনি। তুলসী বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতেও ঘটত না। ঘটাবার চেষ্টা যে একেবারে হয়নি তা নয়, হয়েছে, কিন্তু সে-প্রয়াস সফল হয়নি।

তুলসীর আন্তরিকতা, সততা আর সৌন্দর্যের মতো তার চরিত্রও ছিল নির্মল, নিষ্কলুষ আর পবিত্র। এই পবিত্রতাই তার মধ্যে এনেছিল এক অপূর্ব সাহসিকতা, তেজস্বিতা, দার্ঢ্য যা এই অঞ্চলের মানুষের দ্বারা সর্বদা স্বীকৃত। এই তেজস্বিতাই কয়েক বছর আগে এখানে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। সেটা আজও সবার স্মৃতিতে জাগরূক আছে, থাকবেও চিরকাল, কেউ কোনোদিন ভুলবে না, ভুলতে পারবে না।

ঘোষ-দম্পতি যে বারান্দা ছেড়ে চলে গেছেন সেটা যেন এতক্ষণ সাগ্নিকের খেয়াল ছিল না। সে একমনে তুলসীর কথাই ভেবে চলেছিল। খেয়াল হতেই উঠে দাঁড়ায়, এক-পা, এক-পা করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

নিজের ঘর বলতে ব্রজেন ঘোষের বাড়িতে তার জন্য নির্ধারিত একটি ঘর। বিরাট বাড়ি ব্রজেন ঘোষের। বড় আটচালা ঘর। দু-তলা। দেওয়াল, মেঝে, থাম সবই পাকা আর মজবুত। ওপরে করুগেট টিনের ছাউনি। পুরু আর শক্ত শাল কাঠের ছাদ।

ওপরের তলাটা শোয়া-বসার জন্য ব্যবহৃত হয় না, তার দরকারই হয় না। গোটা ওপর তলাটাই তাই মূলত স্টোর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাগ্নিক দশ বছরের মধ্যে একটি বারের জন্যও ওপরে ওঠেনি, তাই ওপরে কি আছে না-আছে তা সে বলতে পারে না। তবে শুনতে পায় অনেক

কথা। কিন্তু না, থাক সে-সব কথা।

নিচের তলায় মূলঘর চারখানা। সামনেটা বাদ দিয়ে তিন পাশের বারান্দাও পাকা-ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, জানালা দরজা এমনভাবে বসানো যাতে তিন পাশের তিনটি বারান্দাও তিনখানি ঘরে পরিণত হতে পেরেছে। ডান পাশের বারান্দার ঘরখানিতে ওরা সাগ্নিককে থাকতে দিয়েছেন। বাঁ-পাশের অনুরূপ ঘরখানি বাইরের লোকেদের জন্য সংরক্ষিত, কেউ এলে থাকতে দেওয়া হয়, নয়তো এমনি পড়ে থাকে। পেছনের বারান্দাতেও আয়তক্ষেত্রের মতো এক বিরাট হলঘর তৈরি হয়েছে। থাকার লোক নেই বলে ওটাও নানা রকমের জিনিসপত্রে ঠাসা। সামনের বারান্দাটি উন্মুক্ত, বসবার জায়গারূপে নির্দিষ্ট, ওখানে বসেই এতক্ষণ সে ঘোষ-দম্পতির সঙ্গে তুলসীকে নিয়ে কথা বলছিল। ওখানে বসেই এতক্ষণ সে তুলসীর কথা ভাবছিল। মূলঘর চারখানার একটিতে থাকেন স্বয়ং ব্রজেন ঘোষ, দ্বিতীয় ঘরটিতে নরেন আর পারুলকে নিয়ে থাকেন ঘোষগিন্নী, তৃতীয়টি মেয়ে-জামাই এলে থাকবে বলে সবসময়ে সংরক্ষিত আর চতুর্থটিতে থাকে বড় ছেলে রমেন।

সাগ্নিক ঘরে ঢুকে আগে চেয়ারে বসে। বসে-বসেই সে জামা-গেঞ্জি খুলে হ্যাঙারে আর দড়িতে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর বিছানা থেকে তাল-পাতার পাখাখানা টেনে নিয়ে হাওয়া খেতে থাকে। ইতিমধ্যে কখন যে আবার তুলসী এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা সে বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল তখন তুলসীকে কেন্দ্র করেই তার মন দ্রুতলয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। বারান্দায় বসে একটু আগে তুলসীর চরিত্র সম্পর্কে যে-নাটকীয়তার কথা সে ভাবছিল, সাগ্নিক অনুভব করল তার মন এখনো সেই ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে।

শিউলী গাঁয়ের অবস্থা আজ যা দেখছি সেদিন তা ছিল না। খড়্গপুর-মেদিনীপুর পাকা-সড়ক থেকে শিউলী গাঁয়ের ভেতর দিয়ে এই যে কাঁচারাস্তাটি চলে গেছে, সেদিন এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। পাকা-

সড়ক আর কাঁচারাস্তার সংযোগস্থলে, শিরীষমোড়ের কাছে ওই রাম মাইতির আড়ত, ধান-ভানা কল, গম পেষাইয়ের কল, মুদিখানা আর চায়ের দোকান, ওইসব যে ওখানে হবে সেদিন একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। এসব জায়গা সেদিন ছিল নির্ভেজাল চাষের জমি। শিরীষ গাছটি সেদিনও ছিল তবে শিরীষমোড় বলে কোনো মোড় ওখানে সেদিন গড়ে ওঠেনি। সেদিন ওখানে বাসও দাঁড়াত না, মাইল খানেক হেঁটে কালিয়াচকে গিয়ে তবে সবাইকে খড়্গপুর বা মেদিনীপুরের বাস ধরতে হ'ত।

তারপর একদিন টেস্ট-রিলিফ স্কিমে নির্মিত হ'ল এই কাঁচারাস্তাটি। সরকারী বিশেষ অনুদান পেয়ে ব্রজেন ঘোষ ইস্কুল বাড়িটি আংশিক পাকা করলেন। শিরীষমোড়ে বাস দাঁড়াতে শুরু করল। টেস্ট-রিলিফের কাঁচা-রাস্তা ধরে বিভিন্ন গাঁয়ের মানুষ শিরীষমোড়ে এসে বাস ধরতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্য চলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে মেদিনীপুর থেকে ছুটে এলেন রাম মাইতি, সুধীর বেরার কাছ থেকে জমি খরিদ করলেন, আর সেই জমিতে অতিক্রুত গড়ে তুললেন আড়ত, শুরু করলেন বিভিন্ন রকমের ব্যবসা। দেখতে দেখতে একদিন নির্জন শিরীষতলা শিরীষমোড় নামে এক ব্যস্ত মোড়ে রূপান্তরিত হ'ল।

টেস্ট-রিলিফের এই কাঁচারাস্তাটি বানিয়েছিল শিউলী গাঁয়ের আদিবাসীরা। ওই হামরুরাই। হামরুর নেতৃত্বে অনেক দিন ধরে ওরা কাজ করেছিল। নারী-পুরুষ মিলে অনেকেই সেদিন কাজ করেছিল, কেউ নিয়মিত, কেউ-বা অনিয়মিত। তুলসী ? হ্যাঁ তুলসী তো ছিলই, নইলে আর তাকে নিয়ে নাটক হবে কি করে ?

তুলসীর কোলে তখন বাচ্চা, মানে তার ছোট ছেলে। বয়েস বছর খানেক হবে। ওদের মধ্যে আর-একজনের কোলেও তখন বাচ্চা ছিল। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, চম্পির কোলেও তখন বাচ্চা। তার বয়েস আরো কম।

তুলসী আর চম্পি বাচ্চা কোলে নিয়েই কাজে যেত। সর্বত্র তাই-ই ওরা যায়। এটা ওদের এক আবশ্যকীয় এবং প্রচলিত প্রথা। অনিবার্য

প্রয়োজনেই এই প্রথার প্রবর্তন এবং প্রচলন। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই যেখানে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করতে হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে যে সমাজের প্রতিটি সদস্যকেই অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেখানে বাচ্চাদের লালন-পালন আর পরিচর্যা অন্য কিভাবে হতে পারে? বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য তো কারো বাড়িতে বসে থাকবার সুযোগ নেই।

তুলসী আর চম্পি প্রতিদিন একটা করে খেজুরের পাতার পটিয়া নিয়ে কাজে যেত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে চাটাই পেতে ওরা বাচ্চাদের শুইয়ে দিত। বাচ্চারা শুয়ে-শুয়ে খেলা করত, মায়েরা অন্যান্যদের সঙ্গে কাজ করত। বাচ্চাদের খিদে পেলে মায়েরা এসে পটিয়াতে বসত, বাচ্চাদের দুধ খাওয়াত। হয়তো এই সুযোগে মায়েদের ভাগ্যে একটুখানি বিশ্রামও জুটত। তা নিয়ে অবশ্য পুরুষরা বা অন্য মেয়েরা কোনো অভিযোগ করত না। ওরা সেটা করেও না। ঘুরে-ফিরে প্রায় সব মাকে-মেয়েকেই তো এ-সুযোগ নিতে হয়।

জায়গাটার নাম শিরীষমোড় না-হলেও শিরীষ গাছটি সেদিনও ছিল। তুলসী আর চম্পি ওই শিরীষগাছের ছায়াতে পটিয়া পেতে বাচ্চাদুটিকে শুইয়ে রাখত। ওরা শুয়ে-শুয়ে গাছের পাতা দেখত আর খেলা করত।

এই সময়ে এই জায়গাতেই ঘটনাটি ঘটেছিল। তুলসী আর চম্পির বাচ্চাদুটিও সেই নাটকের দুটি প্রাসঙ্গিক চরিত্র।

রেলওয়ের এক দক্ষিণ-ভারতীয় বড় অফিসার খড়্গপুর থেকে প্রায়ই এখানে বেড়াতে আসতেন। বিকেল চারটে সাড়ে-চারটে নাগাদ তিনি আসতেন মোটর সাইকেলে করে। এসে গাড়িটাকে কোনো নিরাপদ জায়গায় রাখতেন, তারপর কোনো ছায়াঘন স্থানে সবুজ ঘাসের আস্তরণ দেখে বসতেন। বসে-বসে তিনি হয়তো কোনো বই খুলে পড়তেন, পাখিদের কল-কাকলী মুগ্ধ হয়ে শুনতেন, গ্রামীণ মানুষদের সহজ সাবলীল কর্মময়তা মুগ্ধ হয়ে নিরীক্ষণ করতেন। কোনোদিন হয়তো বা সাথে করে একটা ক্যামেরা নিয়ে আসতেন, গাছপালা,

পশু-পাখি, প্রান্তর আর গ্রামীণ মানুষদের ছবি তুলতেন। ভদ্রলোক এসব করতেন আর একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যেতেন। চার-পাশে যারা থাকত তাদেরও দিতেন। দুর্বোধ্য জেনেও গ্রামীণ মানুষদের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করতেন তিনি। তাঁর ভাষাও কেউ বুঝত না, তবুও সবাই ভদ্রলোকের সান্নিধ্য পছন্দ করত। তাঁর ব্যবহারে সবাই বিস্মিত হ'ত, আবার মুগ্ধও। এইভাবে ক্রমে-ক্রমে ভদ্রলোক একদিন সবার পরিচিত হয়ে গেলেন।

হামরুরা কাজে আসত সকাল সাতটা সাড়ে-সাতটার মধ্যে। দুপুরে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে যেত, পান্তা-টান্তা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিরে আসত দুটো-আড়াইটের সময়ে। বাড়ি থেকে দূরে কোথাও কাজ হলে অবশ্য তা করে না, তখন হাঁড়িতে করে দুপুরের পান্তা নিয়ে যায়, দুপুরে বাড়ি ফেরে না। শিরীষমোড় তো বাড়ির কাছেই, তাই ওরা দুপুরে ঘরে যেত।

বসে-বসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে সাগ্নিক যেন একটু ক্লান্তি বোধ করে, যদিও তুলসীর অকাল মৃত্যুর দিনে এসব কথা ভাবতে তার খারাপ লাগছিল না। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে-শুয়ে সেই নাটকীয় ঘটনার কথাই ভাবছিল।

প্রথমদিকে ভদ্রলোকের বসবার কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। এক-একদিন এক-এক জায়গায় বসতেন। কিন্তু তুলসীরা এখানে কাজ করতে আসার পর ভদ্রলোক প্রতিদিনই ওই শিরীষমোড়ে শিরীষের ছায়ায় শায়িত তুলসী আর চম্পির বাচ্চাদুটির কাছে বসতে লাগলেন। ভদ্রলোক বাচ্চাদুটির কাছে বসতেন, ওদের সঙ্গে কথা বলতেন, খেলা করতেন। এইভাবে চলতে চলতে একদিন যেন বাচ্চাদুটির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ভদ্রলোক ওদের জন্য প্রায়ই কিছু-না-কিছু টুকিটাকি উপহার নিয়ে আসতে লাগলেন। ওদের সান্নিধ্যে ভদ্রলোকের অপরাহ্ণের অবসরটুকু এইভাবে ভালোই কাটছিল বলা চলে। আর এই অসম বন্ধুকে কাছে পেয়ে শিশুদুটিও বোধহয় খুশি হ'ত।

হামরুদের সাথেও ভদ্রলোকের কথাবার্তা হ'ত, যদিও কোনো পক্ষই কারো কথা বা ভাষা বুঝতে পারত না। ভদ্রলোক বোধহয় খড়্গপুরে নতুন এসেছিলেন, বাংলাই বুঝতেন না, সাঁওতালী ভাষা বুঝবার তো প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে হামরুরা আবার সাঁওতালী এবং স্থানীয় বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝে না। তবুও হামরুরা ভদ্রলোকের সঙ্গ মেনে নিয়েছিল। আর এই নৈকট্য চলতে-চলতে একদিন ঘটে গেল সেই অঘটন।

ঘটনাটা যেদিন ঘটেছিল সাগ্নিক সেদিন শিউলী গাঁয়ে ছিল না। তবে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিল, ফিরে এসে সব শুনেছিল।

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। অফিসার ভদ্রলোকটি যথারীতি এলেন, শিরীষতলায় গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাচ্চাদুটির কাছে এগিয়ে গেলেন। সেদিন বাচ্চাদুটির জন্য ভদ্রলোক দুটি নতুন জামা কিনে এনে-ছিলেন। তুলসী আর চম্পি তখন পটিয়াতে বসে বাচ্চাদের দুধ খাওয়া-চ্ছিল। ভদ্রলোক হাসিমুখে আদর করার ভঙ্গিতে বাচ্চাদের গায়ের ওপর জামাদুটি ছুঁড়ে দিলেন, ইঙ্গিতে তুলসী আর চম্পিকে জামাদুটি ওদের পরিয়ে দিতে বললেন। চম্পির দুধ খাওয়ানো তখন শেষ হয়ে গেছে, সে তার বাচ্চাকে জামাটা পরিয়ে আবার শুইয়ে দেয়, সে শুয়ে শুয়ে খেলা করতে থাকে। তুলসীও তার ছেলেকে জামা পরিয়ে শুইয়ে দেয়, কিন্তু চম্পির ছেলের মতো সে শুয়ে থাকতে চায় না, কাঁদতে থাকে। তুলস বাচ্চাটাকে আবার কোলে তুলে নেয়, একটা স্তনের বোঁটা তার মুখে পুরে দেয়, তার কান্না থেমে যায়।

এই সময়ে হামরু ওদের ডাকে, একটু তাড়াতাড়ি করতে বলে। চম্পি তুলসীর জন্য অপেক্ষা না-করে এগিয়ে চলে। তুলসী তখনো ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে, আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বাচ্চাদের আচরণ লক্ষ করছেন।

চম্পি অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। পেছন থেকে তুলসীর চিৎকার শুনে সে ফিরে তাকায়, দেখে ছেলেটিকে কোলে নিয়েই তুলসী লোকটির

নাকে-মুখে ঠাস-ঠাস করে চড় মেরে চলেছে আর চিৎকার করে সবাইকে ডাকছে। চম্পিও চিৎকার করে ওঠে। ওদের চিৎকার হামরুদের কানে গিয়ে পৌঁছয়, সবাই ছুটে আসে।

তুলসী ওদের উদ্দেশে কি-সব বলল। আর ভদ্রলোক কিছু বুঝে উঠবার আগেই সবাই মিলে ওকে মারতে শুরু করল। সে কি মার, বাপরে বাপ। ভদ্রলোক দক্ষিণ-ভারতীয় মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজী আর ভাঙা-ভাঙা হিন্দী মিশিয়ে ওদের কত বুঝোতে লাগলেন, কাকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ওরা তখন নিরবছিন্নভাবে মেরে চলেছিল। মারতে-মারতে লোকটিকে প্রায় শেষ করে এনেছিল। শেষ করেই ফেলত যদি যুগল আর পূরণ ছুটে না-আসত।

ঘটনার সংবাদ বা রেশ তখন শিউলী গাঁয়ে পৌঁছে গেছে, সাঁওতাল পল্লী আর সদ্‌গোপ পাড়া, দুই মহল্লাতেই। বেশি তো দূর নয়, মারামারি দেখাই যাচ্ছিল। ব্রজেন ঘোষ নিজের উঠোনে দাঁড়িয়েই সব দেখলেন। কিন্তু ছুটে আসেননি। সদ্‌গোপ পাড়ার কেউই আসেনি। শিরীষমোড়ে বা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা অসাঁওতাল কোনো মানুষই লোকটিকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না। ব্রজেন ঘোষের মতো সবাই দূরে দাঁড়িয়ে সাঁওতাল-দের কাণ্ডকারখানা দেখে মজা উপভোগ করতে লাগল। সাঁওতাল পাড়া থেকে অবশ্য অনেকেই ছুটে এসেছিল, তার মধ্যে ছিল যুগল আর পূরণও।

যুগল তখন পূরণের বাড়িতেই ছিল। বাঁশ না কি একটা কিনবে বলে ইস্কুল ছুটির পর সে বাড়ি না গিয়ে পূরণের বাড়িতে গিয়েছিল, তখনো সেখানেই ছিল। যাই হোক ওদেরই চেষ্টায় সেদিন ওই ক্ষিপ্ত জনতা বাগে এসেছিল, মারপিট থেমেছিল। ওরা সময় মতো এসে না-পৌঁছলে সেদিন যে কি হ'ত কিছুই বলা যায় না।

মারপিট থেকে ক্ষান্ত হয়ে হামরুরা সমাজের কাছে বিচার চায়। লোকটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা শিউলী প্রাইমারী ইস্কুলে উঠল। সেখানেই বিচার বসল। পূরণ আর বিশ্বনাথ বিচারকের দায়িত্ব পালন করল। যুগলকেও ওরা বিচারক হতে বলেছিল, সে রাজী হয়নি।

বিচারকদের রায়ে লোকটির কাসুর প্রমাণিত হয়, লোকটিকে সবাই দুষী বলে সাব্যস্ত করে। সাজাহ্ হয় দুশো টাকা জরিমানা। লোকটির কাছে তখন অত টাকা ছিল না, তাই জামানীস্বরূপ ওর মোটর-সাইকেলটি ওরা আটকে রাখে। স্থির হয়, ওটা পুরণের বাড়িতেই থাকবে, পরের দিন বেলা দশটার মধ্যে টাকা দিয়ে লোকটি গাড়িটি ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। পরের দিন ভদ্রলোক টাকা নিয়ে দশটার আগেই এসেছিলেন, টাকা বুঝিয়ে দিয়ে গাড়িটি ফেরত পেয়েছিলেন।

এই ঘটনার কিছু তথ্য সাগ্নিক সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে এসেই পেয়েছিল, বিস্তারিতভাবে সব কথা জেনেছিল পরের দিন সকালে যুগলের মুখ থেকে।

লোকটির বিরুদ্ধে তুলসীর অভিযোগটা কি ছিল? লোকটি এমন কি করেছিল যার জন্য তুলসী বা হামরুরা ওরকম ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল? তুলসী যখন মাই বার করে কোড়া গিদরাকে তোয়া খাওয়াচ্ছিল তখন লোকটি কোড়ার মুখে চুমু খাওয়ার ছলে নাকি তুলসীর স্তন ধরেছিল।

এই হ'ল তুলসী, এই হ'ল তার চরিত্র, চরিত্রের দার্ঢ্য। এ হেন তুলসীর দেহের প্রতি কারো লোভ থাকলেও, ওকে স্পর্শ করা কি খুব সহজ ছিল? না, ছিল না। বিশেষ করে এই ঘটনার পর কারো সাহস হ'ত না। এটা ছিল এমন একটি ঘটনা যা দীর্ঘদিন শিউলী গাঁয়ের বাতাসকে ভারী করে রেখেছিল। এই ঘটনা ওর সম্পর্কে সবাইকে আরো সচেতন করে তুলেছিল, সাবধান করে দিয়েছিল। ওর মন স্পর্শ করতে বা ঢল-ঢল যৌবনের প্রতি কামুক দৃষ্টি ফেলতে আর কেউ সাহস পায়নি। ওর নিরাবরণ কিংবা অর্ধ-আবৃত বক্ষ, শাড়ির আড়ালে মাদকতা-মাখানো আঁটোসাটো শরীরটা সংগোপনে দেখে তৃপ্তি পাওয়া ছাড়া আর-কিছু করবার দুঃসাহস কারো ছিল না। নইলে, সাগ্নিক জানে, তুলসীর ওই শরীরের প্রতি অনেকেরই লোভ ছিল। এবং ব্রজেন ঘোষও কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না। ঘোষগিন্নীও সেটা জানতেন।

॥ চা র ॥

তুলসীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন একসময় সাগ্নিক ঘুমিয়ে পড়েছিল। চারদিক থেকে শাঁখ বেজে উঠতেই সে-ঘুম ভেঙে যায়। সে বুঝতে পারে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

পারুল ঘরে ঢুকলো একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন নিয়ে, সেটা টেবিলের ওপর রেখে সে আবার বেরিয়ে গেল। বারান্দা থেকে হামরু, মাতাল, ট্যাংরা আর ছোটকটাইয়ের কথা শুনতে পায় সাগ্নিক। ওরা পদ্মপুকুরের মাটি কাটার ব্যাপারে ব্রজেন ঘোষের সঙ্গে কথা বলছিল।

বিছানা থেকে নামল সাগ্নিক, গামছা কাঁধে নিয়ে পুকুরের উদ্দেশে বেরিয়ে যায়।

পুকুর থেকে মুখহাত ধুয়ে ফিরে আসার পথে হামরুদের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল। ব্রজেন ঘোষের বাড়ি থেকে কলাবাগানের পাশ দিয়ে সাঁওতাল-পল্লীর দিকে যে আঁকাবাঁকা সরু পথটি চলে গেছে, হামরুরা সেই পথেই ফিরে যাচ্ছিল। এই সংকীর্ণ পথেই ওদের সঙ্গে সাগ্নিকের দেখা হ'ল। আধো-অন্ধকারেও হামরুরা ওকে চিনতে পারল। দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। হামরু বলল, তুই মাষ্টরবাবু লয় ?

সাগ্নিক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কে রে, হামরু ?

হেঁ।

কাজ হয়ে গেল ?

হেঁ।

একটুক্ষণ নীরব থেকে সাগ্নিক বলল, শ্মশান থেকে ফিরে আসার পরের সব কাজ ঠিকভাবে হয়েছে তো ?

হেঁ। হামরু ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল।

মৃতদেহ সংকারের অব্যবহিত পরে সেদিনই কিছু কিছু পারলৌকিক

কাজ ওরাও করে থাকে। মোরঘাটি থেকে সবাই ওড়াকে ফিরে আসার পর বাঁবড়ে তিনটি গিদরা সিমইঙ্গা, বাচ্চা কুকড়া মেরে তার সাথে সামান্য চাল মিশিয়ে খিচুড়ি মতো একটা-কিছু রান্না করে। ছোট্ট নারকেলের মালা বা মাটির সরায় করে সেটাকে মৃতের ঘরের চালের এক কোণে ঝুলিয়ে রাখে, আর নিহত কুকড়া তিনটের তিনটি পালক গুঁজে রাখে চালের মট্‌কায়। এই হ'ল প্রথম দিনের পারলৌকিক ক্রিয়া। অবশ্য এরপরও কাজ থাকে। আসল কাজ হ'ল ভাড়ান অর্থাৎ শ্রাদ্ধ। ভাড়ানের পর থাকে দামোদরের জলে মৃতের মাথার পাথর বা হাড় আর তার পরিধেয় বস্ত্র-বিসর্জন। সব কাজ বলতে সাগ্নিক প্রথম দিনের ওই পারলৌকিক কাজের কথাই বলেছিল।

সবাই একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে সাগ্নিকই প্রথম কথা বলল, দমনের খবর কি, সে এখন কি করছে?

দমনের কথা শুনে হামরুরা সবাই যেন একসঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। অন্ধকারের মধ্যেও সাগ্নিক ওদের দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শ পেল। সেই দীর্ঘশ্বাসের রেশ কণ্ঠে নিয়েই হামরু বলল, পটিয়া পাতে ত্যাখন যে ছটকায় পড়ছে, আর উঠছেনি।

সাগ্নিক বলে, কিন্তু এভাবে পড়ে থাকলে তো চলবে না।

হামরু বলে, সিটা তো ঠিকই মাষ্টরবাবু, উয়ারে উঠায়ে লিতে হবে।

হামরুর কথা শেষ হতে না-হতেই মাতাল বলল, বহুৎ সময় লাগে মরবে মাষ্টরবাবু।

হামরু যেন আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, বলে, দমনার দুখটা যে কত বড় সিটা মোরা বুঝতে লারিঠি মাষ্টরবাবু।

ভারী গলায় ট্যাংরা বলল, তুলসীয়ারে দমনা বহুৎ ভাগী করতি মাষ্টরবাবু।

ছোটকটাই ধরতাই জুড়লো, তুলসীও উয়ারে তেমনি ভাগী করতি।

হামরু করুণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, দুটাই দুটারে সমান ভাগী করতি। মুই তো বহুতদিন তোয়ারে বলছি মাষ্টরবাবু, মোদের সামাজে এমনি ভাগী

কেউ কোনোদিন দেখেনি, শোনেনি।

তুলসী আর দমনের দাম্পত্যজীবন, ওদের ভালোবাসা, ওদের বিবাহ-পূর্ব ভালোবাসা সবই এখানকার সবাই জানে। সাগ্নিকও সে-সব জানে বললে ভুল হয় না। তাছাড়া হামরুও একদিন চারঘণ্টা ধরে তুলসী-দমন উপাখ্যান বিস্তারিতভাবে সাগ্নিককে শুনিয়েছিল। সাগ্নিক তার সবটুকুই বিশ্বাস করেছিল, এখনও করে। অতএব তুলসীর মৃত্যুটা যে দমনের জীবনে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের মতো দেখা দেবে তাতে সাগ্নিকের মনে কোনোই সন্দেহ নেই। হামরুর কথা শুনে তাই সে কিছু বলতে পারল না, নীরবে দমন-তুলসীর ভালোবাসার কথা ভাবতে লাগল।

সাগ্নিককে নীরব দেখে হামরু বলল, মোরা যাইবি মাষ্টরবাবু।

ীর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর থেকেই সাগ্নিকের মনে এক বিষণ্নতার সুর। শ্মশানের দৃশ্য দেখার পর সেই বিষণ্নতা আরো ভারী হয়ে তার বুকে চেপে বসেছিল। তুলসী-সম্পর্কিত রোমন্থন সেই বিষণ্নতাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিয়েছিল ঠিকই, তবে এখন হামরুদের সঙ্গে কথা বলার পর সেই বিষণ্নতা আবার ওকে আচ্ছন্ন করতে চাইল। ওইভাবেই সে বাড়িতে ঢুকল, ঘরে ঢুকে মুখ মুছল ভালো করে, মাথায় চিরুনি দিল, তারপর টর্চ হাতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কোথাও না-দাঁড়িয়ে একেবারে টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় নেমে হাওয়া খেতে লাগল।

এই অঞ্চলের আবহাওয়ার এই একটা বৈশিষ্ট্য! গরমকালে দিনের বেলায় প্রখর সূর্যতাপ আর দাবদাহ থাকা সত্ত্বেও সূর্যাস্তের আগেই এক স্নিগ্ধ ও মনোরম হাওয়া উড়ে এসে মানুষের তাপদগ্ধ শরীরকে শান্ত করে, স্নিগ্ধ করে, শীতল করে। মানুষ ফিরে পায় স্বস্তি আর সুস্থতা। উন্মুক্ত প্রান্তর, জনহীন রাস্তাঘাট, এমনকি গৃহস্থের অনাচ্ছাদিত আঙিনায় বেশিক্ষণ থাকলে শীতও লাগতে পারে শরীরে। এখানকার মানুষ বলে, দীঘার সমুদ্র-সৈকত থেকে উড়ে-আসা সামুদ্রিক হাওয়ায় মিলেমিশে

এখানকার বাতাস এমনি স্নিগ্ধ। কাঁচারাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সাগ্নিক সেই হাওয়ার প্রলেপ পেল। ওর ভালো লাগল। এমনিতেই এই হাওয়া সাগ্নিককে প্রতিটি গ্রীষ্ম-রজনীতেই আকর্ষণ করে। মনটা যখনই কোনো ব্যাপারে ভারাক্রান্ত হয়, সে ছুটে আসে এই রাস্তায়, দীঘার সমুদ্র-সৈকত থেকে উড়ে-আসা এই স্নিগ্ধ-হাওয়ায় অবগাহন করে সে মানসিক ক্লান্তি দূর করে, মনের সুস্থ সাবলীলতা ফিরিয়ে আনে। আজও তার ভালো লাগছে, কিন্তু মনের ওপর চেপে থাকা ভারী বিষণ্ণতা থেকে কিছুতেই সে মুক্তি পাচ্ছে না। দমন-তুলসীর কথাই মনে আসছে ঘুরে ফিরে।

দমন-তুলসীর দাম্পত্যজীবন আর পারস্পরিক ভাগী বা ভালোবাসা সম্পর্কে হামরু, মাতাল, ট্যাংরা আর ছোটকটাই যা বলে গেল, তা সব সত্যি। শিউলী গাঁয়ের সবাই তা জানে। এমনকি সাগ্নিকেরও তা অজানা নয়। এ-প্রসঙ্গে সাগ্নিকের তিনটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

আদিবাসী-পল্লীর সবাই ঘটনা তিনটির কথা জানে, জানে সদ্‌গোপ পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সকলেই। তবুও হামরু নিজের মুখে একদিন সাগ্নিককে ঘটনা তিনটির কথা বলেছিল। আর হামরুর বলা মানেই হ'ল তাতে অতিরঞ্জন নেই, নির্জলা সত্যি কথা। সাগ্নিকের আজ বারবার সেই ঘটনাগুলো মনে পড়ছে, এক-একটা ল্যাণ্ডস্কেপের মতো ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, দমন-তুলসীর দাম্পত্যজীবনের সেই ঘটনা তিনটির কথা ভাবতে ওর খারাপও লাগছে না।

তুলসী ছিল সাহসী, দারুণ সাহসী। এমনকি নির্ভীকও বলা চলে তাকে। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে ছিল দারুণ ভীতু। সেটা বোংগার ভয়, ভূতের ভয়। এই ভয়কে সে কোনোদিনই কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বাপলার পর এক বছরও তখন অতিক্রান্ত হয়নি। বুড়ো কটাইও তখন সুস্থ শরীরে জীবিত। সেদিন সে বাড়ি ছিল না। কুটুমঘরে গিয়েছিল। কথা ছিল যিন্দাবিলায় ফিরবে না, রাত কাটিয়ে ফিরবে পরদিন সিতাকবিলা। নতুন বহু আসার পর এটাই তার প্রথম বাইরে রাত-কাটানো। তখনো নতুন কক্ষা হয়নি ওদের, পুরনো কুঠরীতেই থাকে।

জোজো গাছের তলায়ও শোয়া শুরু হয়নি। সে তো আরো পরের ব্যাপার, কোড়া গিদরা হওয়ার পর সেটা শুরু হয়।

য়িন্দার পান্তা খেয়ে দমন আর তুলসী শুয়ে পড়ে। নানারকম গাল মারাও, গল্পগুজব করতে করতে এক সময় ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

মাঝরাতের ঘটনা। ইয়াকুব মিঞার পুকুর পাড়ের আমবাগানে এই সময়ে যেন কি-একটা শব্দ হয়। তুলসীর ঘুম ভেঙে যায়। সে কান পেতে শব্দটা শুনতে থাকে।

তুলসীদের সেদিনের সেই ভাঙা কুঁড়েঘরের চালে ছিল অনেক ফুটো, ছিটেবেড়ার ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়া দেওয়ালেরও তখন অন্তিম অবস্থা। মাটি খসে পড়েছে অনেক জায়গায়, কঞ্চি ভেঙে জানালা-দরজা তৈরি হয়েছে আপনা থেকেই। সেইসব ফাঁক-ফোকর আর চালের ছিদ্র দিয়ে বাইরের অনেক-কিছু তখন দেখা যেত।

সেদিনের রাতটা আবার ছিল কুঁনামী। পূর্ণিমা। কুঁনামীর স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে চালের ছিদ্রপথে তুলসী ইয়াকুব মিঞার আমবাগানে কি যেন একটা দেখতে পায়। তুলসীর বোতোর লাগে। ভয় পায়। বোংগা-বোংগা বলে সে চিৎকার করে ওঠে।

দমনের ঘুম ভেঙে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাপারটা বুঝে ফেলে। তারপর তুলসীর বোতোর ভাঙাতে সারারাত তার কী প্রয়াস! সে উঠে বসে। প্রথমে নানারকম গাল মারাও দিয়ে সে তুলসীকে স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করে। তুলসীর ভয়টা তাতে একটু কমলেও সে স্বাভাবিক হয় না, ভয়ে আর ঘুমও আসে না। দমন তখন তুলসীর বোহোক কোলের ওপর টেনে নিয়ে ওকে শুইয়ে দেয়, সারারাত তুলসীর গায়ে হাত বুলায়, নানারকম গাল মারাও দ্বারা ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। সমস্তটা রাত বসে বসে দমন এই করেছিল, শোয়নি, ঘুমোয়নি। তুলসীও যেন নির্ভয়ে হেরেলের কোলে মাথা রেখে, স্বামীর আদর খেতে-খেতে নিরাপদে ঘুমিয়েছিল।

এই ঘটনাটা বলার পর হামরু মন্তব্য করেছিল: মাষ্টরবাবু, এমনি বোতোর লাগা, এমনি করে বহুর বোহোক নিয়ে সারা য়িন্দা জেগে বসে

থাকা, এমনি করে হেরেলের কোলকে মাথা রাখে সারা য়িন্দা ঘুমে থাকা, মোদের সামাজে লেই মাষ্টরবাবু।

এ-ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখনো সাগ্নিক শিউলী গাঁয়ে আসেনি। তার অল্পদিন পরেই এখানে এসেই এ-কাহিনী সে শুনেছিল, হামরুর কাছ থেকে শুনেছে আরো অনেক পরে। সেদিন কিন্তু সে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও শুনেছিল। সাঁওতাল-পল্লীর বিদ্রূপটা ততো মারাত্মক ছিল না। তবে সদ্‌গোপ পাড়ার বিদ্রূপটা বড় অশালীন। ঘোষগিন্নীকেও সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অংশ নিতে দেখেছে সাগ্নিক।

ঘোষগিন্নী প্রায়ই বলতেন, মোরা জানত্তি দমনাটা বোবা, অখন দেখিঠি সৌটা তো কথা বলতে পারে। অখন থাকতে দমনার মুখ থাকতে কিছু শুনতে হলে তুলসীরে অর কোলকে শুইয়ে দিতে হবে। আবার এরই ফাঁকে তিনি স্বামীর উদ্দেশে বলতেন, দমনার মতো অমনি ভালো-বাসতে পারু তুমি? বলেই হেসে উঠতেন।

সেদিন এসব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনে সাগ্নিক যা ভাবত, ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠবার পর, স্বয়ং হামরুর মুখ থেকে ঘটনাটি শোনার পরও সে তাই ভেবেছিল। আজও সে তাই-ই ভাবছে।

এমন ভালোবাসা সাঁওতাল সমাজে কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক, শুনুক আর না-ই শুনুক, দমন আর তুলসীর মধ্যে তা তো ছিল। তাই যদি হয় তবে আর তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কলুষিত করা কেন? আর তাতে দমন-তুলসীরই বা কি যায় আসে? এটা তো ঠিক যে ওই রাতে তুলসীর প্রতি দমনের ঐকান্তিক ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছিল? এটা তো ঠিকই যে তুলসী চিরকালই দমনের ওই অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়ে গেছে? এটা তো ঠিকই যে তুলসীও তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে দমনকে ভালোবেসে গেছে। এটা তো মিথ্যে নয় যে তুলসীর ওই উজাড়-করা ভালোবাসা পেয়ে দমন জীবনের এক ভিন্নতর অর্থ খুঁজে পেয়েছিল যা অনেক স্বামীই পায় না। তাই তো আজ তুলসীকে হারিয়ে দমন নিজেকে নিঃস্ব ভাবছে, রিক্ত ভাবছে, সর্বস্বহারা ভাবছে। তাই তো বারান্দায় পাতা

চাটাই থেকে তাকে কিভাবে ওঠানো হবে তাই ভেবে-ভেবে অস্থির হচ্ছে তার প্রাণের বন্ধু হামরু।

আর-একটা ঘটনা। প্রথমটার ঠিক উল্টো। প্রথমটি যেমন তুলসীর প্রতি দমনের একনিষ্ঠ ভাগীর নিখুঁত ছবি, এটি তেমনি দমনের জন্য তুলসীর মমতা, কাতরতা আর ভালোবাসার সর্বস্ব সমর্পণের দৃষ্টান্ত। বুড়ো কটাইয়ের গচের সময়ে ঘটেছিল এটা।

বুড়ো কটাইয়ের বয়স তখন ষাটের দু-এক বছর এ-ধার ও-ধার হবে। সঠিক হিসাব তো আর ওদের থাকে না। এই বয়েসেই কি এক কাল-ব্যাধি যে তাকে আক্রমণ করল কেউ তা ধরতেই পারল না। সারা হোড়মো ওজো হয়ে গেল, ফুলে গেল। শরীরের স্বাভাবিক ইন্দে রঙের বদলে অন্য এক বিদ্‌ঘুটে আর বীভৎস কালো রঙ এসে তার গোটা শরীরকে এক কুৎসিত দেহে রূপান্তরিত করল। লাচটা ফুলল সবচেয়ে বেশি, যেন একটা ঢাকের মতো হয়ে গেল। সবাই তখন ওকে দেখে চমকে ওঠে, ভয় পায়। বুড়ো কটাইয়ের অবস্থা তখন একেবারে কাহিল। পরিচিত ছোট-বড় সব রারানিচকেই ওরা দেখালো। কিছুতেই কিছু হ'ল না। সব ঝাড়ফুঁক, গাছগাছড়া, গুলিগুণ্ডি, সব রান ব্যর্থ করে দিয়ে বুড়ো কটাইয়ের অবস্থা দিন-দিন খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যেতে লাগল। সবাই ধরে নিল বুড়ো কটাইয়ের গচ্‌ আসন্ন।

শ্বশুরকে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা সেদিন তুলসীই প্রথম ভেবেছিল। তুলসীর কথা শুনে প্রথমে সবাই অবাক হলেও শেষপর্যন্ত ওর কথাই সবাই মেনে নিয়েছিল। মিটিনে স্থির হ'ল বুড়ো কটাইকে সবাই নিয়ে যাবে ডুলিতে করে, দমনও ডুলিবাহকদের সঙ্গে যাবে। হাসপাতালে দমনই থাকবে বাবার কাছে। আর তুলসী একাই বাড়িতে থেকে ঘরগেরস্থালী আর গরু-বাছুরের দেখাশোনা করবে সে-ক'দিন। তুলসীর কোলে তখন তার বড়ছেলে পিংরু।

কিন্তু কী আশ্চর্য! স্থির হ'ল একরকম আর সময়কালে দেখা গেল অন্যরকম। পিংরুকে হামরুর বউ বাতাসীর কাছে রেখে সে-ও দমন আর

ডুলিবাহকদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে ওকে দেখল। কেউ-কেউ বা ওর চরিত্র বিশ্লেষণও শুরু করল। সবাই বুঝল, স্বামীকে হোংহার বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে পাঠিয়ে দিয়ে তুলসী নিশ্চিন্তে ওড়াকে থাকতে পারবে না বলেই সবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে দমনের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল। দমনের প্রতি তুলসীর এই নির্লজ্জ ভাগী দেখে মুমূর্ষুকে তংকায় নিয়েও সেদিন লান্দা করেছিল, হেসেছিল সবাই।

বুড়ো কটাইকে ওরা হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এল। কটাই সেদিন মরল না, তার পরের দিনও না, মরেছিল তারও পরের দিন। চূড়ান্ত বিস্ময়ের কথা এই, বাবার যখন গচ্ হয় দমন তখন হাসপাতালে ছিলই না। তুলসী বুঝেছিল বুড়ো কটাই সেদিন মারা যাবে, তাই কৌশলে দমনকে ওড়াকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, আর সে একাই সেদিনের সব দায়িত্ব পালন করেছিল, বহন করেছিল সব ঝক্কি-ঝামেলা।

এ-ঘটনার কথা শুনে সাঁওতাল-পল্লীর অনেকেই সেদিন চমকেছিল। দমনকে অনেকেই দুষী বলেছিল। আপার গচের সময়ে জোয়ান কোড়া হয়ে সে পাশে থাকেনি, এটাকে তার কাসুর বলেছিল অনেকেই। দমনের অবশ্য তাতে লাভক্ষতি কিছুই ছিল না। পরম বন্ধু হামরু আর তুলসী তার পাশে থাকলে সে ভয় পায় না। তুলসীর সেদিনের ভূমিকা-সম্পর্কে অনেকেই সেদিন নানা মন্তব্য করতে ছাড়েনি। দুখ এবং ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যই যে তুলসী সেদিন ওকে ওড়াকে পাঠিয়ে দিয়েছিল এতে কারো কোনো সন্দেহই ছিল না। আর, একটা সাঁওতাল মেয়ের পক্ষে যা প্রায় দুঃসাধ্য, বোংগার বোতোর নিয়ে তুলসী সেদিন তাই করেছিল। তুলসীই সেদিন হোংহার বাবার গচের অব্যবহিত পরের সব কাজ একাই করেছিল পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

দমনের জন্য তুলসী কেন এত করেছিল? এটা কি তার একনিষ্ঠ ভাগীর পরিচয় নয়? আজ তুলসীর মৃত্যুর পর তার সেই একনিষ্ঠ, অকৃত্রিম আর দুর্লভ প্রেমের কথা দমন কি করে ভুলবে? দুর্লভকে

হারানোর মর্মান্তিক বেদনাই না আজ তাকে পটিয়া পেতে শুয়ে পড়তে বাধ্য করেছে ?

আরও একটা ঘটনার কথা সাগ্নিকের মনে পড়ছে। এ-কাহিনী সাঁওতাল-পল্লী ও সদ্‌গোপ পাড়া, দুই মহল্লাতেই সকলের জানা। তবুও হামরুর মুখ থেকে শোনার পরই সাগ্নিক নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তাই তো আজ তুলসীর মৃত্যুর দিনে সে-ঘটনাও সাগ্নিকের মনের পর্দায় ভেসে উঠছে।

ওদের বিয়ের পরের বছরের শীতকাল। পিংরু তখনো হয়নি। তুলসী আর দমন দু'জনেই বাইরে কাজ করছে, নগদ পয়সা-কড়ি কিছু ঘরে আসছে। বুড়ো কটাই আর দমন নিজেদের ওতটুকু ভালো করে চাষ করেছে, বিঘে তিন-চার জমি বর্গাও করেছে। ধান ভালোই হয়েছে। নতুন কন্ধা অবশ্য তখনো ওরা শুরু করতে পারেনি। তবুও তুলসীই ওদের সব উন্নতির মূলে।

দমনের আয়ো বালি অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। দমনের বয়স তখন আট-দশ বছর হবে বড়জোর। সেই তখন থেকে বহুরূপে তুলসীর আগমন পর্যন্ত বুড়ো কটাইয়ের ওড়াক মায়জিউয়ের কল্যাণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই পোরোব-টোরোব কিছু অনুষ্ঠিত হয়নি বুড়ো কটাইয়ের ওড়াকে শুধু সেবারের চড়ক-পোরোব ছাড়া। অবশ্য সেই চড়ক-পোরোবই আজ তুলসীকে এ-বাড়ির বহু করে এনেছে। কিন্তু সে-কথা এখন নয়। বুড়ো কটাইয়ের ঘরে পোরোব হবেই বা কি করে ? রমণীর কল্যাণ স্পর্শ না-থাকলে কি পরব হতে পারে ? তাই সেবার বুড়ো কটাই, দমন আর তুলসী, তিনজনে মিলে স্থির করল, নিজেদের ওড়াকে ওরা শাকরাত পোরোব করবে।

শাকরাত মানে হ'ল মকর-সংক্রান্তি বা পৌষ-সংক্রান্তি।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। প্রথমে ওরা হামরুর বাবা বাংরুকে ডেকে পরামর্শ নেয়। বাংরুই তখন ওদের বাঁবড়ে। কী কী জিনিসপত্র কিনতে হবে ওরা বাংরুর কাছ থেকে জেনে নেয়। সবই তো ওদের কিনতে হবে, ঘরে তো কিচ্ছুটি নেই। আগে থেকেই তার জন্য তৈরি

হওয়া দরকার। পরের দিন বুড়ো কটাই বেলদায় যায়, একটা ছোট্ট গিদরা ঘুষুর কিনে নিয়ে আসে। তুলসী শনিচার-হিলোক কালিয়াচকের হাটে গিয়ে নতুন টক্‌ই, মালা-ঘুনসি, সিঁতুর-গামছা, প্রয়োজনীয় বাখর, সবই কিনে নিয়ে আসে। তুলসীর বড় সাধ, সে নিজের-হাতে-তৈরি হাড়িয়া আর ঘুষুরের পিঠে হেরেল আর হোংহার বাবাকে পেট ভরে খাওয়াবে। খাওয়াবে হামরুদের সবাইকেও।

শাকরাত তিন দিনের পোরোব। পৌষ-সংক্রান্তির দিনের মূল পোরোবের নাম সিং-শাকরাত। তার আগের দিন হয় চাউড়ী-পোরোব, পরের দিন হয় আখান-পোরোব। পোরোবের মূল আকর্ষণ হাড়িয়া আর ঘুষুরের পিঠে। সিং-শাকরাত বা আখানের দিনে কোনো রাপাক হয় না, রান্নাবান্না সব সেরে রাখতে হয় চাউড়ীর আগে। তারপর তিন দিন ধরে চলবে শুধু পুজো আর খাওয়া। আর পোরোবের অবিচ্ছেদ্য উৎসব রূপে চলবে মাদল আর সেরেঙ, পারলে এনেচও। দমন তো বাজনা, নাচ, গান কিচ্ছুই জানে না। অতএব তার কাছে পোরোব মানে হ'ল শুধু জোম-কানা খাওয়া।

চাউড়ীর দিন বাংরু বসল উৎসর্গ-পুজোয়। সব সামগ্রীতে মালা-ঘুনসি সিঁতুর লাগিয়ে দেয়। এমনকি ঘুষুরকেও উৎসর্গ করে নিতে হয়। এর বাইরের কোনো জিনিসে ওই ক'দিন হাত দেওয়া চলে না।

বাতাসী সেদিন ওদের বাড়িতে থেকে সারাদিন তুলসীকে সাহায্য করেছিল।

এর মধ্যে তুলসীর নির্দেশে দমন ঘুষুরটিকে মেরে এনেছে। সমস্ত জেলটা ছোট-ছোট টুকরো করেছে। তার কিছুটা জেল দমনের, আর তিন বন্ধু মাতাল, ট্যাংরা আর ছোটকটাইদের ওড়াকে পাঠানো হ'ল। অনেকটা জেল তখনো ছিল। তুলসী সেই সবটা মাংসের পিঠে ভেজেছিল সেদিন। বাতাসী অবশ্য তাকে সাহায্য করেছিল। তবুও এত পিঠে ভাজা তো চাট্টিখানি কথা নয়। সব জেল কেটে-কেটে ছোট-ছোট টুকরো করে গাঢ় করে গুলানো চালের গুঁড়িতে ভিজিয়ে ওপরে নিচে শালপাতা

রেখে কড়াইয়ে করে ভাজা কি সহজ কথা? তবুও তুলসী তা করেছিল। তবে অন্যান্য রান্না কিছুই করতে পারেনি, তার দরকারও হয়নি।

রাপাক শেষ হলে বাংরু সেদিনের পুজোয় বসে। চাউড়ীর হাড়িয়া আর ঘুষুরের পিঠে পুজোর জায়গায় নিয়ে আসে। এগুলো কেবল চাউড়ীর দিনেই খেতে হবে। অন্যান্য সব ওদিন স্পর্শ করা যাবে না। প্রতিদিন পুজো হবে আর উৎসর্গ-করা পিঠে আর হাড়িয়া খেতে হবে। এভাবেই চলবে তিন দিন। চাউড়ী পুজো একসময় শেষ হ'ল। বাংরুই প্রথম জাম হাড়িয়া আর একখণ্ড পিঠে খেয়ে উদ্বোধন করে। তারপর চলে শুধু জোমকানা, খাওয়ার পালা।

তুলসীই সবাইকে খেতে দিয়েছিল। একসাথে খেতে বসেছিল হামরুদের বাড়ির সবাই আর বুড়ো কটাই। তৃপ্তি করে সেদিন খেয়েছিল সবাই হাড়িয়া আর ঘুষুরের পিঠে।

কিন্তু দমন বা তুলসী? ওরা কখন খেয়েছিল? ওরা খেয়েছিল আরো অনেক পরে। আর ওদের সেই খাওয়াটাই হ'ল এই ঘটনার সারাংশ।

য়িন্দা যখন আরো গভীর হয়েছিল, হামরুরা সবাই যখন ওড়াকে ফিরে গিয়েছে, বুড়ো কটাই ছটকায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিকে চাউড়ীপুজোর মাদল-এনেচ-সেরেঙসহ সব কোলাহল স্তিমিত, স্তব্ধ, আর ওদের জীর্ণ ভাঙা-চালের ছিদ্রপথে কুঁনামীর আলো এসে তুলসীর মুখে স্নিগ্ধ-মাধুর্যের প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিল, তখন দুটিতে একসঙ্গে খেতে বসেছিল। তৃপ্তি করে পেট ভরে খেয়েছিল। শাকরাত-পোরোবের খাওয়া যে এত তৃপ্তির এর আগে কোনোদিন দুটিতে তা উপলব্ধি করেনি।

মজার কথা দমন বায়না ধরেছিল, নিজের হাতে খাবে না, তুলসীকে খাইয়ে দিতে হবে। খাইয়ে দিতে তুলসীর কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু সবার সঙ্গে খেতে বসলে সেটা কি করে সম্ভব? দমন তখন বায়না ধরে, সবার খাওয়া হয়ে গেলেই সে খাবে। সেটা যে একেবারেই ভালো দেখাবে না, হামরুরা কি ভাববে, এসব কথা তুলসী ওকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু দমন কিছুতেই শোনে না। তার সেই এক কথা। দমন নাছোড়-

বান্দা। দমনের আবদারের কাছে তুলসী হেরে গেল। আরো মজার কথা এই, গভীর রাত্রে খাওয়ার সময় কিন্তু আগের চুক্তি টিকল না। নতুন চুক্তি হ'ল কেউই নিজের হাতে খাবে না। ছু'জনই ছু'জনকে খাইয়ে দেবে। সেই মতো চাউড়ীর দিন ছু'জনে একসঙ্গে খেল, পরের ছুদিনও তাই।

ওইভাবে ওদের পিঠে খাওয়াটা একটা গল্প। দমন-তুলসী উপাখ্যানের একটা উপভোগ্য ঘটনা। এটা একটা মুখরোচক কাহিনীরূপে দীর্ঘদিন সাঁওতাল-পল্লীকে মুখর করে রেখেছিল। সদ্‌গোপ পাড়ায়ও এ-নিয়ে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ গড়ে উঠেছিল। এমনকি সাগ্নিক শিউলী গাঁয়ে আসার পর কিছু-কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও শুনেছিল। গল্পটার মধ্যে হাসির উপাদান যে একেবারে না-ছিল তাও নয়। কিন্তু শিউলী গাঁয়ে এসে এ-গল্প শোনার পর সাগ্নিক কিন্তু হাসেনি, বরং সে দমন-তুলসী ভালোবাসার গভীরতাকে পরিমাপ করতে চেয়েছিল শুধু।

দমনের কি আজ সে-সব কথা মনে পড়ছে না? তুলসীর অকাল মৃত্যু কি ওর মধ্যে সেই পূর্বস্মৃতি জাগাচ্ছে না? কে জানে এই স্মৃতি ওকে কোথায় নিয়ে যাবে! কে জানে ওকে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেবে কিনা!

॥ পাঁচ ॥

পরের দিনও একই সময়ে একইভাবে টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় ঘুরছিল সাগ্নিক। আজ অবশ্য তার মনে সেই বিষণ্ণতা নেই। তুলসীর অকাল মৃত্যু আর দমনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ যে সে ভাবেনি এমন নয়। আজও সে ওদের সম্পর্কে ভেবেছে, এমনকি দমনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকের সঙ্গে অনেক আলোচনাও করেছে। তবুও আজ সে স্বাভাবিক। আজ যে পুতুল এসেছিল, দীর্ঘক্ষণ দমন-তুলসী সম্পর্কে পুতুলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে

যে। হ্যাঁ, পুতুলের সঙ্গে কথা বলতে পারলে সাগ্নিকের মন হাল্কা হয়, মনের ভার কেটে যায়। তুলসী আর দমনের ব্যাপারটা পুতুলের সঙ্গে আলোচনা করতে পেরেছে বলেই সাগ্নিক আজ স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে। সেই স্বচ্ছন্দ মানসিকতা নিয়েই সাগ্নিক এখন টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় ঘুরে-ঘুরে দীঘার সমুদ্র-সৈকত থেকে উড়ে-আসা প্রবাসী মনোরম হাওয়ার প্রলেপ লাগাচ্ছিল নিজের দেহে এবং মনে।

খুশি মনে হাঁটতে হাঁটতেই সে রাম মাইতির গদি-ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। শিরীষমোড়ের কাছাকাছি কাঁচারাস্তার দু'ধারের ওই সমান্তরাল বাড়ি দুটি রাম মাইতির। বাঁ-পাশের ওই লম্বা বাড়িটি হ'ল গদি-ঘর। গদি-ঘরের তিনটি ভাগ। একভাগে ধান-চাল-গম খরিদ হয়, অন্য দু'ভাগ মিলে ধানভানা আর গম পেষাইয়ের কল-ঘর। ডানদিকের লম্বা বাড়িটিতেও তিনটি ঘর আছে। একটা ঘরে দাঁড়িপাল্লা ঝুলছে, ধান-চাল-গম ওখানেই ওজন হয়। মাঝখানের ঘরে মুদিখানা আর শেষ ঘরটিতে চায়ের দোকান। সব-কিছুরই মালিক একা রাম মাইতি।

সাগ্নিক রাম মাইতির গদি-ঘর পেরিয়ে খড়্গপুর-মেদিনীপুর পাকা-সড়কে উঠতে লাগল। এখন বেশ অন্ধকার। সাগ্নিক টর্চের ফোকাস ফেলতে ফেলতে শিরীষমোড়ে উঠে গেল।

মেদিনীপুর-খড়্গপুর পাকা-রাস্তাটি দৈর্ঘে-প্রস্থে খুব বড় না-হলেও অন্য রাস্তার সঙ্গে যেমন এর যোগাযোগ আছে, তেমনি এর পরিবহণ-গুরুত্বও অপরিসীম। মেদিনীপুর-খড়্গপুর লোকাল বাস আছে অগুন্‌তি, পাঁচমিনিট বাদে বাদে সার্ভিস। দীঘা আর কাঁথিগামী দূর এবং মাঝারী-পাল্লার বহু বাস-লরি এই পথেই যাতায়াত করে। তার ওপর আছে পুলিসের গাড়ি, অফিসের গাড়ি, ব্যবসায়ী মহাজনদের গাড়ি। আছে রিক্‌সা আর সাইকেল। গরুর গাড়ির ভীড় তো লেগেই আছে। অথচ অন্যান্য ব্যস্ত রাস্তার তুলনায় এটা বেশ সংকীর্ণ। পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে তাই অস্বস্তি লাগে। সাগ্নিক পাকা-সড়ক থেকে কাঁচারাস্তায় নেমে শিরীষমোড় থেকে রাম মাইতির গদি-ঘরের মধ্যবর্তী ওই নাতিদীর্ঘ পথে পায়চারি করতে থাকে।

এমনি করে একবার শিরীষমোড় থেকে রাম মাইতির গদি-ঘরের দিকে যাচ্ছে সে। হঠাৎ সামনের দিক থেকে ভেসে-আসা কিছু কণ্ঠস্বর শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে হামরু মাতাল আর ট্যাংরার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পায়। সাগ্নিক ভাবে, ওরা এদিকে কোথায় আসছে? রাম মাইতির দোকানে, কি শিরীষমোড়ে? সাগ্নিক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল না, তার আগেই হামরুরা ওর একেবারে কাছে চলে আসে।

সাগ্নিক টর্চের ফোকাস ফেলল আর এক করুণ দৃশ্য দেখে চমকে উঠল। হামরু, মাতাল আর ট্যাংরা, তিন বন্ধু তিনদিক থেকে দমনকে ধরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একি চেহারা হয়েছে দমনের! মোরঘাটিতে যা দেখেছিল তার চেয়েও ক্ষয়ে-যাওয়া চেহারা! দমন অকস্মাৎ বন্ধুদের হাত গলিয়ে নিচু হয়ে সাগ্নিকের পায়ের কাছে বসে পড়ে, তার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

দমনের এরূপ আচরণের জন্য সাগ্নিক প্রস্তুত ছিল না। বোধহয় হামরুও প্রস্তুত ছিল না। সাগ্নিক কিছুই বলল না, বলতে পারল না। সাগ্নিকের নীরবতা দমনকে আরো বেশি আহত করল। সে সাগ্নিকের হাঁটু-দুটো আরো বেশি জোরে আঁকড়ে ধরে ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে লাগল। সাগ্নিকের মনে হ'ল, দমনের কান্না যেন তার হাঁটুর মধ্য দিয়ে তার শরীরে প্রবেশ করতে চাইছে, শিরার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তার হৃদপিণ্ডকে জখম করতে চাইছে। সাগ্নিকের এই বিমূঢ়তা যেন দমনকে আরো বেশি দগ্ধ করল। সে সাগ্নিকের হাঁটু ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে বলল, তুই কুছু বলছুনি কেনে মাষ্টরবাবু?

এবারো সহসা সাগ্নিক কিছু বলতে পারল না। কি বলবে সে? দমনকে সান্ত্বনা দেবে? কি সান্ত্বনা দেবে? প্রিয়তমাকে হারানোর কোনো সান্ত্বনা আছে? তুলসীর মতো প্রিয়তমাকে হারানোর কোনো সান্ত্বনা হয়? তবুও সাগ্নিক নিচু হয়ে হাত দিয়ে ওকে টেনে তুলতে তুলতে বলে, ওঠ দমন, এমন করিসনে। সাগ্নিকের কথা শুনে দমন আরো জোরে

কেঁদে ওঠে। সাগ্নিক আবার বলে, ঠিক হয়ে দাঁড়া দমন, এমনভাবে ভেঙে পড়লে তোর চলবে না। দমন কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুই বুঝতে লারুঠু মাষ্টরবাবু, বুঝতে লারুঠু।

সাগ্নিক দমনের কথা শুনে যেন পাথর হয়ে গেল। আর সেই পাথরের শিথিল হাত গলিয়ে দমন বেরিয়ে গেল। হামরু এসে ওকে ধরে ফেলল।

দমন ঠিক কথাই বলেছে। সাগ্নিক কি সত্যি সত্যি এখন দমনকে বুঝতে পারছে ? ওর হৃদয়ের ক্ষত, হাহাকার আর বেদনা কি সত্যি সত্যি সে উপলব্ধি করতে পারছে ? তা কি সম্ভব ? একজনের হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণা কি আর-একজনের অনুভব করা সম্ভব ? তাই তো সাগ্নিক দমনকে কিছু না-বলে হামরুর কানে কানে বলল, হাড়িয়া ভাটিতে নিয়ে গিয়ে একটু হাড়িয়া খাইয়ে নিয়ে আয়গে তো হামরু।

হামরু বলল, তার তরেই তো উয়ারে লিয়ে যাইঠি মোরা।

সাগ্নিক বলল, ঠিক করেছিস। বেশি করে হাড়িয়া খাইয়ে আনলে রাত্রে হয়তো ভালো ঘুম হবে। আর তাহলে···যা, ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয় হামরু।

আগের মতোই দমনকে ধরে তিন বন্ধু পাকা-সড়কে উঠে যায়, তারপর কালিয়াচকের হাড়িয়া ভাটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

সাগ্নিক শিরীষমোড়ে এসেছিল একটা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে, কিন্তু বাড়ি ফিরে চলল এক প্রচণ্ড অবসাদ নিয়ে। বাড়িতে ফিরে নরেন আর পারুলকে নিয়ে বসল বটে, তবে মন দিয়ে পড়াতে পারল না। পড়াশোনার পর যথানিয়মে খাওয়া-দাওয়ার পাটও শেষ হ'ল। তারপর একসময় শুয়ে পড়ল। আলো নিবিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকল। ঘুম যে আজ আসবে না, তা সে বুঝতে পারছে। চোখ বুঁজে শুয়ে-শুয়ে সে রাস্তায় দেখা দমনের কথা ভাবতে লাগল। তার সেই কান্নার সুর যেন এখনো ওর মধ্যে অনুরণন সৃষ্টি করে চলেছে। তার সেই হাহাকার-ভরা উচ্চারণ সাগ্নিক যেন এখনো শুনতে পাচ্ছে। এইভাবে কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ। রাত্রের

গরম যেন তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। সে উঠে দাঁড়ায়, দরজা খুলে বাইরে আসে, উঠোনে কয়েকবার পায়চারি করে। তারপর সে ধীরে-ধীরে বাড়ির বাইরে চলে যায়, টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। ব্রজেন ঘোষের বাড়ির সামনে একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সে পায়চারি করে চলে।

রাত্রের বাতাস আরো মনোরম, আরো শীতল। কিন্তু সাগ্নিকের শরীরে সে-বাতাস আজ শীত ধরাতে পারছে না। তবুও এই হাওয়ায় ঘুরে-ঘুরে সে স্বস্তি পাচ্ছে। আরো কিছুক্ষণ সে এইভাবে ঘুরল। তারপর একসময় এই স্বস্তি নিয়েই সে ঘরে ফিরতে চাইল। বাড়ির গেটে পা রাখতে যাবে, ঠিক এইসময় শিরীষমোড়ের দিক থেকে এক মাতাল কণ্ঠের আর্তনাদ শুনে সে চমকে উঠল, থমকে দাঁড়াল।

সাগ্নিক কান পেতে ওই আবেগ-মথিত মাতাল কণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে থাকে। সাগ্নিক বুঝতে পারে ওই কণ্ঠস্বর দমনের। তার মানে দমনকে নিয়ে হামরুরা এখন হাড়িয়া ভাটি থেকে ফিরে আসছে।

ওরা আরো কাছে এগিয়ে আসে। হামরু, মাতাল আর ট্যাংরার কথাবার্তাও এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ওদের কণ্ঠে জড়তা নেই, মাতলামী নেই। তার মানে ওরা মাত্রাতিরিক্ত খায়নি। কিন্তু দমন সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। হামরুরা ইচ্ছে করেই ওকে বেশি খাইয়ে মাতাল করেছে। মাতাল করেই ওকে স্বাভাবিক করতে চেয়েছে হামরু। কিন্তু মাতাল করেও ওকে তুলসীর কথা ভুলিয়ে দিতে পেরেছে কি হামরু ?

না, হামরুর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। দমনের ওই হাহাকার সে-কথাই প্রমাণ করছে। দমনের আর্তনাদ যেন রাত্রের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে যাচ্ছে। টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তার বালুকারাশির ওপর দমন যেন আবেগ-বেদনা-আর্তনাদের একটা ঘন আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে চলেছে। জাগ্রত আর নিদ্রিত সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন তাতে মথিত হয়ে উঠছে। দমন তার সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে আর্তনাদের সুরে তুলসীর অকাল মৃত্যুর জন্য নালিশ জানাচ্ছে অদৃশ্য চাঁন্দুবঙ্গার কাছে।

সাগ্নিক কিছুতেই দমনের মুখোমুখি হতে পারল না। সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতে চাইল। কিন্তু তাও সে পারল না, কে যেন তার পা আকঁড়ে ধরল, তার অজ্ঞাতে কে যেন তাকে নিয়ে গেটের পাশের জাম-গাছের আড়ালে দাঁড় করিয়ে দিল। সাগ্নিক সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখল, তিনটি অসহায় মানুষ একটি দীন-রিক্ত-নিঃস্ব-সর্বহারা মানুষকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে আদিবাসী পাড়ায় ঢুকে গেল।

সাগ্নিক ক্লান্ত শরীর আর অবসন্ন মন নিয়ে বাড়ি ঢুকল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যায় দমনকে দেখে এসে যার ঘুম আসেনি, রাত্রের দমনকে দেখে তার ঘুম আসতে পারে না। জেগে জেগে সে কেবল দমন আর তার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে চলেছে।

দমনের কথা ভাবতে-ভাবতে একসময়ে তার আর-একজন মানুষের কথাও মনে পড়ে যায়। দমনের বেদনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে আর-একজনের অতীতের এক তীব্র যন্ত্রণার ছবিও তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। রাস্তায় দেখা ওই করুণ দৃশ্যের চেয়েও করুণতর একটি দৃশ্য সে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখতে পাচ্ছে। দমনের চেয়ে যন্ত্রণাকাতর আর-একটি মানুষের কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছে, সে-মানুষটি আর কেউ না, স্বয়ং সাগ্নিকের মা।

সাগ্নিকের বাবার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ যেদিন ওর মায়ের কাছে এসে পৌঁছেছিল, নিজের মায়ের মধ্যে এর চেয়েও গভীর আর্তি দেখেছিল সাগ্নিক। ওর বাবার খণ্ড-বিখণ্ড, চূর্ণ-বিচূর্ণ, গলিত শবদেহ যখন বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সবাই, তখন সাগ্নিক যে-দৃশ্য দেখেছিল তা ছিল আরো করুণ, আরো মর্মন্তুদ।

মেদিনীপুর শহরে ওদের আদিবাস হলেও ওর বাবা বাড়ি করেছিলেন হাওড়ার রামরাজাতলায়। সেখানেই ওরা বসবাস করত। পাঁচকাঠার একফালি জমির ওপর ছোট্ট-সুন্দর-একতলা একখানা বাড়ি। আরো বড় বাড়ি করবার পরিকল্পনা ওর বাবা-মায়ের ছিল। ওর মায়ের ধারণা ওর বাবা বেঁচে থাকলে এতদিনে সবই হ'ত।

সাগ্নিকের বাবা চাকরি করতেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে, গার্ডের চাকরি। তিনটি সন্তান-সন্ততি নিয়ে ওর বাবা-মায়ের ছিল এক ছোট্ট সংসার। প্রাচুর্য না-থাকলেও সচ্ছলতা ছিল, সুখ ছিল, শান্তি ছিল। কিন্তু সব সুখ আর শান্তি নিমেষে মুছে দিয়ে গেল শুধু একটি ট্রেন-এ্যাক-সিডেন্ট। কোলাঘাটের কাছে এক ট্রেন-এ্যাকসিডেন্টে ওর বাবার অকাল-প্রয়াণ ঘটেছিল।

ওর বাবার সেই অকাল মৃত্যুর পরিণাম যে কি ভয়াবহরূপে ওদের ওপর নেমে এসেছিল তা ভাবতে গেলেও বেদনায় ওর মন আজও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ অকাল-বৈধব্যের যন্ত্রণা ওর মাকে যে কোথায় নামিয়ে এনেছিল, বাস্তবতার আলোকে সেটা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছে সাগ্নিক।

কিছুকাল একাই লড়েছিলেন ওর মা। তারপর একদিন পরাস্ত হয়ে রামরাজাতলার বাড়ি ছেড়ে তিনটি অসহায় সন্তানের হাত ধরে উলুবেড়েতে ভাইদের কাছে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন ওর মা। তারপর শুধু সংগ্রাম আর সংগ্রাম, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। সে এক করুণ ইতিহাস। কত কষ্টে যে তিনি ছেলে-মেয়ে তিনটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, লালন করেছেন, মানুষ করছেন তা ওর মায়ের মতো ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন আর কারো পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয়।

সাগ্নিক একরকম কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে উলুবেড়িয়া হাই ইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাস করেছিল। তারপর উলুবেড়িয়া কলেজে আই-এস-সি পড়তে পড়তে পেয়ে যায় স্পেশাল ক্যাডারের এই মাষ্টারীর চাকরিটি। পড়াশোনা তখনকার মতো বন্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে সে প্রাইভেটে আই-এ আর বি-এ পাস করেছে। ওর ভাই বি-এস-সি পাস করে বেকার বসে আছে, বোনটা বি-এস-সি পড়ছে।

এই চাকরিটি যেদিন সে পেল, সেদিনই ওর মাকে সামান্য একটুখানি খুশি দেখেছিল সাগ্নিক। কিন্তু এই ক্ষুদ্র চাকরিটি দিয়ে কি মায়ের সেই খুশিকে ধরে রাখা যায়? তবুও সাগ্নিক নিরলস চেষ্টা করে চলেছে তার

মাকে খুশি করবার। মায়ের কোনো কষ্টই সাগ্নিক দেখতে পারে না। সীমিত সাধ্য নিয়ে মাকে সুখী করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে সাগ্নিক।

কিন্তু না, এসব চিন্তা কেন এসব কথা? তো সে ভাবতে চায় না। ভাবলে যন্ত্রণা অনুভব করে। তার মায়ের কথা, তাদের অতীত, তাই সে ভাবতে ভয় পায়। না, ওসব কথা সে আর ভাববে না।

ঘুম আসবে না জেনেও সে ঘুমোবার চেষ্টা করে। চোখ বুঁজে এক-দুই-তিন গুনে চলে। কিন্তু পঞ্চাশে পৌঁছবার আগেই সে বুঝতে পারে, তার ঠোঁট এক-দুই-তিন গুনে গেলেও তার মন ভেবে চলেছে সেই রাস্তায় দেখা দমনের কথা। দমনের দুঃখের উৎস অনেক গভীরে। তুলসী যে তার জীবনের সবখানি জুড়ে ছিল। তুলসী ছাড়া দমনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সেই তুলসীকে হারিয়ে ওর অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব আজ কিভাবে টিকে থাকবে?

তুলসী যে দমনের জীবনের কতখানি জুড়ে ছিল তা কেবলমাত্র ওদের দাম্পত্যজীবন দেখলেই সম্পূর্ণ বোঝা যেতো না, ওদের বিবাহপূর্ব-জীবনের মধ্যেই আসলে সেই গভীরতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর পাঁচটা সাঁওতাল ছেলেমেয়ের বিয়ে যেভাবে হয় ওদের বিয়ে সেভাবে হয়নি। ওদের বিয়ের কাহিনীও একদীর্ঘ ইতিহাস হয়ে রয়েছে। শিউলী গাঁয়ের সবাই সে-ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত। সে-সব সাগ্নিক শিউলী গাঁয়ে আসার আগেই ঘটেছিল। ওদের বিয়ের অনেক পরে সাগ্নিক শিউলী গাঁয়ে এসেছিল। তবে শিউলী গাঁয়ে চাকরি নিয়ে আসার পর বহুলোকের মুখ থেকেই দমন-তুলসীর প্রাক্-বিবাহ জীবনের প্রেম-কাহিনী সে শুনেছিল। এমনকি হামরুও একদিন চড়ক-মোড়ে বসে সে-কাহিনী সাগ্নিককে শুনিয়েছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আনুপুর্বিক সব কথাই বলেছিল। দমন-তুলসীর দাম্পত্যজীবনের গভীরতা ভাবতে গিয়ে এই মুহূর্তে সে-সব কথাও মনে পড়ছে সাগ্নিকের। দমন কিংবা তার মায়ের জীবনের যন্ত্রণাকাতর অধ্যায়ের কথা ভেবে শ্রান্ত হওয়ার চেয়ে দমন-তুলসীর

অতীত-জীবনের স্নিগ্ধ ও মাধুর্যমণ্ডিত কাহিনী ভেবে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করা বরং ভালো বলে সাগ্নিকের মনে হ'ল। সাগ্নিক সেই ভাবনাতেই মনঃসংযোগ করল।

॥ ছ য় ॥

এখানে নিয়ে এলি কেন রে হামরু ? সাগ্নিক জিজ্ঞেস করে।

হামরু বলে, দমনা আর তুলসীয়ার বিপারটা ইখান থাকতে শুরু হ'ল মাষ্টরবাবু।

এখান থেকে, এই চড়ক-মোড় থেকে ?

হেঁ, এই চড়ক-মোড় থাকতে।

কি রকম ?

বলিঠি, সবই তুয়ারে বলিঠি। বসে যা তুই।

হামরু নিজে প্রাচীন তেঁতুলগাছের গুঁড়ির একপাশে বসতে বসতে ইঙ্গিতে সাগ্নিককেও বসতে বলে। সাগ্নিক বসে।

এই হ'ল চড়ক-মোড়, এতদঞ্চলের বিখ্যাত চড়ক-মোড়, সবচেয়ে প্রাচীন চড়ক-মোড়।

চড়ক-মোড়ের যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কোনো ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আছে এমন নয়। এই বিখ্যাত তেঁতুলগাছটি, এর থেকে একটু উত্তরে বাবা শিবের থান, চারিদিকে ছোট বড় কিছু আগাছা, তিনদিকে তিনটি পুকুর, ব্রজেন ঘোষের মজা পদ্মপুকুরও তার মধ্যে একটি। এই হ'ল স্থানটির ভৌগোলিক পরিচয়। শিবের থান মানেও কোনো মন্দির নয়, কোনো সাধু-সন্তও থাকে না এখানে। একটি সরু অথচ দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড মাটির মধ্যে লম্বালম্বিভাবে প্রোথিত। এই, আর কিচ্ছু না। একেই বলে বাবা শিবের থান।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চড়ক-মোড়কে বিভূষিত করুক আর নাই করুক, স্থানটির ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। এতদঞ্চলের সব ধর্মের মানুষই ধর্মাচরণ-সূত্রে চড়ক-মোড়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গেই চড়ক-মোড়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তবে শিউলী গাঁয়ের আদিবাসী মানুষদের সাথে বোধহয় সম্পর্কটা গভীরতর, নিবিড়তর।

এর দক্ষিণে মুসলমান-বস্তি তথা খাগড়াগ্রাম। এ-গাঁয়ের সব মানুষই মুসলমান। উত্তরে শিউলী গাঁ। শিউলী গাঁয়ের আবার দুটি পাড়া। টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তার দক্ষিণে সদ্‌গোপ পাড়া, উত্তরে সাঁওতালপল্লী। চড়ক-মোড়ের পুবদিকে প্রথমে পড়ে ফাঁকামাঠ, তারপর একটু দূরে খড়্গপুর-মেদিনীপুর পাকা-সড়ক। পশ্চিম দিকটাও ফাঁকা তবে এই পাশ দিয়েই একটা বড় হিড় বা আলপথ চড়ক-মোড় থেকে বেরিয়ে টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় গিয়ে মিশেছে। এই আলপথই শিউলী গাঁ আর চড়ক-মোড়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। এই পথেই একটু আগে হামরু আর সাগ্নিক চড়ক-মোড়ে এসেছে।

মহরমের সময়ে চড়ক-মোড়ের ওই বড়পুকুরে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদের তাজিয়া ভাসায়। তখন এখানে মেলা বসে, মহরমের মেলা। মুসলমানরা তো বটেই, এমনকি সব সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও তখন দলে-দলে এখানে মেলা দেখতে আসে। আসে আদিবাসীরাও। আরো অনেক ধর্মীয় ব্যাপারেই চড়ক-মোড়কে পবিত্র স্থানরূপে ব্যবহার করে এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়।

সদ্‌গোপ, বেনে, তাঁতী, সোলাঙ্কী, গোয়ালা, মাহিষ্য, বাগদীসহ অন্যান্য হিন্দুরাও চড়ক-মোড়কে পবিত্র ধর্মস্থানরূপে মনে করে। সবাই চৈত্র-সংক্রান্তি তথা চড়কের সময়ে এখানে বাবা শিবের থানে পুজো দেয়। আর এখানে যে বিরাট মেলা বসে, সবাই সে-মেলা দেখে, উপভোগ করে। মুসলমান অধিবাসীরা দলে দলে আসে সে-মেলায়।

আর ওরা, ওই আদিবাসী সাঁওতালরা? ওদের সঙ্গে চড়কের সম্পর্ক

আরো অনেক নিবিড়, গভীর। এখানকার আদিবাসীরা যেসব পরব উদ্‌যাপন করে আকৃতি আর প্রকৃতিতে তাদের মধ্যে অন্যতম বড় পরব হ'ল এই চড়ক। আর সেই সময়ে এখানে যে মেলা বসে, সব মানুষের কাছে তা রমণীয় আর উপভোগ্য হলেও, আসলে সেটা আদিবাসীদেরই মেলা। আদিবাসী সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যে ভরপুর থাকে সে-মেলা। সবচেয়ে-বিচিত্র এখানকার চড়কগাছ আর সেই চড়কে নির্বাচিত এক আদিবাসী তরুণের ঘূর্ণন। অনেক জায়গায় এইভাবে চড়ক হয় শুনলেও সাগ্নিক আর কোথাও দেখেনি।

প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ গজ লম্বা মসৃণ মজবুত গোলাকৃতি একটি বৃক্ষকাণ্ড এই প্রাচীন তেঁতুলগাছটির কিছুটা দূরে মাটিতে প্রোথিত করা হয়। দশ গজ লম্বা মোটা-শক্ত একটা বাঁশের ঠিক মধ্যবিন্দুতে ছিদ্র করে মাটিতে প্রোথিত ওই বৃক্ষকাণ্ডের শীর্ষবিন্দুতে এমনভাবে সংযোজিত করা হয় যাতে বাঁশটি ওই বৃক্ষকাণ্ডটিকে কেন্দ্র করে অবিরাম আবর্তিত হতে পারে। বাঁশটির একপাশে থাকে এক তরুণ, সে-ই চড়কে ঘোরে, অন্যপ্রান্তে থাকে তরুণের সম-পরিমাণ ওজনের পাথরখণ্ড বা অন্য কিছু। বাঁশটিকে মনে হয় যেন ঠিক দাঁড়িপাল্লা। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, তরুণটি কিভাবে ঘুরবে? এটিই হ'ল পরবের সবচেয়ে অভিনব অঙ্গ, শুধু অভিনবই নয়, ভয়াবহ রকমের অভিনব বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

একটা মোটা দড়ির দু'মাথায় পরানো থাকে দুটি বড় বঁড়শী। দড়িটা হাত দশেক লম্বা হবে। আর খুব শক্ত। বঁড়শী দুটিও ইঞ্চি-দেড়েক লম্বা হবে, মোটাও বেশ। উদ্দিষ্ট তরুণের পিঠের দিকের দু'পাঁজরের মাংসের মধ্যে বঁড়শী দুটি গেঁথে দেওয়া হয়। দড়িটাকে দু'বগলের তলা দিয়ে পেঁচিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে আসতে হয়। এই দড়িটাই চড়কের বাঁশে বাঁধা হয়। তরুণটি থাকে বাঁশের নিচে উপুড় হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায়। তারপর বাঁশটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বাঁশের সাথে সাথে তরুণটিও ঘুরে চলে অবিরাম। পাশে তেঁতুলগাছের ডালে বসে অন্যান্যরা বাঁশটিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

নিচের দিকে তাকিয়ে কুড়ি-পঁচিশ ফুট ওপরে উপুড় হয়ে কাউকে ওইভাবে ঘুরতে দেখে অনেক দুর্বল লোকেরই মাথা ঘুরে ওঠে, আর পদ্ধতিটাকে অমানবিক এবং অমানুষিক ভাবতে ভাবতে সেখান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু শিউলী গাঁয়ের আদিবাসী মানুষরা কি তাই মনে করে?

পরবটি আসলে আদিবাসীদেরই, আর চড়কে ঘোরেও ওই আদিবাসী যুবকরাই। ওরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চড়ককে ওদের পবিত্র-সোনেং বা পোরোব বলে মনে করে। অসাঁওতাল অনেকের কাছে ব্যাপারটা নিষ্ঠুর আর অমানবিক মনে হলেও, ওইভাবে চড়কে ঘুরতে পারার সুযোগ পেলে ওরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করে। সে-সুযোগকে ওরা চাঁতুবঙ্গার আশীর্বাদ বলে মনে করে। অসীম আন্তরিকতা আর একান্ত নিবেদিত মানসিকতা দিয়ে সে-ব্রত ওরা উদ্‌যাপন করে।

চড়ক হয় চাঁদ-চাঁদোয় বা চৈত্র-সংক্রান্তির অপরাহ্নে। সংক্রান্তির মিং-হপ্তা আগেই সোনেং শুরু হয়ে যায় বলা চলে। একহপ্তা আগের এক সিতাকবিলায় সাঁওতাল পাড়ার ঘরে-ঘরে তুমদা আর রেগড়া বেজে ওঠে। মাদলের তালে-তালে ওদের শরীরে এনেচের দোলা লাগে। সেরেঙের কলি গুনগুনিয়ে ওঠে সবার কণ্ঠে :

> চাঁদ-বৈশাখ বাজাওয়েনা,
> পাতা ঢাক সাজাওয়েনা,
> ওকা তেচয় ওড়ং চালাকানায়,
> ওত্রে মা রিড়িম রিড়িম
> চতের মা গাতেং তিন অচুর কোনায়॥

সব-কিছুরই সার কথা হাড়িয়া। ওটা না-হলে কোনো পোরোবই হয় না, কোনো অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকাণ্ডও সম্পন্ন হয় না, এমনকি অতিথি আপ্যায়নও হয় না। অতএব চড়ক-পোরোবেও হাড়িয়া চাই-ই-চাই। চাঁদ-চাঁদোয়ার একহপ্তা আগে সবাই নতুন টকইতে হাড়িয়া বসায় ঘরে-ঘরে। ওই দিনই আয়ুপবিলায় মাদল আর রেগড়া নিয়মিত বাজতে শুরু করে, এনেচের সাথে সাথে সেরেঙের সুর তুঙ্গে ওঠে চাঁদ—বৈশাখ বাজাও-

য়েনা। ওই মাদল-এনেচ-সেরেঙের তালে-তালে মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে বাঁবড়ে অভিষিক্ত তরুণের পিঠে বঁড়শী দুটি গেঁথে দেয়, মায়াং বন্ধ করবার জন্য ক্ষতস্থানে রান লাগিয়ে দেয়, দড়িটাকে বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে পিঠে নিয়ে জড়ো করে বেঁধে রাখে। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় অভিষিক্ত তরুণের ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন আর ওদের পবিত্র সোনেৎ। বৈশাখের দু-তিন তারিখ পর্যন্ত এর জের চলতে থাকে।

পোরোবের আগের এই দিনক'টিতে সমানে চলবে তুমদা, এনেচ আর সেরেঙ। আর চলবে ধর্মাধর্ম সকল আচরণের সার, একান্ত আবশ্যকীয় আর পরম রমণীয় বরণীয় হাড়িয়া। আসলে এই ক'টি দিনে ওরা প্রস্তুত হয়, চাঁদ-চাঁদোয়ার অপরাহ্নের জন্য। শিবের পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত ওই তরুণকে মাঝখানে রেখে বাজনা, গান আর ঝুমুরের সুরে-ছন্দে-লয়ে ওরা আশপাশের অন্তরঙ্গ এলাকাগুলি পরিক্রমণ করে। আর য়িন্দায় নারী-পুরুষ-শিশু-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নিজেদের পল্লীতে উৎসবে মেতে ওঠে।

সংক্রান্তির দিন অপরাহ্নে চড়ক-মোড়ে যখন মেলা জমে উঠতে থাকে, দোকানীরা তাদের পসরা সাজিয়ে খদ্দেরদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, দীঘার সমুদ্র-সৈকত থেকে উড়ে-আসা প্রবাসী-দক্ষিণা হাওয়ার কাছে বৈশাখী-গ্রীষ্মের খরতাপ পরাভূত হয়ে আসতে থাকে, চড়ক দর্শনেচ্ছু উৎসাহী মানুষের ভীড়ে মেলা-প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠতে থাকে, ঝাড়গ্রাম থেকে আসা অদিবাসী যাত্রাপার্টি তাদের ঐকতান বাজাতে শুরু করে, তখন সাঁওতাল পল্লীর উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে ওরা বঁড়শীবিদ্ধ তরুণটিকে নিয়ে মিছিল করে এগিয়ে আসে বাবা শিবের থানকে লক্ষ্য করে। তুমদা, রেগড়া, এনেচ আর সেরেঙের তালে-তালে মিছিল এগিয়ে আসতে থাকে। মিছিলের অগ্রবর্তীদের হাতে থাকে বাবার হাতের জটা বা বেতের পেঁচানো ছড়ি। উদ্দিষ্ট তরুণটি থাকে মিছিলের মাঝখানে। পোশাক সবারই একইরকম, খাটো-মোটা ধুতি পরনে, গায়ে গেঞ্জি, কোমরে জড়িয়ে বাঁধা গামছা। মাথায় সবারই উড়তে থাকে তেলবিহীন

রুক্ষ চুলের বাবরী। সবার কণ্ঠে সেই একই সেরেঙ—চাঁদ-বৈশাখ বাজাওয়েনা।

চড়ক-মোড়ে পৌঁছে ওই মিছিল প্রথমে বাবার থানের কাছে যাবে, থানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে, প্রদক্ষিণান্তে মিছিল এগিয়ে যায় চড়ক-গাছের দিকে। চড়ক-গাছের গোড়ায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী-সাথীদের কয়েকজন উদ্দিষ্ট তরুণটিকে নিয়ে তরতর করে তেঁতুলগাছে উঠে যায়। বাঁশের যে পাশে ঝুলে তরুণটির ঘোরার কথা সেটি বাঁধা থাকে তেঁতুলগাছের ডালে। প্রথমে বাঁশটির বন্ধনমোচন হয়, তারপর যুবকটির পিঠের দড়ির সঙ্গে মজবুত করে বাঁধতে হয়। যুবকটি বাঁশের নিচে উপুড় হয়ে ঝুলতে থাকে। অবশেষে সঙ্গীরা দেয় বাঁশটিকে ঘুরিয়ে। নিচে দাঁড়ানো সমবেত জনতা বাবার নামে জয়ধ্বনি দেয়। মিছিলের অন্যান্যরা তুমদা আর রেগড়া জোরে বাজাতে থাকে। সেরেঙের সুরও তখন আরো উর্ধ্বে ওঠে। এইভাবে বাঁশটি ঘুরে চলে, সাথে-সাথে যুবকটিও ঘুরতে থাকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুরে চলে সে।

তারপর একসময় যখন দিনের আয়ু ফুরিয়ে যায়, গোধূলির ধূলি-ধূসরতাকে অপসারিত করে সন্ধ্যা তার কালো আঁচল বিছিয়ে দেয় ধরণীর বুকে, মেলার ভীড় হ্রাস পেতে থাকে, দোকানীদের ক্রয়-বিক্রয় শেষ হয়ে আসে, হাড়িয়া-ব্যাপারীদের হাড়িয়ার হাড়ি শূন্য হয়ে আসে, ঝাড়-গ্রাম থেকে আগত প্রখ্যাত আদিবাসী যাত্রাপার্টি তাদের পালার শেষ দৃশ্যে এসে পৌঁছয়, দীঘার সমুদ্র-সৈকত থেকে উড়ে-আসা মনোরম বাতাস সবার শরীরে শীতের আমেজ বুলিয়ে দিতে থাকে, তখন আবার চড়কের বাঁশ থেকে ওই শ্রান্ত-ক্লান্ত-ধর্মপ্রাণ যুবককে ওরা নামিয়ে আনে। তারপর মিছিল করে ওকে পল্লীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ওরা।

বাড়িতে বা উৎসব-প্রাঙ্গণে ফিরে আসার পর ওদের প্রথম কাজ হ'ল যুবকটির পিঠের পাঁজর থেকে বঁড়শী দুটি টেনে বার করা। মায়াং বা রক্তপাত বন্ধ করা। যুবকটির বিশ্রাম এবং আহারের ব্যবস্থা করা। রারানিচ আর বাঁবড়ে আগে থেকেই রান নিয়ে বসে থাকে।

মিছিল উৎসব-প্রাঙ্গণে পৌঁছনোর সাথে সাথে উন্মুক্তস্থানে পটিয়া পেতে যুবকটিকে উপুড় করে শোয়ানো হয়। মাদল, গান আর নাচের সাথে তাল রেখে বাঁবড়ে ওর পিঠ থেকে টেনে-টেনে বঁড়শী ছুটি বার করে। রান লাগিয়ে ক্ষতস্থান থেকে উৎসারিত মায়াং বন্ধ করে। তারপর ওকে হাড়িয়া খেতে দেওয়া হয়। যত পারে তত খায়। এইভাবে সে বিশ্রাম নেয়, ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকে।

আর অন্যদিকে চলে উৎসবের নতুন পর্ব। সাময়িক উদ্দামতার স্রোতে এরপর ভেসে যেতে চায় ওই ক্লিষ্ট মানবগোষ্ঠী। চাঁদ-চাঁদোয়ার এক সপ্তা আগে ঘরে-ঘরে ওরা যে-হাড়িয়া বসায়, তার কিছুটা এদিন ওড়াকে রেখে বাকিটা সবাই নিয়ে আসে উৎসব-প্রাঙ্গণে। উৎসব বসে যুবকটির বাড়িতে, নয়তো হাড়ামের ঘরে। সারারাত সেখানে চলে মাদল এনেচ আর সেরেঙ। চলে হাড়িয়া। যে যত পারে সে ততই খায়। সেদিনের উৎসব আর হাড়িয়ায় থাকে সকলের সমান অধিকার। সমান অধিকার হাড়িয়া খাওয়ার, হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হওয়ার।

এইভাবে চলে প্রায় সারা রাত্তির। রজনীর শেষ লগ্নে পৌঁছে যখন সবাই চূড়ান্তভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে চোখের শ্রান্ত পাতায় নামতে চায় ক্লান্তিহারা নিদ্রা, হাড়িয়ার নেশায় পাগল হয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখন যে যেখানে পারে শুয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে। নিজের ওড়াক খোঁজে না, অন্যের ওড়াক বিচার করে না। সে-বিচারের ক্ষমতা তখন আর কারো থাকেই না। এইভাবে একসময় সুপ্তির দেশে চলে যায় ওই ক্লান্ত-শ্রান্ত-প্রায় চেতনাশূন্য মানবগোষ্ঠী। সেই সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে শিউলী গাঁয়ের সাঁওতাল পল্লী, সাঁওতাল পল্লীর পৃথিবী।

পরের দিন সাতটা-আটটার মধ্যে আবার ওরা জেগে ওঠে। জেগে উঠে নতুন উৎসাহে আবার ওরা উৎসবের মধ্যে প্রাণের বন্যা আনে। প্রথমে যে যার ঘরে চলে যায়। অনেকেই তখন ডাবরা করে। স্নান করার পর যে যার ঘরে বসে তুমদা বাজায়, গান করে, নাচে। আর আগের দিন হাড়িয়ার যেটুকু ঘরে রেখে দেয় সেটুকু পান করতে থাকে।

তারপর একসময় সেদিনেরও আয়ু ফুরিয়ে আসে, রাত্রের বয়স বাড়তে থাকে, ওরা আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

তার পরের দিন সকাল হয়, ওদের ঘুম ভাঙে। শিউলী গাঁয়ের সাঁওতাল পল্লীতে ধীরে-ধীরে স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে থাকে। ওরা বেরিয়ে পড়ে অন্যের খেতে-খামারে-পুকুরে-বাগানে-বাড়িতে কাজের সন্ধানে, পান্তার উপকরণের সন্ধানে।

এরূপ এক চড়ক-পোরোবে হয়েছিল ওদের প্রথম দেখা, দমন-তুলসীর প্রথম পরিচয়।

দমনের আপা বুড়ো কটাই য়িন্দায় কুকমু দেখেছে দমন যেন চড়কের বাঁশে ঝুলে ঘুরছে। সকাল হয়, বুড়ো কটাই স্বপ্নের বিশ্লেষণ করতে বসে। অবশেষে সে বোঝে, ঘুমের মধ্যে চাঁতুবঙ্গাই ওকে বলেছেন ওর কোড়া যেন চড়কে ঘোরে। এই স্বপ্নদেখাকে ওরা চাঁতুবঙ্গার বিশেষ আদেশ বলে মনে করে। আদিবাসীরা সবাই তাই মনে করে। বুড়ো কটাইও তাই ভেবে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করল।

বুড়ো কটাই ছেলেকেও স্বপ্নের কথা বলল। আপার সাথে সাথে বিশ-বাইশ বছরের কোড়া দামাল প্রকৃতির দমনের মনেও স্বপ্নটা দাগ কাটে। বাপে আর ছেলেতে মিলে হামরুর মাধ্যমে কথাটা সবার কানে দিয়ে রাখল।

নির্দিষ্ট দিনে প্রার্থী-নির্বাচনের জন্য সামাজের মিটিন বসে। বুড়ো কটাইয়ের বংশের কেউ কোনোদিন চড়কে ঘোরেনি, ওদের বংশে ওটা নেই। পাড়ার হাড়াম তখন দমনের প্রাণের বন্ধু হামরুর বাবা বাংরু। তার প্রভাবে আর চাঁতুবঙ্গার আদেশের কথা মনে রেখে সবাই দমনের প্রার্থী-পদকে সানন্দে স্বীকৃতি জানাল।

মিৎ-হাপ্তা আগের এক শুভদিনে পল্লীতে তুমদা বেজে ওঠে, রেগড়া বেজে ওঠে, বেজে ওঠে টামাক, বানাম আর তীরিয়। মাদল আর ঢাক পাড়ায় আছে। কিন্তু বাঁশী, ধামসা আর বেহালা ওদের নেই। চামরু বাইরে থেকে সংগ্রহ করে আনে। শুরু হয় এনেচ বা ঝুমুর। সেরেঙের সুর

ভেসে আসে—চাঁদ-বৈশাখ বাজাওয়েনা। সুরের মূর্ছনা গুমরে ওঠে বুড়ো কটাইয়ের রাঁচায়, প্রাঙ্গণে। অপরাহ্ণে সব বাদ্যযন্ত্র এসে পৌঁছে যায় দমনদের রাঁচায়। সব বয়সের নরনারীর ভীড়ে পুর্ণ হয়ে যায় বুড়ো কটাইয়ের ওড়াক। মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বঁড়শী ফুটানোর অভিষেক-উৎসব।

তারপর সবই ঠিকভাবে হয়ে চলে।

অব.শযে একদিন চাঁদ-চাঁদোয়াও এসে যায়।

দমনকে নিয়ে মিছিল এল বাবার থানে। একসময় দমন:কে নিয়ে মাতাল, ট্যাংরা আর ছোটকটাই তেঁতুলগাছে উঠে গেল। সমবেত জনতা বাবার জয়ধ্বনিতে মুখর হয়। মাতালরা আপাড়ীকে ঘুরিয়ে দেয়। বাঁশের সাথে সাথে দমনও ঘুরে চলে। দমন তার জীবনের মহত্তম মুহূর্তের মুখোমুখি হয়। পবিত্র সোনেতের সর্বাধিক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারার আনন্দে খুশি হয়ে সে অবিরাম ঘুরে চলে। উপস্থিত জনমণ্ডলী রুদ্ধশ্বাসে দমনের এই নির্ভিক আর নির্ভুল ঘূর্ণন দেখে যেতে থাকে।

হামরু দাঁড়িয়েছিল নিচে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে প্রিয়তম সুহৃদের পাক-খাওয়া দেখছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সে একটা ব্যাপার দেখে অবাক না-হয়ে পারল না। অবাক হয়ে সে দমনের মেৎ আর মোচার দিকে তাকাল, বারবার দমনের চোখ আর মুখের দিকে তাকাল সে। চড়কের আপাড়ীতে ঝুলে ঘুরবার সময়ে সকলেই কমবেশি ভয় পায়, কষ্টে কাতর হয়, প্রথমদিকে তো বটেই। কিন্তু দমনের মুখে-চোখে ভয়, কষ্ট বা কাতরতার কোনো চিহ্নই দেখতে পায় না সে। হামরু অবাক হয় আবার খুশিও হয়। দমন যে দামাল এবং অকুতোভয় এটা সবাই জানে। সেটা আরো সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে হামরু খুশি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার দেখে সে দমে যায়, বিস্মিত হয়। চড়কে ঘুরবার সময়ে সবাইকে কিছু প্রথা মানতে হয়, নিয়ম মানতে হয়। প্রতিবার পাক-খাওয়ার সময়ে উত্তরমুখো হলে সবাইকে বাবার থানের দিকে তাকাতে

হয়, কোয়জগু হতে হয়—প্রণাম জানাতে হয়। তখন অন্য কোনোদিকে তাকাতে নেই, অন্য কিছু ভাবতে নেই। সবাই এই নিয়ম মানে, চিরদিন মান্য করে আসছে। অতএব দমনেরও না-মানবার কথা নয়। কিন্তু কই, দমন তো তা করছে না, সে যখনই উত্তরমুখো হচ্ছে, বাবার উদ্দেশে কায়মনে কোয়জগু না-হয়ে সে কেবলই ব্রজেন ঘোষের মজা পদ্মপুকুরের দিকে তাকাচ্ছে। হামরু ভাবে, সে কেন এমন করছে?

হামরু একবার দমনের চোখ-মুখের দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার পদ্মপুকুরের দিকে তাকাচ্ছে। এমনি করে সে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছে। অবশেষে তার মনে হ'ল দমন যেন পদ্মপুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কুড়িকে দেখছে। উত্তরমুখো হলেই তার চোখ চলে যাচ্ছে ওই দিকে। চোখে প্রচণ্ড আগ্রহ। এত ঘূর্ণন, এত কষ্ট, তবুও সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে খুশি-খুশি ভাব নিয়ে বারবার কুড়িটিকে দেখছে। হামরু আরো বিস্মিত হয় এই দেখে যে কুড়িটিও চোখে অসীম ব্যগ্রতা আর মুখে মুগ্ধতার হাসি নিয়ে একদৃষ্টিতে দমনকে দেখে যাচ্ছে।

হামরু ভাবে কুড়িটি কে বটে? গেল মোড়ে গেল, পনেরো-ষোল বছর বয়স। গায়ের রঙ কালো হলেও আর-পাঁচটা আদিবাসী কুড়িছ্যানার মতো অতটা কালো নয়। বহুৎ মোঞ্জ কুড়ি, সুন্দর মেয়ে। ওর মু-চান্দি-মেৎ-মোচা-উপ, সবই মোঞ্জ। নাক-কপাল-মুখ-চোখ-চুল সবই সুন্দর। এককথায় গোটা হোড়মোটাই ওর অনুপম সুন্দর। আর গয়না-গাঁটি বা পোশাক-আশাকেরই বা কি বাহার। হট-মু-লতু, গলা-নাক-কান-হাত সব অঙ্গই চাঁদির গয়নায় ভর্তি। হোড়মোর সর্বত্রই চাঁদির গয়না। পরনে রঙিন ডোরাকাটা মোঞ্জ শাড়ি-ব্লাউজ। মোঞ্জ কবরীতে লাগিয়েছে চাঁদির কাঁটা। হামরু নিশ্চিত বলতে পারে উটি কোনো বড় নোকের কুড়ি! লয় তো এতসব কাই থাকতে আসতি!

হামরু একটুক্ষণের জন্য থামল, মাথার চুলের মধ্য থেকে শালপাতায় মোড়া একটা বিড়ি টেনে বার করল, বিড়িটাকে মুখে লাগিয়ে গ াঁট থেকে সস্তাদামের একটা লাইটার বার করল।

সাগ্নিক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এই মেয়েটিই কি তুলসী ?

হেঁ। বিড়িতে আগুন ধরাতে ধরাতে হামরু বলল, তুলসীয়াকে, কার কুড়ি-ছ্যানা তুই জানু মাষ্টরবাবু ?

কার ?

মোদের পারগানাবাবুর।

পারগানাবাবুর মেয়ে! সাগ্নিক যেন বিস্ময়ে ধাক্কা খায়। ধাক্কা খাওয়ারই কথা। পারগানাবাবু ওদের সমাজের আঞ্চলিক নিয়ামক, উচ্চতর পুরোহিত, বিচারপতি এবং সমাজপতি। এক-একজন পারগানা-বাবুর এক-একটা এলাকা থাকে, সেই এলাকায় তার অনুমোদন ব্যতীত কোনো কাজ হতে পারে না, ধর্মীয় তো বটেই, এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠানেও তার অনুমতি সবাইকে নিতে হয়, তার আদেশ সবাইকে মানতে হয়। পারগানাবাবুর পদ বংশানুক্রমিক না-হলেও বিশেষভাবে অযোগ্য প্রমাণিত না-হলে প্রায়শই পারগানাবাবুর ছেলেই পারগানাবাবু হয়। আর্থিক অবস্থাও পারগানাবাবুদের সম্পন্ন হয়। সোনার গয়নার চল নেই, হয়তো আর্থিক কারণেই নেই। তবে রূপো বা চাঁদির গয়নার চল অবশ্যই আছে। তাই বা কয়জনে পরতে পারে ? তবে পারগানাবাবু-দের বাড়ির মেয়েরা হাতে-গলায়-কোমরে-নাকে-কানে-চুলে-শরীরের সর্বত্র চাঁদির গয়না পরে। সমাজের এরূপ এক অভিজাত ব্যক্তির মেয়ের সঙ্গে শিউলী গাঁয়ের দীন-দরিদ্র মজুর-খেটে-জীবিকার্জনকারী বুড়ো কটাইয়ের ছেলের বিয়ে কিভাবে হতে পারে সাগ্নিক তা বুঝতে পারে না। হামরুকে সে-কথা সে বলেও ফেলল।

হামরু বিড়িতে একটা টান দিয়ে বলে, বেহাটা কি আর আগে হ'ল ?

তবে ?

উয়ার আগে বহু কথা থাকছে, উই সব তুয়ারে আগে জানে লিতে হবে। বলিঠি, শোন।

সেদিনের চড়ক-মেলা শেষ হয় রাত সাতটা সাড়ে-সাতটা নাগাদ। সেদিনের সবই একসময় শেষ হয়, শেষ হয় পরের দিনের উৎসবও। তার

পরের দিন ধীরে-ধীরে ওরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে থাকে। কয়েকটি দিনের নিরবচ্ছিন্ন উল্লাস-উত্তেজনা-উদ্দামতার পর আবার শুরু হয় ওদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, একঘেয়ে, নীরস আর নিরলস সংগ্রাম!

দমনও ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু তার মধ্যে প্রত্যাশিত স্বাভাবিকতা ফিরে এল না। হামরু ওকে ভালো করেই জানে, তার চোখে পরিবর্তনটা বিশেষ করে ধরা পড়ল। সে দমনকে টেনে তুলল, দৈনন্দিন কাজে-কর্মে ওকে ব্যস্ত করে তুলতে লাগল, ওর মনের হদিস পেতে চাইল। হামরু ওর সঙ্গে বারবার কথা বলল। কিন্তু হামরু কিছুতেই সফল হ'ল না। দমন একটি কথাও কাউকে বলল না। হামরুকেও না।

এইভাবে কেটে যায় আরো কয়েকটা দিন। অবশেষে একদিন কালিয়াচক হাড়িয়া ভাটি থেকে হাড়িয়া খেয়ে ফেরার পথে দুই বন্ধুতে যখন শিরীষমোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, নেশাগ্রস্ত হামরু তখন কথায়-কথায় চড়কের মেলায় দেখা সেই মোঞ্চ কুড়িটির কথা পেড়ে বসল। দমন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না, সমস্ত রুদ্ধ-আবেগ সে বন্ধুর কাছে উজাড় করে ঢেলে দিল। অকপটে সে তার মনের কথা বলে গেল।

হামরু নীরবে আর আন্তরিকভাবে সব শুনল, কিন্তু উৎসাহব্যঞ্জক কিছুই সে শোনাতে পারল না। পারবেই বা কি করে, কুড়িটির সম্পর্কে সে-তো কিছুই জানে না। তাছাড়া সে-যে বড়লোকের কুড়ি তাতেও হামরুর মনে কোনো সন্দেহ নেই। বাপলার ব্যাপারে অতএব সে কোনো আশার বাণী শোনাতেই পারে না। দমন নিজেও তার সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না, চড়কে ঘুরতে-ঘুরতে সে শুধু তাকে দেখেছিল! ব্যস্ এইটুকু আর কিচ্ছু নয়। এমনকি তারও মনে হয়েছে উটি কোনো বড়লোকের কুড়িই বটে! সেখানেই ওর ভয় আর সেই কারণেই সে-কথাটা আগে হামরুকে বলতে সাহস পায়নি।

দমনকে কোনো আশার কথা শোনাতে না-পারলেও পরদিন থেকেই হামরু কাজে লেগে পড়ে। হামরুর প্রথম কাজ কুড়িটিকে খুঁজে পাওয়া, তার পরিচয় বার করা—কোথায় বাড়ি, কার কুড়ি এসব জানা।

ওদিকে বুড়ো কটাই আবার কোড়ায় বাপলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অনেকদিন থেকেই বুড়ো কটাই ছেলের বিয়ের কথা ভাবছিল। সেজন্য ধীরে-ধীরে সে প্রস্তুত হয়েছে। দুটো ছোট দামকোম, হেলে বাছুর কিনে সে পুষতে শুরু করেছে। একটা ঘুঘুরের বাচ্চাও পুষে-পুষে বড় করছে সে। কয়েকটি সিম-ইঙ্গা আর সিমশাণ্ডি, মোরগ-মুরগীও সে ইতিমধ্যে কিনে ফেলেছে। খেয়ে-না-খেয়ে অতিকষ্টে সে মিৎসায় টাকা জমিয়েছে। এই একশো টাকা সে নিজের কাছে রাখেনি, পূরনের কাছে জমা রেখেছে। পঞ্চাশ টাকা পনের জন্য আর পঞ্চাশ টাকা হাড়িয়া এবং অন্যান্য ব্যয় মিটানোর জন্য। এককথায় বুড়ো কটাই ছেলের বিয়ের জন্য সম্পূর্ণত প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছে। মাঝখানে চড়ক এসে গেল, বুড়ো কটাই সাময়িকভাবে কোড়ায় বাপলার কথা ভুলে ছিল। এখন আবার সে উঠে পড়ে লেগেছে। চাষের মরসুম শুরু হওয়ার আগে বাপলা না-দিতে পারলে এবারো গতবারের মতো হবে। গতবছরও বুড়ো কটাই বিয়ের জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হয়নি। অতএব একদিকে যখন হামরু খুঁজে চলেছে দমনের দেখা রাজকন্যাকে, অন্যদিকে বুড়ো কটাই তখন বাপলার কুড়ি খুঁজে চলেছে।

এই সময়ে একদিন সেন্দরা-পোরোবের জন্য পারগানাবাবুর গিরা এসে পৌঁছে গেল শিউলী গাঁয়ে। সেন্দরা বা সিকরিয়া মানে শিকার, সিকরিয়া মানে শিকারীও হয়। সেন্দরা-পোরোব মানে হ'ল শিকার-পরব। আদিবাসী সাঁওতাল সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যবাহী পরব এটি।

অযোধ্যার অরণ্যে এই পোরোব অনুষ্ঠিত হয়। অযোধ্যা মানে রামায়ণে বর্ণিত সেই অযোধ্যা নয়, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এই জেলারই এক জঙ্গল এলাকা। জায়গাটার প্রকৃত নাম অযোধ্যা কিনা তাও বলা যায় না। কেউ কেউ বলে ওরা যে জায়গাতে শিকার-পরব করে তারই নাম হয় অযোধ্যা, আবার কেউ কেউ বলে, না, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে ওই নির্দিষ্ট জায়গাটির নাম সত্যি অযোধ্যা।

পনেরোই বৈশাখ বা তার কাছাকাছি কোনো দিন নির্দিষ্ট হয় সেন্দরা-

পোরোবের জন্য। দিন ধার্য করার একচ্ছত্রাধিকারী মনাতাং পারগানাবাবু। অনিবার্য কোনো কারণ না-থাকলে পনেরোই বৈশাখই দিন ধার্য হয়, দিন পরিবর্তন হয় না। বছরের এই একটিমাত্র নির্দিষ্ট দিনে এখানকার সাঁওতাল-মানুষরা তাদের ক্ষাত্রধর্মের চর্চা করে অযোধ্যার বনাঞ্চলে। এতদঞ্চলের অধিকাংশ সমর্থ যুবকই এতে অংশ গ্রহণ করে। প্রতি গ্রাম থেকে একটি করে দল প্রেরিত হয়। শিকারলব্ধ সামগ্রীতে দলের যৌথ মালিকানা স্বীকৃত হলেও, বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ব্যক্তিগত সম্মান, এমনকি পুরস্কারও মেলে মাঝে-মাঝে।

অযোধ্যার জঙ্গলে দুপুর পর্যন্ত চলে এই শিকার-পর্ব। তারপর সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। অযোধ্যার অরণ্যসংলগ্ন উন্মুক্ত এবং সমতল প্রান্তরে তারপর সবাই সমবেত হয়। বিরাট মেলা বসে সেখানে। ইতিমধ্যে সিকরিয়াদের বাড়ির কুড়ি, বউড়ি এবং অন্যান্যরা খাবার আর হাড়িয়া নিয়ে এসে মেলা-প্রাঙ্গণে নির্ধারিত শিবিরে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রতিটি দল বা গাঁযের জন্য আলাদা-আলাদা শিবির গড়ে ওঠে। মেলার মধ্যাঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন খুঁটি পুতে রাখা হয় শিকারলব্ধ সামগ্রী ঝুলিয়ে রাখবার জন্য। মনাতাং পারগানাবাবু ঘুরে-ঘুরে সব পর্যবেক্ষণ করেন। বলা বাহুল্য, পারগানাবাবু অনেক আগেই সদলবলে মেলা-প্রাঙ্গণে পৌঁছে যান। সেদিনের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য। শিকারলব্ধ সামগ্রী-প্রদর্শনের পরে চলে পান্তা-খাওয়া, হাড়িয়া-খাওয়া, মেলার বেচাকেনা, আমোদ-ফুর্তি। চলে মাদল সেরেঙ আর এনেচ। তারপর আয়ুপবিলা পেরিয়ে যখন অন্ধকার নেমে আসে পৃথিবীতে, তখন নিজ-নিজ ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে ওই শ্রান্তক্লান্ত ক্ষাত্রবীরের দল।

দিনক্ষণ ধার্য করে মনাতাং পারগানাবাবুই তা গিরা পাঠিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেন। গিরা মানে নিমন্ত্রণ, তবে তার এক স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। মনাতাং পারগানাবাবু বিঘত-পরিমাণ গাছের ছালের মাঝখানে একটা গিঁট দিয়ে কোনো লোকের মাধ্যমে সেটা পাঠিয়ে দেন পাশের গাঁয়ের

হাড়ামের কাছে। লোকটি আন্তরিকতার সঙ্গে নির্দিষ্ট লোকের কাছে গিরাটি পৌঁছে দেয়, আর মুখে সেন্দরা-পোরোবের দিনক্ষণ তথা পারগানা-বাবুর নির্দেশ বলে দেয়। সে-গাঁয়ের হাড়াম আবার ওই একই পদ্ধতিতে নিজের লোক দিয়ে গিরাটি পাঠিয়ে দেয়। তার পাশের গাঁয়ের হাড়ামের কাছে এইভাবে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যেতে-যেতে একদিন ওই গিরা আর পারগানাবাবুর নির্দেশ পেঁাছে যায় এলাকার সব জায়গায়। সেন্দরা-পোরোবের কথা জানতে আর কারো বাকি থাকে না।

সেবারো যথাসময়ে মনাতাং পারগানাবাবুর গিরা এসে পৌঁছল শিউলী গাঁয়ে। পনেরোই বৈশাখই পরব হবে। প্রতি বছরের মতো সেবারো শিউলী গাঁ যাবে এক বড় দল নিয়ে। হামরুই দলপতি। তার নেতৃত্বে সিকরিয়ারূপে যাবে মাতাল, ট্যাংরা, ছোটকটাই, থুম্প, ধুমা, যুগলা, মঙ্গলা এবং আরো অনেকে। দমন? হ্যাঁ দমন তো যাবেই। সে যদি না যায় তবে তো শিউলী গাঁ কানা। দমন হ'ল সবচেয়ে বড় সিকরিয়া। কেবল শিউলী গাঁয়েই নয়, এ-অঞ্চলের মধ্যে দমনই সবচেয়ে বড় সিকরিয়ারূপে স্বীকৃত। তীর-কাঠ, গুল্‌তি, ঠেঙ্গা—সব অস্ত্রেই সে সমান পারদর্শী। তাকে বাদ দিয়ে কি শিউলী গাঁ সেন্দরা পোরোবে যেতে পারে?

সাজো-সাজো রব পড়ে গেল শিউলী গাঁয়ে এবং সব গ্রামে। কন্ধায়-কন্ধায় হাড়িয়া তৈরি করতে লেগে পড়ল কুড়ি আর বহুরা। কোড়ারা লেগে পড়ে নতুন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে, পুরনোগুলোর সংস্কারে। সার আর আক, তীর আর কাড় শিকারের মূল অস্ত্র হলেও সহযোগী অস্ত্ররূপে এরা সঙ্গে নেয় ঠেঙ্গা, গুল্‌তি, ডামা, তেং, গোছ-লাঠি, গুল্‌তি, কাটারী, টাঙ্গী প্রভৃতি।

অযোধ্যার অরণ্যের আগেকার সে-বৈশিষ্ট্য এখন আর নেই। নেই সেই বৃক্ষরাজিও। অরণ্যের সে-গভীরতাও কবে নিশ্চিহ্ন। গাছপালা বলতে এখন বোঝায় কিছু ছোট-ছোট শালগাছকে। অনতিদীর্ঘ সরু-সরু

শালগাছেরাও দাঁড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। আর আছে ছোট ও মাঝারী আকারের কিছু আগাছা। প্রকৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জস আর সহজাত কোনো অভিজাত অরণ্য যেমন এটা নয়, তেমনি নয় সুপরিকল্পিত-সুবিন্যস্ত কোনো আধুনিক বনভূমি। এটা যেন আধুনিক সভ্যতা কর্তৃক অবহেলিত, সবার কাছে অপ্রয়োজনীয় এক বনাঞ্চল। এর প্রতি যেন কারো কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এমনকি এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মানুষের এতটুকু উপকারে লাগাবার কথাও কেউ ভাবে না। এক কথায়, অনাদরে যেন দূরে সরিয়ে রাখা এক বনাঞ্চল আজকের অযোধ্যা।

অথচ একদিন এমন দিনও ছিল যখন এর গভীরে প্রবেশ করতে অতিবড় সিকরিয়ারও বুক কাঁপত। আর শিকারের সামগ্রী? বাঘ, বুনো শুয়োর এবং অন্যান্য হিংস্রজন্তুতে ভরা থাকত সেদিনের অযোধ্যা। সে-অযোধ্যাও নেই, নেই আর সে-বাঘ-ভাল্লুক বুনো শুয়োরের দলও। বুনো শুয়োর কালেভদ্রে এক-আধটা দেখা গেলেও বাঘ-ভাল্লুক একেবারেই চোখে পড়ে না; নেই। ওই কালেভদ্রে পাওয়া বুনো শুয়োরকেই এখন সবাই বড় শিকার বলে, আগে বাঘ-ভাল্লুককে সবাই এই নাম দিত। এখন ওই বুনো শুয়োর একটা কেউ শিকার করতে পারলেই সে বড়-সিকরিয়া। অন্যথায় খরগোশ পেলেই এখনকার সিকরিয়াদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, ওতেই সবাই সন্তুষ্ট। অনেকে তাও পায় না, কেবল দু'একটা কাঠবিড়ালী ধরেই ফিরে আসে।

তবুও এই অরণ্যে বছরে একবার ওরা ওদের ক্ষাত্রধর্মের চর্চা করবেই। বহুদিনের প্রথা। পরিত্যাগ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ভোর হতে না-হতে অরণ্যে ঢুকে পড়ার কথা। এবারো প্রথামতো সবাই তাই ঢুকল।

বারোটা-একটা পর্যন্ত চলল শিকার। তারপর সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। সবার হাতে শিকারলব্ধ সামগ্রী। কারো হাতে একটা খরগোশ, কারো হাতে একটা-দুটো কাঠবিড়ালী, কারো হাতে আবার দুটো-একটা পাখি। যেমনটি যে পেয়েছে, তাই নিয়েই সে

বেরিয়ে আসছে।

দমন অঞ্চলের বড় সিকরিয়া, প্রায় সব অস্ত্রই সে চালাতে পারে। সবের উপর আছে তার সাহস, শিকারের ক্ষেত্রে যা একটি মোক্ষম অস্ত্র। শিউলী গাঁয়ের সব প্রত্যাশা তাই দানা বাঁধে দমনকে কেন্দ্র করেই। সবাই মনে করে দমন নিশ্চয় কোনো বড় শিকার ধরে শিউলী গাঁয়ের মুখোজ্জ্বল করবে।

কিন্তু দমন এখনো বেরিয়ে আসছে না কেন? শিউলী গাঁয়ের সবাই যখন বন থেকে বেরিয়ে এসে একথা ভাবছে ঠিক সে-সময়ই দমন এল। তবে এল একটা বড় সমস্যা নিয়ে। শিউলী গাঁ, এমনকি দমন নিজেও, ওই ঝামেলার জন্য তৈরি ছিল না। দমন শিকার করেছে বেশ-কয়েকটি পাখি, কয়েকটি কাঠবিড়ালী, একটা সজারু, তিনটি খরগোশ, আর পেয়েছে ইয়া বড় একটা শিকার—বুনো শুয়োর।

এই বড় শিকারটিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হ'ল এক জটিল সমস্যা, যা অযোধ্যার উৎসব-আসরকে কিছু সময়ের জন্য বিমর্ষ করে রাখল, আচ্ছন্ন করে রাখল একখণ্ড অশুভ কালো মেঘ অযোধ্যার আকাশকে।

দমন যে-ঘুষুরটি শিকার করেছে গোকুলপুরের খাজরু মাণ্ডিও তার একজন দাবিদার হয়ে এগিয়ে এল। তার মতে দমন নয়, সে-ই ঘুষুরটির প্রকৃত সিকরিয়া। দু'জন ঘুষুরটির দু'পাশ ধরে টানতে টানতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। ছুটে আসে হামরু, শিউলী গাঁয়ের দলপতিরূপে, দমনের বন্ধু সে, তার একটা দায়িত্ব আছে। গোকুলপুরের দলপতি কর্ণ সোরেনও ছুটে এল। দুই দলপতির বোঝাপড়ায় স্থির হ'ল, মনাতাং পারগানাবাবুর কাছে যেতে হবে। ঘুষুরটির প্রকৃত সিকরিয়া কে, মনাতাং পারগানাবাবুই সে-বিচার করবেন। দমন আর খাজরু দু'জনেই ঘুষুরটি ছেড়ে দেয়। দুই দলপতি ঘুষুরটিকে টানতে টানতে নিয়ে চলল পারগানাবাবুর দরবারের উদ্দেশে।

মেলা-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে রাজকীয় দরবার সাজিয়ে বসে আছেন মনাতাং পারগানাবাবু। প্রাঙ্গণের চারদিকে শিবির বসে গেছে, মেয়েরা

আর বয়স্ক পুরুষরা হাড়িয়া আর খাবার নিয়ে বসে আছে। প্রতিটি শিবিরের সামনে একটি করে লকড়ি পোতা, শিকারীরা এসে তাদের শিকারলব্ধ সামগ্রী লকড়িতে ঝুলিয়ে রাখছে। পারগানাবাবু ঘুরে-ঘুরে সব দেখছেন।

হামরু আর কর্ণ হাজির হ'ল তাঁর সামনে। দু'জনে মিলিতভাবে দমন-খাজরু বিসম্বাদের কথা তাঁকে বলল। সব শুনে পারগানাবাবু যা রায় দিলেন তার সারমর্ম : এখন সবাই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। অতএব আগে শিবিরে গিয়ে সবাই খাওয়া-দাওয়া করে আসুক, পরে বিচার হবে। সবাইকে অবশ্য উনি তাড়াতাড়ি ফিরতে বললেন।

এই সময়ে আবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য হামরু বা দমন, কেউই প্রস্তুত ছিল না। অর্থাৎ ওদের সেই কুড়িটিকে ওরা আবার দেখতে পেল। একান্ত আকস্মিকভাবে দমন আবার তার রাজকন্যাকে দেখতে পেয়ে ধন্য হ'ল। চড়কের অপরাহ্ণে দূর থেকে দেখা সেই কুড়িকে চিনতে ওর এতটুকু অসুবিধা হ'ল না। সেই মু-মেং-মোচা-চান্দী-উপ, সেই চাঁদির গয়নাপত্র, সেই মোঙ্গ শাড়ি-ব্লাউজ, সেই মোঙ্গ রাজকন্যা। দমন যেমন অসীম আগ্রহ নিয়ে কুড়িটিকে দেখল, কুড়িটি সেই একই দৃষ্টিতে দমনের দিকে তাকিয়ে রইল।

হামরু অবাক হয়ে ভাবে, কে বটে কুড়িটি ? ইখানকে ঘুর-ঘুর করেঠে কেনে ? পারগানাবাবুর কাছকেই বা দেখিঠি কেনে ? যা হোক এ-নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার সুযোগ হামরুর ছিল না। তার তংকায় রয়েছে তখন ঘুঙুর-সংক্রান্ত কঠিন মোকোরদোমা। দমনকে টানতে টানতে সে নিয়ে চলল শিউলী-শিবিরে। মাতাল-ট্যাংরা-ছোটকটাইরাও ওদের অনুসরণ করে শিবিরের উদ্দেশে এগিয়ে চলল।

প্রায় সব বাড়ির লোকেরাই উপস্থিত শিবিরে। খাবার আর হাড়িয়া নিয়ে সবাই বসে আছে। হামরুর বাড়ি থেকে বাতাসী এসেছে। দমনের বাড়ি থেকে কেউই আসেনি, কোনোদিনই আসে না। আসবেই বা কে, আছে তো এক বুড়ো আপা। প্রথানুযায়ী মেলার দোকান থেকে

দমনের সবকিছু কিনে খাওয়ার কথা। কিন্তু দমনের ক্ষেত্রে এ-নিয়ম প্রযোজ্য নয়। হামরুর বাড়ি মানেই তার বাড়ি। হামরুর বাড়ির খাবার মানে তাতে দমনেরও সমান ভাগ। অতএব বাতাসী দু'জনের খাবারই নিয়ে এসেছে, দু'জনের জন্যই খাবার সাজিয়ে বসে আ:ছ।

হামরু আর দমন দু'জনেই খেতে বসল। হামরু তাড়াতাড়ি খেয়ে চলেছে ; দমন? সে যে খাচ্ছে না, খেতে পারছে না, হামরু তা বুঝতে পারছে, তবুও সে দমনকে তাগাদা দেয়, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলে।

খাওয়ার পর্ব শেষ। হামরু সবাইকে নিয়ে পারগানাবাবুর কাছে ফিরে গেল। গোকুলপুর তার আগেই পৌঁছে গেছে। গোকুলপুরের সবাইকে দেখে বেশ খুশি-খুশি মনে হ'ল। ওদের খুশি হওয়ার একটাই কারণ— পারগানাবাবু ওদের পাশের গাঁয়ের লোক, তাই ওরা হয়তো ভাবছে মোকোরদোমায় ওরা জিতবে। বকুল গাঁ অর্থাৎ পারগানাবাবুর গ্রাম গোকুলপুরের পাশে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ওইভাবে কি আর রায় দেবেন পারগানাবাবু?

মনাতাং পারগানাবাবু প্রথমে খাজরু মাণ্ডিকে তার বক্তব্য পেশ করতে বললেন। খাজরু অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে যা বলল তার সারকথা এরকম : জঙ্গলের একই ধারকে একটুকু দুরে-দুরে সেন্দরা করছে দু'গাঁয়ের দু'সিকরিয়া, সে লিজে আর দমন কিসকু। হঠাৎ সে লিজে আর একলাই ঘুষুরটারে দেখতে পায়, সাথ-সাথ লক্ষ্যস্থির করে সার মারে। সারটা ঘুষুরের কোড়ামে, পাঁজরে লাগে। ঘুষুরটা যন্ত্রণায় কো-কো করে ওঠে। ঠিক সেই সময় আরো একটা সার উল্টা পাশ থাকতে আসছে, কিন্তু সিটা ঘুষুরটার গায়ে লাগছেনি। খাজরুর মতে দ্বিতীয় সারটি দমনের হয়ে মরতে পারে। মনাতাং পারগানাবাবু যেন কৃপা করে খাজরুকেই ঘুযুরটার প্রকৃত-সিকরিয়ারূপে স্বীকৃতি দেন আর ঘুষুরটারেও গোকুলপুরের হাতে দেন। এমনি এক আবেদন দিয়ে খাজরু তার বক্তব্য শেষ করল। দলপতি কর্ণও তাকে সমর্থন করল।

এর পর দমনের পালা, দমনের বলবার কথা। কিন্তু সে কি করে

বলবে ? তার তো এভাবে কিছু বলার অভ্যাস নেই। তাছাড়া পারগানা-বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে এত লোকের মধ্যে সে বক্তৃতা দেওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি। কিন্তু যেমন করেই হোক তার কথা তো তাকে বলতেই হবে! হামরু ওকে চুপচাপ দেখে ধমকের সুরে তাগাদা দেয়। অগত্যা ঘামে ভিজতে-ভিজতে আর ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দমন তার বিবৃতি দিতে থাকে। সে যে-ধারকে সেন্দরা করছে, খাজরু কেনে, আর কেউই সে-ধারকে থাকছেনি। দমনই ঘুষুরটারে দেখতে পায়ে সার মারছে। সারটা উয়ার কোড়ামে লাগছে। ঘুষুরটা কো-কো করে ছুটতে-ছুটতে কয়েকবার পাক খাতে-খাতে পাছড়ে পড়ছে। ঘুষুরটা সিখানকেই মরে পড়ছে। খাজরু কোথা থাকতে ছুটে আসে বলছে উই ঘুষুরটারে মারছে।

এর পর আর কিছু সে বলতে পারল না। হামরুই বাকি কথা পেশ করল।

মনাতাং পারগানাবাবু দু'পক্ষের বক্তব্যই আন্তরিকতার সঙ্গে শুনলেন। দু'জনের সার নিয়ে দেখলেন দুটোতেই মায়াং লেগে আছে। কিছুক্ষণ সেই শুকনো রক্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ঘুষুরটির কাছে গিয়ে দেখে বুঝলেন ওর বুকের কোড়ামে একটা সারই লেগেছে। কিন্তু ওটা কার সার? কার সারে নিহত হয়েছে ওই বন্য বরাহপ্রবর? দমনের, না খাজরুর? পারগানাবাবু চিন্তান্বিত, কিছুতেই সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না।

মনাতাং পারগানাবাবুর অবস্থা যখন ঠিক এইরকম, তখন পেছনের ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসে দমনের সেই রাজকন্যা। সে পারগানাবাবুর কাছে এসে তার কানে-কানে কী যেন বলল।

দমনের রাজকন্যার কথা শুনে পারগানাবাবুর মোচায় যেন একটু লান্দা দেখা গেল। উনি হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন, ঘুষুরটির কাছে গেলেন, দমন আর খাজরুর সারদুটি মৃত বরাহের বুকের পাঁজরের ক্ষতস্থানে বারবার ঢোকালেন এবং বার করলেন। বেশ কিছুক্ষণ

পারগানাবাবু তার এই বিডাঁউ চালালেন। পরীক্ষান্তে অবশেষে তার মোচার লান্দা আরো প্রসারিত হ'ল। সমস্ত জনতা বুঝল পারগানা-বাবু তার পরীক্ষায় সফল হয়েছেন।

বিডাঁউ শেষ করে পারগানাবাবু আবার তার জায়গায় ফিরে এলেন, মুখে স্মিত হাসি নিয়ে চারদিক তাকাতে তাকাতে উনি বললেন, নোয়াগিঙ আরো জাপে কানা—আপনাদের কাছকে মোর কথা বলিঠি। সমস্ত জনতা অসীম আগ্রহে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

দমনের রাজকন্যাও এই সময় পারগানাবাবুর একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। জনতা কৌতূহল ভরে ওকেও দেখতে থাকে।

আর দমন? ঘুঘুর শিকারের আনন্দ, তাকে কেন্দ্র করে মোকোরদোমা, পারগানাবাবুর বিচার এবং রায়, শিউলী গাঁয়ের সম্মান, কোনো কিছুই সে ভাবছে বলে মনে হয় না। একমনে ভেবে চলেছে তার পুনরাবিষ্কৃত রাজকন্যার কথা। কুড়িটির মানসিকতাও মনে হয় একইরকম। সে-ও বারবার কেবল দমনকেই দেখছে; মুখে সলজ্জ হাসি।

হামরু ভাবে, অঙ কেবল দমনার মোনেই লাগেনি, কুড়িটির মোনেও লাগছে। হামরু এতে খুশিই হয়। এখন বাকি ওর সামাজিক পরিচয়, সেটা মোকোরদোমাটা মিটে গেলেই জেনে নেওয়া যাবে।

পারগানাবাবু ঋজু আর দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর উনি যা বললেন তার সার কথা এরূপ: মোকোরদোমাটি নিয়ে উনি যখন হিমসিম খাচ্ছিলেন, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না, তখন তাঁর কুড়ি এই তুলসী তাকে পরামর্শ দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করেছে। তুলসীর পরামর্শানুসারে তিনি মোকোরদোমাটির বিচার করে রায় দিচ্ছেন। এর পর পারগানাবাবু দমনকেই ঘুঘুরটির প্রকৃত সিকরিয়া বলে ঘোষণা করলেন আর ওটির মালিকানা শিউলী গাঁকেই দিয়ে দিলেন।

দমন ছাড়া শিউলী গাঁয়ের সবাই এবং সমবেত জনতার এক বৃহদংশ পারগানাবাবুর ঘোষণা শুনে উল্লসিত হ'ল, দমন আর শিউলী গাঁয়ের জয়ধ্বনি দিল। শিউলী-শিবিরে তুমদা আর রেগড়া বেজে উঠল। মাতাল

আর ধুমা সেরেঙও শুরু করল। বাতাসী এনেচ আরম্ভ করল।

কিন্তু দমন? এই সাফল্যের বার্তা তার মনে কি প্রতিক্রিয়া আনল? তাকে যেন খানিকটা হতাশ মনে হ'ল। রাজকন্যা পারগানাবাবুর মেয়ে, এই তথ্যই কি তাকে হতাশ করল? কিন্তু কিছু পরে যখন তুলসীকেও তার জয়োল্লাসে মুখর হতে দেখল, তুলসীর পায়ে নাচের ছন্দ আর কণ্ঠে সেরেঙের সুর ধ্বনিত হতে দেখল, তখন যেন কিছুটা হতাশামুক্ত হতে পারল দমন। তার মুখেও যেন ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। দমনের অনুকূলে তুলসীর আবেগ আর উল্লাস মন্দ্রিত হতে দেখে হামরুও খুশি।

একপক্ষ খুশি হলেও অপরপক্ষ অর্থাৎ গোকুলপুরের সবার মেৎ আর মোচায় বিষাদের ঘনছায়া নেমে এল। পারগানাবাবু পাশের গাঁয়ের লোক হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, তার কুড়ি দমনের জয়োল্লাস করছে, ঘুঘুরটি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল, সমাজে তাদের বোহোক হেঁট হ'ল, শুধু এইসব কারণেই যে ওরা ভেঙে পড়ল তা কিন্তু নয়। ওদের বিমর্ষ-বিহ্বল হওয়ার পেছনে তার চেয়েও ছিল বড় একটা কারণ। বিচারের পরেও বিচার ছিল। সেই বিচারের কথা ভেবেই ওরা কাহিল হয়ে পড়ল। কর্ণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

একপক্ষের জয়োল্লাসের জন্য পারগানাবাবু এতক্ষণ কিছু বলতে পারছিলেন না। উল্লাসধ্বনি একটু থিতিয়ে এলে উনি ওর রায়ের শেষ-পর্ব ঘোষণা করলেন। খাজরু মাণ্ডি গুরুতর অপরাধ করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ-সহ গোটা খাজরু-দলই অপরাধী। ওদের কামুর কেবলমাত্র দমন বা শিউলী গাঁয়ের প্রতি সীমাবদ্ধ নয়, ওদের অপরাধ সেন্দরা-পোরোবের সঙ্গে সম্পর্কিত সমবেত সমস্ত জনতার কাছেও। ওরা মিথ্যা-চরণ দ্বারা সমস্ত নরনারীকেই অপমানিত করেছে। পবিত্র সোনেতকে বিঘ্নিত করেছে, দূষিত ও অপবিত্র করেছে অযোধ্যার মেলা-প্রাঙ্গণকে। এককথায় বছরের এই নির্দিষ্ট পুণ্য দিনটিকে অপবিত্র করেছে খাজরু আর গোকুলপুর। সেন্দরা-পোরোবের সকল মাধুর্য ওরা নষ্ট করেছে। সুতরাং এই অপরাধের জন্য খাজরু আর গোকুলপুরকে সাজাহ্ পেতে

হবে। ওদের ওপর জরিমানা হবে। বার গেল মোড়ে অর্থাৎ পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে হবে ওদের। পবিত্র সোনেতে দমনই একমাত্র বড় সিকরিয়া যে বড় শিকার ধরতে পেরেছে। অতএব জরিমানার অর্ধেক টাকা দেওয়া হবে দমনকে তার বীরত্ব আর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ-বাকি অর্ধেক টাকা ব্যয় হবে পারগানার সামাজিক কাজে। মনাতাং পারগানা-বাবু দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, গোকুলপুর টাকা আদায় দিয়ে তবে স্থান-ত্যাগ করতে পারবে, তার আগে নয়।

গোকুলপুর যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে।

সমবেত জনতা দমন আর শিউলী গাঁয়ের জয়োল্লাসে আবার একবার ফেটে পড়ল। তুমদা আর রেগড়া আবার জোরে বেজে উঠল। দমনকে তংকায় নিয়ে সবাই নেচে-গেয়ে মেলা-প্রাঙ্গণকে সত্যি-সত্যি উৎসব-প্রাঙ্গণে পরিণত করল। এই উৎসবে তাদের মধ্যে তুলসীও আছে।

শিউলী গাঁ ক্ষাত্রচর্চায় বিজয়ী হয়ে ফিরে এল। হামরু আর দমন আরো একদিক থেকে জয়ী হয়ে ফিরল—কুড়িটির পরিচয় ওরা জানতে পেরেছে, জানতে পেরেছে ওর মোনের খবরও। এই জয়ে ওরা খুশি হ'ল, আবার চিন্তিত বা হতাশও কিছুটা। কুড়িটি যদি পারগানাবাবুর কুড়ি না-হয়ে কোনো সাধারণ ঘরের মেয়ে হ'ত তবেই ছিল ভালো।

অযোধ্যা থেকে ফিরে আসার পর ওই চিন্তাই ওদের বিব্রত করছে। মজুর-খাটা বুড়ো কটাইয়ের মজুর-খাটা কোড়া দমনের সঙ্গে পারগানাবাবুর কুড়ির বাপলা কিভাবে হতে পারে, তা ওরা ভেবে পায় না। বিয়ে তো দূরের কথা, এ প্রশ্ন আদৌ তোলা যায় কিনা, তা ওরা বুঝে উঠতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে আরো কয়েকটা দিন কাটল হামরুর। ওদিকে দমন তখন প্রায় অপ্রকৃতিস্থ। অগত্যা হামরুকে তৎপর হতেই হয়। অনেক ভাবনা চিন্তার পর সে একদিন সংগোপনে পুরণের কানে কথাটা তুলল। পুরণ বিস্ময়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে-খেতে কথাটা বলল হামরুর আপা

বাংরু হাড়ামকে। বাংরু আরো বিস্মিত হ'ল, হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না, সে বুড়ো কটাইকে হামরু আর দমনের ওই ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাবের কথা শোনাল। বুড়ো কটাই ওদের চেয়েও বিস্মিত হ'ল, হামরু-দমনের চান্দো ধরবার বাসনাকে চিৎকার করে ব্যঙ্গ করল। এইভাবে হামরুর ওই অযৌক্তিক প্রস্তাব একসময় পল্লীর সবার কানে গিয়ে পৌঁছল এবং লেলহা-প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য সবাই হামরুকে ব্যঙ্গ করল।

কিন্তু হামরু এতে রাগ করল না। এটা যে স্বাভাবিক সে তা জানে। তাই, সব আশা ছেড়ে দিল, তাও নয়। হামরু ভালো করেই জানে, বুড়ো কটাই-বাংরু-পূরণের মধ্যে যে কোনো একজনকে কোনোক্রমে একবার ওর প্রস্তাবের অনুকূলে আনতে পারলেই সবাই একসময় ওর দিকে চলবে। বাপলা আসলে হবে কিনা, হামরু এই মুহূর্তে সেটা ভাবছে না, সে চায় প্রস্তাবটি পারগানাবাবুর কানে গিয়ে পেঁছিক। সে তো জানে বাপলা না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আশ্চর্য ওদের মোন আর বোহোক, মন আর মস্তিষ্ক। হামরু যা ভেবেছিল কয়েকদিন যেতে না-যেতেই তাই সত্য হ'ল। যে-পুরণ একদিন হামরুর কথা শুনে বিস্ময়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছিল, অন্য একদিন কথায়-কথায় সেই পূরণই হামরুর প্রস্তাব সমর্থন করে বসল। আর কোথায় যায়! পূরণের দেখাদেখি বাংরু এবং বাংরুর কথা শুনে বুড়ো কটাইও রাজী হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে পাড়ার অন্যান্য সবাইও হামরুর প্রস্তাবের পক্ষে এসে গেল। ওর বন্ধুরা তো আগে থেকেই পক্ষে ছিল। অবশেষে একদিন সবাই একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তে এল যে, হামরুর প্রস্তাবটা পারগানাবাবুর কাছে পাঠানো যেতে পারে, ওর মধ্যে দোষের কিছু নেই।

অবশেষে একদিন সবাই রায়বারের খোঁজ করল। এবার তো আর সাধারণ ঘটকে হবে না। এবার যে মনাতাং পারগানাবাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ। এবার চাই যোগ্য, দক্ষ আর পারগানাবাবুর বাড়িতে কাজের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন রায়বার। শেষপর্যন্ত অবশ্য যোগ্য এক রায়বারও পাওয়া গেল।

পারগানাবাবুদের বাড়ির ঘটকালিতে পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে তার। সে হ'ল কালিয়াচকের স্মুরেন হাঁসদা। পূরণ আর বাংরু কালিয়াচকের হাটে গিয়ে স্মুরেন হাঁসদার সঙ্গে দেখা করল।

পরের দিনই রায়বার চলল শিউলী গাঁয়ে। ভালো হাড়িয়া পরিবেশন করে তাকে খুশি করা হ'ল। কিন্তু দমনের আর্থিক সংগতি আর সামাজিক স্থিতির কথা শুনে রায়বার যেন দমে গেল। হামরু তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে জনান্তিকে দমন-তুলসীর মোনে অঙ ধরার খবরও তাকে দিল। রায়বার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল সেদিনের মতো।

দু'-তিনদিন পরে আবার সে লাম্বা মুখে ফিরে এসে জানাল শিউলী গাঁ কুড়ি দেখতে যেতে পারে, মনাতাং পারগানাবাবু কুড়ি দেখাতে রাজী হয়েছেন। এ-খবরে শিউলী গাঁয়ে খুশির জোয়ার বন্যা এনেছে। সেই বন্যায় ভাসতে-ভাসতে ওরা বুধহিলোকে কুড়ি দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ধার্য করে রায়বারকে জানিয়ে দিল। রায়বার যথারীতি সে-কথা পারগানাবাবুকেও জানিয়ে এল।

নির্দিষ্ট বুধহিলোকে গেলজনের এক দল গেল বকুল গাঁয়ে তুলসীকে দেখতে। প্রথানুযায়ী হাড়াম বা মাঝি-হাড়ামের বাড়িতে ওদের উঠবার কথা, বসবার কথা, সেখানে বসেই কুড়ি দেখবার কথা। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা হ'ল না। কুড়িটি যেহেতু স্বয়ং মনাতাং পারগানাবাবুর, অতএব হামরুদের আর অন্য কোথাও উঠতে হ'ল না, ওরা পারগানাবাবুর ওড়াকে গিয়েই উঠল।

পারগানাবাবু ছটকাতে নতুন পটিয়া পেতে দশ অতিথিকে বসতে দিলেন। যথানিয়মে একদল জোয়ান কোড়া এসে ওদের ডাংগা ধুয়ে দিল, তংকার গামছা দিয়ে পায়ের দাক মুছে দিল। তারপর ওদের আপ্যায়িত করা হ'ল শালপাতায় মোড়া বিড়ি আর হাড়িয়া পরিবেশন করে।

অবশেষে কুড়ির বেশে এল তুলসী। সে সবাইকে কোয়জণ্ড করল।

বাংরুর অনুমতি পেয়ে সে এক কোণে জুড়ুপ করল, বসে পড়ল। সবাই যেন তুলসীকে কাছে বসে দেখার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ। অনেক প্রস্তুতির পর পূরণ জিজ্ঞেস করল, আমা য়িতুম দো-চেৎ ? অর্থাৎ তোমার নাম কি ?

তুলসী সলজ্জ উত্তর দেয়, ইঙা জিতুম দো তুলসী। অর্থাৎ আমার নাম তুলসী।

এরপর ওরা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না, কৃতজ্ঞচিত্তে তুলসীকে উঠে যাওয়ার অনুমতি দিলো।

কুড়ি পছন্দ হওয়া-না-হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না, শিউলী গাঁ সেজন্য আসেওনি। ওরা এসেছে শুধু নিয়মরক্ষার জন্য। ওদের কাছে দেখাদেখিটা গুরুত্বহীন হলেও পারগানাবাবুর কাছে তা না-ও হতে পারে। ওদের মতামতটা এক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নই নয়, মনাতাং পারগানাবাবু এ-বাপলায় সম্মত হবেন কিনা সেটাই হ'ল আসল প্রশ্ন। পারগানাবাবুকে খুশি করবার জন্যই সমস্ত প্রথা শিউলী গাঁকে মানতে হবে, এইভাবে পারগানাবাবুর কাছে ওদের পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই বাপলা, অন্যথায় না।

যাহোক সেই প্রথা মেনেই শিউলী গাঁয়ের তরফে কুড়ি দেখে পছন্দ হওয়ার কথা ঘোষণা করল বাংরু। মনাতাং পারগানাবাবু কবে কোড়া দেখতে যাবেন, সে-কথাও সে জানতে চাইল। পারগানাবাবু মুখে মৃদু হাসি নিয়ে শনিবার-হিলোক কোড়া দেখতে যাওয়ার দিন ধার্য করলেন।

দেখতে-দেখতে শনিবারও এসে গেল একদিন। পারগানাবাবুও দশ-জনের একদল নিয়ে কোড়া দেখতে এলেন। চার-পাঁচটা নতুন পটিয়া পেতে ওদের বসতে দেওয়া হয়েছে। হামরু, ট্যাংরা, ছোটকটাই, থুম্প আর ধূমা তংকায় কিচরিচ জড়িয়ে ওদের পা ধুয়ে দেয়, কিচরিচ দিয়ে ওদের পায়ের জল মুছে দেয়। পূরণের আপা তখনো বেঁচে ছিল। পল্লীর বয়োজ্যেষ্ঠরূপে সে আপ্যায়িত করল অতিথিদের শালপাতায় মোড়া বিড়ি দিয়ে। হাড়াম বাংরু পরিবেশন করল নতুন টকৃইতে বসানো উৎকৃষ্ট হাড়িয়া। পারগানাবাবু হাড়াম বাংরুর কক্ষাতেই উঠেছেন।

তারপর একসময় দমনকে যথাপ্রথা সাজিয়ে মনাতাং পারগানাবাবুর সামনে হাজির করা হয়। পারগানাবাবু মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ওকে দেখতে থাকেন। দমন ঘামে নেয়ে যেতে-যেতে কোনোরকমে নিজেকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। পারগানাবাবু ওকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না, কিছুই বললেনও না। সঙ্গে আর যারা এসেছিল তারা ওর আর ওর বাবার নাম জিজ্ঞেস করল। ওইটুকুর উত্তর দিতেই সে গলদঘর্ম। ওর অবস্থাটা পারগানাবাবু বুঝতে পারলেন। ওকে বাঁচাবার জন্যই বোধহয় পারগানাবাবু ভিন্ন কথা পাড়লেন। এবার সেন্দরা-পোরোবে দমন যে বীরত্ব দেখিয়েছিল গল্পচ্ছলে তিনি সঙ্গীদের সে-কথা বলতে লাগলেন। নিজের প্রশস্তি-বচন শুনতে শুনতেও দমন ঘামে ভিজে যেতে থাকে। পারগানাবাবু ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, আলোম চালাক কানা। অর্থাৎ দমন এবার আসতে পারে। দমন উঠতে পেরে বেঁচে যায় যেন।

এর পর সেই শ্বাসরোধকারী মুহূর্ত। মনাতাং পারগানাবাবুর এবার মতামত ঘোষণা করার কথা। পছন্দ-অপছন্দ জ্ঞাপনের কথা। শিউলী গাঁয়ের সবার বুক তখন কাঁপছে, কেউই কথা বলতে পারছে না। দুরু-দুরু বুকে আর থমথমে মুখে ওরা পারগানাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে। এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-একটি যুগ। এমনি অনেকগুলি যুগ ওরা অধীর-আগ্রহে প্রতীক্ষা করে কাটাল। অবশেষে পারগানাবাবু তাঁর মতামত জানালেন—কোড়া দেখে তাঁর পছন্দ হয়েছে। শিউলী গাঁয়ের সবার বুকের স্পন্দন তখন বোধহয় ক্ষণকালের জন্য থেমে গিয়েছিল। আবেগে, উত্তেজনায় আর আনন্দে।

সে-স্পন্দন ফিরে আসতে অর্থাৎ ওদের স্বাভাবিক হতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল। স্বাভাবিক হয়ে বাংরু ভয়ে-ভয়ে গনং তথা পন আর যৌতুকের কথা তুলেছিল। পারগানাবাবুর শুধু হাসলেন, কিছুই বললেন না। বাংরু অনেকক্ষণ ধরে প্রস্তুত হয়ে গনং-সংক্রান্ত নিয়মরক্ষার প্রশ্ন তোলে। পারগানাবাবু মৃদু হেসে হয়তো বা বাংরুকে সমর্থন করলেন।

তারপর আর কি, বাপলার দিন ধার্য হয়ে গেল—সুখী হিলোক।

অর্থাৎ বৃহস্পতিবার।

পাড়ায় ঘন-ঘন মিটিন বসল, সামাজ বসল, চলল হাজার শলা-পরামর্শ। দমনের বাপলা তখন আর ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপার থাকল না। ওদের কাছে এক সর্বজনীন পোরোব এটা। সমস্ত সাঁওতালপল্লী উদ্বেল হয়ে উঠল।

লুখী হিলোকে ওরা গরুর গাড়িতে করে বরের বেশে দমনকে সাজিয়ে নিয়ে বকুল গাঁয়ে গেল। পারগানাবাবু কোনো বাধ্য-বাধকতা আরোপ না-করলেও গনং ওরা ঠিকঠাক মতোই নিয়েছিল, দিয়েও ছিল। বার গেল, বিশহাত লম্বা শাড়ি নিয়েছিল তিনখানা, ঘুষুর, দামকোম, সিমইঙ্গা-সিম-সাণ্ডি, সবই। প্রথানুযায়ী বরযাত্রীরাও মালা-ঘুন্‌সি নিতে ভোলেনি। এমনকি বরযাত্রীদের হাড়িয়ার অর্ধেকটা নিয়ে যেতেও হামরুরা ভুল করেনি।

নির্দিষ্ট লগ্নে দমন-তুলসীর বাপলা সুসম্পন্ন হয়ে গেল। আর আপার দেওয়া চাঁদির গয়না হটে-তিতে-মুতে-লুতুতে পরে, আপার দেওয়া মোঙ্গ পোশাক-আশাকে সজ্জিত হয়ে, আপার দেওয়া প্রসাধনসামগ্রী দিয়ে নিজের অঙ্গমার্জন করে, পরের দিন বহুবেশে তুলসী চলে এল শিউলী গাঁয়ে, দৈন্যতাড়িত বুড়ো কটাই আব নিঃস্ব দমনের আঁধার-ঘরের চান্দোরূপে।

হামরু কিন্তু সেদিন একটা প্রশ্নের উত্তর পায়নি, পববর্তী কালেও পায়নি, কোনোদিনই পায়নি। পারগানাবাবু কি দেখে সেদিন পছন্দ করেছিলেন দমনকে, কি দেখে সেদিন দমনকে তিনি তার জাঁবায় নির্বাচন করেছিলেন? সেন্দরা-পোরোবে বড়শিকার ধরে কি পারগানাবাবুকে মুগ্ধ করেছিল দমন? সেজন্যই কি উনি দমনকে জামাইরূপে বরণ করেছিলেন? নাকি এর মধ্যে তুলসীর হাত ছিল? তুলসী কি বাধ্য করেছিল তার আপাকে মত দিতে? থাক সে-কথা।

দমন-তুলসীর বাপলা তখনো শিউলী গাঁয়ের আকাশ-বাতাসকে মুখর করে রেখেছে। হাড়িয়ার নেশা কাটিয়ে তখনো ওরা উঠতে

পারেনি। মাদল, এনেচে আর সেরেঙ তখনো সম্পূর্ণ থেমে যায়নি। ঠিক এই সময় ঘটল আর-একটা নাটক, হ্যাঁ নাটক ছাড়া তাকে আর-কিচ্ছু বলা যায় না।

শিউলী গাঁয়ের সবাই গরিব। এক-আধজনের অবস্থা একটু-আধটু ইতর-বিশেষ হলেও প্রায় সবাইকেই দীন বলা চলে। প্রায় সব বাড়ির মেয়ে-বউয়েরাই কামীনের কাজ করে পয়সা উপার্জন করে। পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই এটা ওদের করতে হয়। অন্যের খেতে-খামারে, পুকুরে-বাড়িতে নানারকম কাজ করে ওরা জীবিকার্জন করে। আদিবাসী সমাজে বেশি শ্রম করে মেয়েরাই, বেশি সংগ্রাম করে, বেশি অর্থ নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ-সমাজও পুরুষ-শাসিত, তবুও উদয়াস্ত পরিশ্রম করে টিকে থাকার অর্থ নৈতিক কঠোর সংগ্রামে পুরুষের চেয়ে মেয়েদেরই মুখ্যতর ভূমিকা।

তুলসী যখন বাবার দেওয়া গয়না-পোশাক-প্রসাধন সামগ্রীতে সজ্জিত হয়ে নববধূর বেশে শিউলী গাঁয়ে এল তখন প্রশ্ন উঠল, তুলসী কি করবে? সবাই ভাবল তুলসী কখনো পরের কাজ করতে বাইরে যাবে না। পারগানাবাবুর আদরের কুড়ির ওসব কাজের অভ্যাস থাকার কথা নয়, ছিলও না। আর পারগানাবাবুর মেয়ে বলে তার মধ্যে যদি কোনো গর্ব থাকে, সে যদি অন্যের খেতে-খামারে-পুকুরে-বাড়িতে কামীনের কাজ করতে যেতে অস্বীকার করে, তাকে কেউ দোষ দিতে পারে না। তাই সবাই জানত, দমনের অবস্থা ভালো হোক আর মন্দই হোক অন্য মেয়েদের মতো সে অন্যের কাজে, বাইরের কাজে যাবে না, যেতে পারবে না। তাছাড়া বুড়ো কটাই আর দমন গরিব হলেও, নিঃস্ব হলেও, তুলসীকে ওরা প্রাণভরে ভালোবাসল। মনাতাং পারগানাবাবুর মেয়ে আপন ইচ্ছায় ওদের ভাঙা কম্বায় এসেছে, এর জন্য তুলসীর প্রতি ওরা কৃতজ্ঞ। ওরাও চায়নি ওদের আদরের বউড়ি, পারগানাবাবুর সোহাগের কুড়ি, কামীন খেটে পয়সা উপার্জন করে নিয়ে আসুক।

অর্থাৎ সমাজের কেউ যেমন ভাবেনি, বুড়ো কটাই আর দমনও তেমনি চায়নি।

কিন্তু পরম আশ্চর্যের কথা এই, সবার সব ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে, বড়ো কটাই আর দমনের সব নিষেধ অগ্রাহ্য করে, আপার দেওয়া চাঁদির গয়না আর পারহাউ খুলে রেখে দিয়ে, একমাস যেতে না-যেতেই তুলসী পরের কাজে, কামীনের কাজে বেরিয়ে পড়ল। গোটা সাঁওতালপল্লী সেদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তুলসীর দিকে।

এ-ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে-সময় তুলসী আর দমন-বুড়ো কটাইয়ের মধ্যে খানিকটা হড়হাতও গড়ে উঠেছিল, ভুল বোঝাবুঝি আর তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। তুলসী কিন্তু তার সেবা-আন্তরিকতা-বিশ্বস্ততা-ভাগী দিয়ে অচিরেই সেই হড়হাত দূর করেছিল। বুড়ো কটাই আর দমনের মনের সব ভ্রান্তিই সে দূর করে দিয়েছিল।

তুলসী বলত, ভালো করে কন্ধা তৈরি করতে হবে, কুঁড়ে ঘরে সে স্বামী-শ্বশুরকে বেশিদিন থাকতে দেবে না। কিনতে হবে ভালো দেখে দুটি ডাংরা, হালের গরু। নিজেদের ওতটুকু তো ভালো করে চাষ করতেই হবে, আর কয়েক বিঘে বর্গাও করতে হবে, আরো বাড়াতে হবে নিজেদের ওতও। এসব করতে চাইলে টাকা চাই, আর টাকা চাইলে তুলসীকে যেতেই হবে পরের কাজে।

নতুন পতিগৃহে এসেই যদি কোনো আদিবাসী রমণী স্বামীর ঘর আর অস্তিত্বকে এমনি আপন বলে গ্রহণ করতে পারে, স্বামী আর পতিগৃহের মঙ্গলের জন্য যদি এত বিবেচনাশক্তির পরিচয় দিতে পারে, নিজের সুখময় অতীত, অতীতের সব অভ্যাস আর বিশ্বাস যদি এমনি করে অস্বীকার করতে পারে, স্বামীর মঙ্গলচিন্তায় যদি এমনি করে সার্বিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয় তবে সেই রমণীকে কি কেউ ভুল বুঝতে পারে? ভালো না-বেসে থাকতে পারে? না, পারে না। বুড়ো কটাই আর দমনও পারল না। পারল না পাড়ার কেউই।

তখন থেকেই দমন আর তুলসী বাইরের কাজে যেতে লাগল।

হোংহার বাবা বৃদ্ধ বলে বুড়ো কটাইকে সে পরের কাজে যেতে দিত না। সে থাকত কেবল নিজেদের কন্ধা, গরু-বাছুর, চাষবাস নিয়েই। দমনকেও সে সবসময় মজুরের কাজ করতে যেতে দিত না, নিজেদের জমিনটুকুতে যখন চাষ চলত, তখন তো নয়ই।

এরকম ব্যবস্থা টিকে ছিল বুড়ো কটাই যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন। বুড়ো কটাইয়ের গচ্‌ হওয়ার পর দমনকে সে আর বিশেষ একটা বাইরের কাজে নিয়ে যেত না, যেতে দিত না। দমন ওড়াকে থেকে নিজের বিল আর বর্গাবিল পরিশ্রম করে চাষ করত, ধানচাল গুছিয়ে রাখত, গরু-বাছুর-ঘুষুর-কুঁকড়ার দেখাশোনা করত, কন্ধার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ তার। আর তুলসী তার সুগঠিত শরীর আর নির্মল নিষ্পাপ মন নিয়ে একনিষ্ঠ-ভাবে বাইরের কাজ করত। মনাতাং পারগানাবাবুর আদরের কুড়ি এইভাবে একদিন অঞ্চলের সবচেয়ে ভালো এবং সৎ কামীন হতে পারল—এ আর আশ্চর্য কী।

সত্যি কথা বলতে কি, এইভাবেই সে সংসারের অনেক উন্নতিও করেছিল। ভোল্‌টাই পাল্টে দিয়েছিল। তুলসী যখন বহুবেশে দমনের ঘরে আসে তখন ওদের ওত বা বিল ছিল মাত্র দু'বিঘে, আর এখন তুলসীর মৃত্যুর সময়ে সেটা বেড়ে হয়েছে পাঁচবিঘে। যে-ভাঙা কুঠরীতে তুলসী এসে উঠেছিল তার জায়গায় এখন হয়েছে বড় কন্ধা, ওদের ছেলে-মেয়েরাও যেখানে নিশ্চিতে বসবাস করতে পারবে। আজ দমনের সুন্দর আর দামী দুটি ডাংরা আছে, ততোধিক ভালো দুটি দামকোম বা হেলে বাছুরও আছে। তাছাড়া আছে ঘুষুর, সিমইঙ্গা, সিমশাণ্ডিও। অথচ সেদিন এসব কিছুই ওদের ছিল না।

সরল-প্রাণ দমন যদি এহেন বহুর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে, তার প্রতি ভাগীতে মুগ্ধ আর অন্ধ থাকে তাকে কি অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে? এহেন বহুর গচে আজ যদি সে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে, তাকে কি অপ্রত্যাশিত বলা যাবে? এসব কাহিনী যারা জানে না তারা ভাবতে পারে, কিন্তু সাগ্নিক তা ভাবে না। সাগ্নিক জানে, বেশ ভালো করেই

জানে, তুলসীর শোক ভুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দমনের অনেক সময় লাগবে। আর কোনোদিন সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে কিনা তাতেও সাগ্নিকের মনে সন্দেহ আছে।

॥ সা ত ॥

দমন-তুলসীর স্মৃতি-রোমন্থন করতে করতে কখন যে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সাগ্নিক তা জানে না। তবে শেষ রাতেই যে ঘুমিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুরগীকুলের প্রথম ডাক সে শুনেছিল, এটা সে বেশ মনে করতে পারে। তার মানে তিনটের পরেই সে ঘুমিয়েছে। সে-ঘুম আবার অতিপ্রত্যুষে ভেঙেও গেল পূরণের ডাকে। সাগ্নিক তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল।

পূরণ তাকে এমন একটা খবর দিল যা শুনবার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কাল রাত্রে খড়্গাপুর লোকাল থানা থেকে পুলিশ এসেছিল দমনের বাড়িতে। এখানকার কোনো মানী লোক নাকি পুলিশকে জানিয়েছিল—দমনের ঘরে চোলাই মদ তৈরি হয়েছে, মজুত আছে। ওই রিপোর্ট পেয়েই পুলিশ এসেছিল। দমনকে মত্ত অবস্থায় দেখে আর ঘরে একটুখানি চোলাই মদ পেয়ে ওকে অ্যারেস্ট করেছে। হামরু দারোগাবাবুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। গতকাল ওর বহুটা মারা গেছে, বউয়ের শোকে ও প্রায় পাগল হয়ে আছে। তাই ওকে নিয়ে বন্ধুরা বেরিয়েছিল। ওকে হাড়িয়া আর মদ খাইয়ে এনেছিল। রাত্রে খাওয়াবে বলে একটুখানি নিয়েও এসেছিল সঙ্গে।

হামরুর বিবৃতি দারোগাবাবু অবিশ্বাস করতে পারেননি, তবে ওদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা আদায় করে নিয়ে গেছেন। দমনকে একটু মারধরও করেছিলেন দারোগাবাবু।

সাগ্নিক পূরণের সঙ্গে দমনের বাড়িতে ছুটে গেল, দেখল পূরণ যা বলেছে তার সবখানিই সত্যি।

গতরাত্রে দমনকে দু'বার ওইভাবে দেখে এবং সারারাত দমন-তুলসীর কথা ভেবে সে এমনিতেই ক্লান্ত, অবসন্ন। তারপর সকালে উঠে শুনল এই খবর। সাগ্নিক অন্তরে দারুণ ব্যথা পেল। কিন্তু সে ব্যথা পেলেই বা কি আর না পেলেই বা কি! তার তো কিছু করবার নেই, এমনকি কিছু বলতেও সে পারে না। তাই হামরু-দমনের সঙ্গে নামমাত্র কথাবার্তা বলেই সে বাড়িতে ফিরে এল। বাড়িতে ফিরে সে সারা সকালটা কাটাল গম্ভীর আর নির্বাক হয়ে। তারপর এক সময় সে স্নান করে, আহার করে এবং জামাকাপড় পরে ইস্কুলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

ইস্কুলে গিয়ে সাগ্নিক দেখে পুতুল আর যুগল আগেই এসে গেছে। সাগ্নিকের চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে পুতুল বলে, কি ব্যাপার, রাত্রে ঘুমোননি নাকি?

সাগ্নিক ম্লান হেসে বলল, কেন, ঘুমিয়েছি তো?

যুগল বলে, নতুন আবার কুছু হ'ল নাকি দাদা?

সাগ্নিক কিছু বলার আগেই পুতুল বলল, কি হয়েছে বলুন তো।

সাগ্নিক তখন সবকিছুই ওদের খুলে বলল। সবকিছু মানে কাল রাত্রে দমনের সঙ্গে দু'বার দেখা হওয়া, রাত্রে সেইসব নিয়ে একটু ভাবনা এবং সকালে পূরণের আসা, ওই খবর দেওয়া, দমনের বাড়িতে ওর যাওয়া, এইসব। তবে সারারাত সে যে জেগে-জেগে দমন-তুলসী সম্পর্কে ভেবেছে সেটা চেপে গেল। সাগ্নিক চেপে গেলে কি হবে, পুতুলের যা বুঝবার সেটা সে সহজেই বুঝল। বুঝে সে পাথর হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ইস্কুলের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। যুগল ক্লাস ওয়ানে বসে একযোগে ওয়ান আর টু-এর ছেলেমেয়েদের পড়াতে থাকে। পুতুল যায় ক্লাস থ্রিতে। সাগ্নিক নিজের চেয়ারে বসে ক্লাস-ফোরের ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে চলে। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুতুল

এসে দাঁড়াল সাগ্নিকের পাশে। পুতুলকে একটু আগে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে সাগ্নিক বুঝেছিল পুতুল ওকে কিছু-একটা বলবে। পুতুল কাছে আসাতে তাই সে বিস্মিত হয় না। মুখে ক্লান্তি নিয়ে সহজ হওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল, এসো পুতুল।

পুতুল যেন আরো গম্ভীর হয়ে যায়।

সাগ্নিক বলল, অতো গম্ভীর হয়ে থেকো না, কথা বলো।

দমনের ঘরে চোলাই মদ তৈরি হয়েছে, মজুত আছে, এ-রিপোর্ট পুলিশের কাছে কে পাঠিয়েছে বুঝতে পেরেছেন? গম্ভীর মুখেই প্রশ্ন করল পুতুল।

কেন পারব না?

কে করেছে?

ব্রজেন ঘোষ ছাড়া এখানে মানী লোক আর কে আছে?

তার উদ্দেশ্য?

এখনো ঠিক স্পষ্ট নয়। তবে এটা ঠিক, ব্রজেন ঘোষ যদি ওর পেছনে লাগে তবে ওর ভাগ্যে চূড়ান্ত বিপর্যয় অপেক্ষা করছে!

সাগ্নিকদা!

বলো।

আপনি আর ওসবের মধ্যে যাবেন না, সাঁওতালদের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামাতে যাবেন না। মর্মস্পর্শী আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা বলল পুতুল।

তুমি ঠিকই বলেছ পুতুল।

ওসব নিয়ে ভেবে-ভেবে নিজেকে অযথা বিব্রত করবেন কেন?

পুতুল, সেটা আমিও বুঝি। আমার যে কিছু করবার থাকে না, ভেবে-ভেবে শুধু নিজেরই ক্ষতি করি, সেটা আমিও জানি পুতুল। আর তুমি যে আমাকে বারবার সাবধান করে দাও, সেটা নিয়েও আমি অনেক সময় ভাবি। তবুও বিশ্বাস করো পুতুল, যতই অসমর্থ আমি হই না কেন, আমার মানসিকতা ওইসব অন্যায়কে মেনে নিতে চায় না।

পুতুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, সেটা আমি জানি সাগ্নিকদা। আর জানি বলেই বলছি এবার আমাদের সত্যি সত্যি সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। সাগ্নিক পুতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো ওর সাবধান-বাণীর অর্থ খুঁজতে থাকে। পুতুল আবার বলল, আমার কথা মনে থাকবে তো?

সাগ্নিক ম্লান হেসে বলল, আচ্ছা, এখন যাও, ক্লাস করো গে। টিফিনে বসে ধীরে-সুস্থে সব আলোচনা করা যাবে।

আলোচনা যা-ই করুন না কেন, ওসব ঝুট্-ঝামেলায় আপনাকে আর জড়িয়ে পড়তে দেওয়া হবে না। কথা বলতে বলতে পুতুল নিজের ক্লাসে চলে যায়।

সাগ্নিক পেছন থেকে চলমান পুতুলকে দেখতে থাকে।

টিফিনে আবার আলোচনা বসেছিল। পুতুল, এমনকি যুগলও ওকে বারবার বলেছিল শিউলীগাঁ, ব্রজেন ঘোষ, আদিবাসীপাড়া, সবার সম্পর্কে নির্বিকার হয়ে এখানে চাকরি করে যেতে। সাগ্নিক শেষ পর্যন্ত এইভাবে কথাও দিয়েছিল, আমি চেষ্টা করব।

তারপর আট-দশদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এর মধ্যে হামরুদের সঙ্গে ওর আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। দিনগুলো সাগ্নিকের মোটামুটি স্বস্তিতে কেটেছে বলা চলে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আবার হামরুর সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায় আর কতকটা সেই আগের অবস্থাতেই ফিরে যায় সাগ্নিক।

সেদিন ইস্কুল ছুটির পর সাগ্নিক বাড়ি আসে, চা খায়, খানিকটা বিশ্রাম নেয়। তারপর রোদ্দুরের তেজ কমলে সে টেস্ট-রিলিফের কাঁচা-রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। পায়ে-পায়ে শিরীষ মোড়ের দিকে এগিয়ে চলে। কোনো কাজ নেই, এমনি ঘুরতে থাকে।

পাকা-সড়ক ধরে কালিয়াচকের দিক থেকে শিরীষমোড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল একদল সাঁওতাল মজুর-কামীন। কারো মাথায় ঝুড়ি, কারো কাঁধে কোদাল। সাগ্নিক দূর থেকেই ওদের দেখতে পায়। ওরা

আরো একটু এগিয়ে এলে সাগ্নিক বুঝতে পারে ওরা শিউলী গাঁয়েরই সব। ওরা আরো কাছাকাছি আসে। সাগ্নিক এবার ওদের চিনতে পারে। হামরু-সহ দলের সবাইকেই ও এখন চিনতে পাচ্ছে। মেয়েদেরও। ওরা যখন শিরীষ মোড়ের কাছাকাছি চলে এল, সাগ্নিক বুঝতে পারল ওরা হাড়িয়া খেয়েছে। হামরুকে দেখে মনে হ'ল সে খেয়েছে সবার চেয়ে বেশি। ওরা কাঁচারাস্তায় নামল, সাগ্নিককে দেখে সবাই থমকে দাঁড়াল।

সাগ্নিকের সামনে দাঁড়িয়ে হামরু এমনভাবে তাকাতে থাকে যেন ওকে সে চিনতেই পারছে না। সাগ্নিকও কিছু বলছে না, মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ওকে দেখে যাচ্ছে। হামরুর আচরণ দেখে দলের অনেকের মধ্যে হাসির গুঞ্জন ওঠে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই হামরুর। সে সাগ্নিককে দেখতে দেখতে বলে, হেঁ, তুই মাষ্টারবাবুই বটে। তা ইখানকে কি কর্ছু? হাবা খাচ্ছু, হাবা? হিঃ হিঃ হিঃ। সে হাসতে থাকে।

সাগ্নিক হাসতে হাসতে বলল, হাড়িয়া ভাটিতে গিয়েছিলি?

হিঃ হিঃ হিঃ।

খুব টেনেছিস বুঝি?

হিঃ হিঃ হিঃ।

সবাই খেয়েছিস?

হিঃ হিঃ হিঃ।

মাতালও স্বীকার করল।

সাগ্নিক এবার বাতাসী, চম্পি, বেণী, গিবি আর অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা?

সবার হয়ে বাতাসী বলে, হেঁ বাবু, মোরাও খায়ে লিছি।

হামরু হাসতে হাসতে বলে, সবাই খায়ে লিছে মাষ্টরবাবু! বহুৎ গরম পড়ছে আজ, তাই কাজ থাকতে ঘুরার পথে সবাই একটুকু— হিঃ হিঃ হিঃ।

সাগ্নিক জানতে চাইল, কোথায় কাজ করতে গিয়েছিলি?

ট্যাংরাচক। হামরুই উত্তর দেয়।

কি কাজ?

পুকুরকাটাই!

ক'দিন কাজ করেছিস ওখানে?

এক-হাপ্তা!

তাই বুঝি তোদের দেখতে পাইনি এতদিন?

হিঃ হিঃ হিঃ।

সাগ্নিক হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, তা দমনকে দেখি না কেন রে, তার খবর কি?

আশ্চর্য! দমনের প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হামরু যেন ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠল। তার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে সে বলল, উয়ার কথা আর শুধাসনি মাষ্টরবাবু। মাতালের কণ্ঠে যেন এখন অনেকটাই স্বাভাবিক সুর।

কেন?

উটা আর বাঁচবেনি, উটারও গচ্ হবে।

কেন, আবার কি হ'ল?

লতুন আর কি-টা হয়ে মরবে?

সে-কি আজও স্বাভাবিক হয়নি?

না।

কাজকর্ম করছে?

কুচ্ছু লয়।

এভাবে কতদিন চলবে?

মুইও তো সিটাই ভাবে মরিঠি!

এই সময় বাতাসী ওর হাত ধরে টানতে থাকে, তাড়াতাড়ি যেতে বলে। অন্যান্যরাও যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। হামরুকে নিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। সাগ্নিক পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের, বিশেষ করে হামরুকে, দেখছে।

ওরা অনেকখানি এগিয়ে যায়। রাম মাইতির গদিঘরও পেরিয়ে যায়। সাগ্নিক এবার পেছনে অর্থাৎ শিরীষ মোড়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

শিরীষ মোড়ের দিকে আস্তে-আস্তে হেঁটে চলল সে। কিছুক্ষণ পরে পেছনে হামরুর কণ্ঠস্বর শুনে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, সঙ্গী-সাথী ছেড়ে সে কখন একা সাগ্নিকের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাগ্নিক ওর দিকে ভালোভাবে তাকায়। হামরুর মধ্যে হাড়িয়ার নেশা যেন আগের চেয়ে এখন আরো অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে বলে সাগ্নিকের মনে হ'ল। সাগ্নিক ওকে দেখতে দেখতে বলল, কি রে আবার ফিরে এলি যে।

হামরু ধীরে-ধীরে বলল, একটুকু কথা ত্যাখন তুয়ারে বলতে ভুলে গেল।

কি? সাগ্নিক আগ্রহী হয়।

দমনা আজ সামাজ ডাকেঠে!

কেন?

তুলসীয়ার ভাড়ানের কথা চালাচালি হবে। চড়কের আগে উটা ভাড়ান শেষ করবে বলেঠে।

সে তো ভালো কথা।

না মাষ্টরবাবু, না।

না কেন?

উটা কি বলছে জানু?

কি?

সামাজের সবাইকে উটা গিরা পাঠাবে। সবাইকে জোমকানা করাবে, ঘুঘুরের জেল খাওয়াবে!

সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

লয় তো মুই বলিঠি কিটা?

অতো টাকা কোথায় পাবে সে?

কাই পাবেনি।

তাহলে?

উটা কিটা বলছে জানু মাষ্টরবাবু?

কি?

সবকুছু উটা বিকিয়ে দেবে।

সব-কিছু বলতে ?

ডাংরা, মিছু, ধান, এমনকি বিলও !

না না, তা হতে পারে না।

উয়ারে কে ঠেকাবে ?

তোরা, তুই।

মোদের কথা শুনবেনি।

শোনাতে হবে।

শুনবেনি।

তাহলে উপায় ?

মুই তো কুছু দেখিঠিনি। তবে—

কি, বল!

তুই যদি পারু মাষ্টরবাবু।

আমি ?

তুয়ার কথা উটা মানে। তুই বললে যদি হয—

সাগ্নিক বলল, বেশ আমিই ওকে বলব।

মাষ্টরবাবু! হামরু ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে।

একি করছিস হামরু, উঠে দাঁড়া।

হামরু ওঠে না, সাগ্নিকের পায়ে হাত রেখে করুণ কণ্ঠে বলে, তুই উয়ারে বাঁচে দে মাষ্টরবাবু, লয়তো উটারও গচ্ হবে, ছ্যানাত্তুটাও মরে যাবে।

সাগ্নিক হামরুকে ধরে দাঁড় করাতে করাতে বলে, বেশ তো আমিই ওকে সব বুঝিয়ে বলব। সে যাতে কিচ্ছু বিক্রি না করে, অকাল মৃত্যুর শ্রাদ্ধ কোনোরকমে শেষ করে, সে-ব্যাপারে আমি দমনকে বুঝিয়ে বলব।

উয়ারে রাজী করাতে হবে মাষ্টরবাবু।

আমি চেষ্টা করব।

সাগ্নিকের প্রতিশ্রুতি শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে হামরু ফিরে গেল।

সাগ্নিকের মনটা দমনের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আবার ভারী হয়ে উঠল। আর সেই ভারী মন নিয়ে সে আরো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল। অবশেষে সন্ধ্যার ম্লানতা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ফিরে এল সাগ্নিক।

বাড়িতে ফিরতেই ব্রজেন ঘোষ সাগ্নিকের হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিলেন। সাগ্নিকের মায়ের চিঠি। হ্যারিকেনের আলোয় সাগ্নিক চিঠি পড়তে লাগল বারান্দাতে বসেই।

ব্রজেন ঘোষ তার ঈজিচেয়ারে বসে-বসে সাগ্নিকের চিঠি পড়া দেখ-ছিলেন।

সাগ্নিক একসময় মুখ তুলে ব্রজেন ঘোষকে জিজ্ঞেস করল, চিঠিটা কখন পেলেন আপনি?

এই তো একটুকু আগে পিওন আসছে, দিয়ে গেল। কেনে, কি ব্যাপার?

. দশদিন আগে মা লিখেছেন, আরজেণ্ট চিঠি।

ওরকম তো কতো হয়েঠে, কতো চিঠি আবার মারও যায়ঠে।

সেটা অবশ্য ঠিক। অনেক চিঠিই এখানে দেরি করে আসে, কতো চিঠি আবার আসেও না। শিউলী গাঁয়ে কোনো পোস্টাফিস নেই, থাকার কথাও নয়। খড়্গপুর সাব-পোস্টাফিসের অধীনে কালিয়াচকে ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস আছে একটা। শিউলী গাঁ তার অধীনে একটি ছোট্ট গ্রাম। একদিন বাদে বাদে চিঠি বিলি হয এ-গাঁয়ে। পিয়ন আসে বিকালে। চিঠি থাকে না, এই অজুহাত দেখিয়ে আবার অনেক দিন পোস্টম্যান আসে না বা সাতদিনের চিঠি একদিনে বিলি করে যায়।

সাগ্নিককে চিন্তিত দেখে ব্রজেন ঘোষ বলেন, মা কিটা লিখছে, খারাপ কিছু লয় তো মাষ্টার?

না, আমাকে যেতে লিখেছেন।

যাও, একটুকু ঘুরেই আসো। কখন যাবে, সকালেই?

তাই ভাবছি।

মা লিখেছেন : বুলা আমাকে দারুণ দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। আমি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। তুমি চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে, এসে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে।

বুলা মাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে? কিভাবে? গতবার উলুবেড়েতে গিয়ে সাগ্নিক শুনে এসেছিল, মা এক-জায়গায় বুলার বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছেন, কিন্তু বুলা রাজী হচ্ছিল না। ব্যাপারটা কি সেই প্রসঙ্গে? তা যদি হয় তবে সাগ্নিকের অতো ভাববার কিছু থাকে না। কিন্তু যদি অন্য-কিছু হয়? সাগ্নিক কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই তার দুর্ভাগ্য-পীড়িত মাকে আরো বিব্রত, আরো বিপন্ন দেখতে চায় না। তার ওপর চিঠিটার বয়স হয়ে গেছে দশদিন। তাই ব্রজেন ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সে উলুবেড়িয়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেই সময়ে আবার ঘোষগিন্নী এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। ব্রজেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে সাগ্নিকের সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দেন। ঘোষগিন্নী সব শুনে বললেন, মায়ের চিঠি য্যাখন একটুকু ঘুরে আসা দরকার।

অতএব দমনকে কিছু বলা হ'ল না। বলা তো দূরের কথা, উলুবেড়িয়া যাওয়ার আগে দমনের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাতই হ'ল না। সাগ্নিক ভাবল, উলুবেড়ে থেকে ঘুরে এসেই সে দমনকে যা-বলবার বলবে। ঘুরে আসতে আর ক'দিনই-বা লাগবে? নটা-দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব, সারাদিন মায়ের কাছে থেকে সব শুনব, রাত্রে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করব, পরশু সকালে আবার শিউলী গাঁয়ে ফিরে আসব। পরশুই দমনের সঙ্গে দেখা করা যাবে। এইসব ভাবতে-ভাবতেই সে পরের দিন সকালে খড়্গাপুর থেকে সেকেণ্ড-লোকাল ধরে চলে গেল উলুবেড়িয়ায়।

সাগ্নিক সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘোষগিন্নীর খুব মন খারাপ লাগল। মন খারাপ লাগল সাগ্নিক বা তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মায়ের কথা ভেবে নয়, খারাপ লাগল নিজের মেয়ের কথা ভেবে, হাসির কথা ভেবে। ছ্যানাটা পোয়াতী। অনেকদিন তার কোনো খবরাখবর বা চিঠিপত্র আসছে না। বারান্দায় বসে-থাকা স্বামীর কাছে গিয়ে ঘোষগিন্নী বললেন,

তোমাকে যে বলছিনি একটা খাম কিনে লিতে, লিছ ?

কি করে কিনতি ?

কেনে, কাল তো পিয়ন আসছে—

কাই আবার কাল আসছে ?

মাষ্টারকে বলছ যে ?

ও—হো—হো— । ব্রজেন ঘোষ জোরে হেসে উঠলেন ।

হাসোঠো কেনে ?

সৌসব তুমি বুঝবেনি।

ঘোষগিন্নী অবাক হলেন ঠিকই, তবে স্বামীকে বুঝতেও পারলেন ।

ওদিকে একদিন পরে ফিরবে মনে করে গেলেও, সাগ্নিক অত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারেনি, ফিরেছিল পাঁচদিন পরে। আর এই পাঁচ-দিনের মধ্যে শিউলী গাঁয়ে অনেক-কিছু ঘটে গেছে। সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছে ব্রজেন ঘোষের বাড়িতে, ওর বারান্দায়। সাগ্নিক সে-সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি। এমনকি শিউলী গাঁয়ে ফিরে সেদিনও জানতে পারেনি, জেনেছিল তার পরের দিন সকালে, টেস্ট-রিলিফের ওই কাঁচারাস্তায় দাঁড়িয়ে।

একটু সকাল-সকাল বিছানা ছেড়ে ওঠে সাগ্নিক। তখনো ভালো করে সবার ঘুম ভাঙেনি। টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় ঘুরে-ঘুরে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেজে চলেছে সে। না, ভোরের হাওয়া-খাওয়া তার আসল উদ্দেশ্য নয়। হঠাৎ যদি সাঁওতাল পাড়ার কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, এই প্রত্যাশা নিয়েই সে ঘুরছিল। মাঝে-মাঝে ভোরবেলায় এমনিভাবে ওদের সঙ্গে দেখা হয় তার। প্রত্যাশা-মতো আজও তেমনি দেখা হয়ে গেল।

সাগ্নিক দূর থেকেই ওদের দেখতে পায়। ওরা পাড়া থেকে বেরিয়ে শিরীষ মোড়ের দিকেই আসছে। আজ ওদের সাজগোজ দেখে সাগ্নিক একটু অবাক হয়। ওরা তিনজন—হামরু, মাতাল আর ছোটকটাই।

পরনে সবার খাটো-ধুতি, গায়ে রঙিন জামা। হামরুর কাঁধে একখানা গামছা, তার এক মাথায় পুঁটলি বাঁধা, সেটি ঝুলছে হামরুর বুকের ওপর। ওরা আরো কাছাকাছি এলে সাগ্নিকই প্রথম কথা বলল, এত সকালে কোথায় চলেছিস তোরা ?

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

সাগ্নিকের প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে হামরু বলল, তুই কোখন ফিরছু মাষ্টরবাবু ?

কাল রাতে। যাচ্ছিস কোথায় বললি না তো ?

হামরু ইতস্তত করে। মাতাল বলে, গিরা লিয়ে, গিরা পাঠাতে !

কিসের গিরা ?

তুলসীয়ার ভাড়ানের। ইতস্ততা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে হামরু।

ভাড়ান কবে ?

শুক্কুর হিলোক, চব্বিশ তারিক।

সাগ্নিক অবাক হ'ল। এত তাড়াতাড়ি ! কই সেদিন তো হামরু কোনো তারিখ বা বারের উল্লেখ করেনি। ওরা এত তাড়াতাড়ি ভাড়ানের তারিখ স্থির করল কেন ? এসব কথা ভাবলেও সাগ্নিক মুখে সেসব বলল না, বলল অন্য কথা, তা কতো লোককে গিরা দিচ্ছিস ?

হামরু বলল, দু'শো-আড়াইশো হবে !

গিরা মানে নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণের এক স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে ওদের। এক বিঘত পরিমাণ এক-একটা লালসুতো, তার মাঝখানে এক-একটা গিঁট। যাকে নিমন্ত্রণ করা হবে তার বাড়িতে ওই লালসুতো একটা রেখে আসতে হবে, মুখে অবশ্যই নিমন্ত্রণের বিষয়াদি বলতে হবে। নিমন্ত্রণের ক্ষেত্রে ওই গিঁট দেওয়া লালসুতো এত গুরুত্বপূর্ণ যে ওটা না-দিয়ে মুখে হাজার বার হাজার কথা বললেও নিমন্ত্রণ ধরে না ওরা।

সাগ্নিক বলল, টাকা-পয়সা কেমন খরচ হবে ভাবছিস ?

হামরু জবাব দিল, পাঁচশো টাকা হয়ে মরবে !

পাঁচশো টাকা ! এত টাকা পেলি কোথায় ?

হামরু কোনো কথা বলতে পারে না, সে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাগ্নিক ধমক দেয়, কি, কথা বলছিস না কেন?

হামরু এবারও কিছু বলতে পারে না। মাতাল বলল, দমনা গরু বিকিয়ে দিছে মাষ্টরবাবু!

গরু বিক্রি করে দিয়েছে! সাগ্নিক যেন ধাক্কা খায়। শেষপর্যন্ত হামরু সেদিন যা বলেছিল দমন তাই করে ফেলল! নিজেকে খানিকটা অপরাধী মনে হ'ল তার। হামরুকে কথা দেওয়া সত্ত্বেও দমনের সঙ্গে সে দেখা করতে পারেনি, তাকে কিছু বলতে পারেনি, এই ভাবনাই তাকে আহত করল, নিজেকে দোষী ভাবল সে। কিন্তু তারই বা কি দোষ? সে-কি জানত যে ওরা এত তাড়াতাড়ি ভাড়ান করবে? তা যদি সে জানতে পারত, হামরু যদি সেদিন বলত তাহলে না-হয় সাগ্নিক উলুবেড়িয়াতে যাওয়া পিছিয়ে দিত। সাগ্নিক বুঝতে পারছে, তখন হামরুও তারিখ সম্পর্কে কিছু জানত না, সেদিন রাত্রের মিটিংয়েই তাহলে দিনস্থির হয়েছে মনে হয়। যাহোক এসব ভাবনা মুলতুবি রেখে সাগ্নিক আগে ওদের গরু-বিক্রির ব্যাপারটার খোঁজ নিতে চায়।

এর পর সাগ্নিক প্রশ্ন করে যায় এবং হামরু, মাতাল আর ছোট-কটাই জবাব দেয়। এই প্রশ্নোত্তরের শেষে সাগ্নিক সবকিছু স্পষ্টই বুঝতে পারে। দমনের চারটি গরুই ওরা একসঙ্গে ব্রজেন ঘোষের কাছে বিক্রি করেছে মাত্র পাঁচশো টাকার বিনিময়ে। অথচ হাটে গেলে বা অন্য কোনো খদ্দের পেলে গরু চারটির দাম হ'ত কম করেও বারোশো টাকা, পনেরোশোও হতে পারত। কিন্তু অন্য কোনো খদ্দের ওরা পায়নি। ট্যাংরার হাট বসে সপ্তাহে একদিন, রবিবারে, তারও এখনো দেরি আছে। তার আগে, শুক্রবারেই ভাড়ান করবে বলে দমন স্থির করেছে। এদিকে একমাত্র খদ্দের ব্রজেন ঘোষ। তিনি ওদের পাঁচশো টাকা দিতে পারেন তবে চারটে গরু একসঙ্গে পেলে, নয়তো তিনি গরু কিনবেন না। দমন শেষপর্যন্ত ওই পাঁচশো টাকা নিয়েই গরু চারটি ব্রজেন ঘোষের

কাছে বিক্রি করেছে। হামরু-পুরণদের কোনো কথাই দমন শোনেনি।

সব শুনে সাগ্নিক আহত হ'ল, বেদনা বোধ করল। ওদের কিছু বলবার ক্ষমতাই যেন তার থাকল না। সে পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর যেন তার চেতনা ফিরে আসছে। সাগ্নিক আস্তে-আস্তে চিন্তা করার ক্ষমতা ফিরে পাচ্ছে। সে প্রথমে ভাবল ওদের কথা, ওই হামরু-দমনদের কথা। কী ধাতু দিয়ে যে ওদের সৃষ্টি করেছেন ওদের স্রষ্টা সাগ্নিক তা বুঝতে পারে না। আর বুঝতে পারে না বলেই মাঝে-মাঝেই সে অসহায় বোধ করে, আহত হয়, যন্ত্রণা ভোগ করে। প্রায়ই এটা হয়।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যে আরো গভীর। সাগ্নিক বুঝতে পারছে, দমনের ধ্বংসের বাজনা বেজে উঠেছে। অথচ এই ধ্বংস সে দেখতে চায় না। সে কি করবে, দমনকে বাঁচাবার কোনো শক্তিই যে তার নেই। সাগ্নিক বুকে যন্ত্রণা নিয়ে ভাবে, ওরা কেন ওদের ধ্বংস বুঝতে পারে না।

আর-এক খেলোয়াড় ওই ব্রজেন ঘোষ! দমনের নির্বোধ বায়না, ওই শুক্রবারেই ভাড়ান করতে হবে। তার আগে ট্যাংরার হাট ছিল না। ব্রজেন ঘোষ ছাড়া আর কোনো খদ্দের ছিল না। ব্রজেন ঘোষ পাঁচশো টাকা দেবেন তবে চারটে গরুই তাঁর চাই। ওদিকে আবার সাগ্নিকের মায়ের চিঠিটা সময় বুঝে দেরি করে তার হাতে দেওয়া। এসবের মধ্যে কোথায় যেন একটা চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে সাগ্নিক। কিন্তু একা সে কী করবে! ব্রজেন ঘোষের বিচারের অধিকার আর ক্ষমতা তার কোথায়?

ওদের কিছু না-বলেই সে বাড়ি চলে এল। মুখ ধুয়ে চা খেল। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ একটা বলল না। এইভাবে কাটল সকালটা। তারপর স্নান-আহার শেষ করে ইস্কুলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

সাগ্নিক পৌঁছোবার আরো কিছুক্ষণ পরে এল পুতুল, তারপর যুগল। ওরা সাগ্নিকের মায়ের খোঁজ নিল, কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা

জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হ'ল কেন জানতে চাইল। সাগ্নিক গম্ভীর-ভাবেই ওদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল, ওদের সব বুঝিয়ে বলল।

এবার উঠল শিউলী গাঁয়ের কথা। দমনের গরু বিক্রির কথা, অকাল-মৃত্যুর শ্রাদ্ধে দমনের খরচপত্রের কথা, ব্রজেন ঘোষের কথা। সব শুনে পুতুল অবাক, ব্যথিত। এই তো কয়েকদিন আগে সাগ্নিকদা তার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আদিবাসীদের ব্যাপারে নির্বিকার থাকবে। এটা কি নির্বিকার থাকা হ'ল? পুতুল সে-কথাটা বলেও ফেলল।

সাগ্নিক বলল, ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারছ না পুতুল। অকাল-মৃত্যুর শ্রাদ্ধে এত আড়ম্বর হবে কেন? বারোশো টাকার গরু পাঁচশো টাকায় বিক্রি করতে হবে কেন?

যাকগে, আপনি এখন কি করতে চান?

এই আড়ম্বর থেকে দমনকে ফেরানো দরকার, গরুগুলো এখনো ব্রজেন ঘোষের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনা দরকার।

পুতুল বলল, ব্রজেন ঘোষ ফিরিয়ে দেবেন কেন?

যুগল বলে, তাছাড়া দেখুন গে উয়ারা হয়তো সৌ টাকা অ্যার ভিত্‌রে খরচ করে ফেলছে কিনা।

তিনজনের মধ্যে আরো অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। অবশেষে ওরা স্থির করল টিফিনে তিনজনেই একসঙ্গে দমনের বাড়িতে যাবে। তিনজনে মিলে সব-কিছু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। অবস্থা অনুকূল মনে হলে আড়ম্বর বন্ধ করতে বলা হবে, অকালমৃত্যুর শ্রাদ্ধ স্বল্প খরচে কোনো-রকমে সারতে বলা হবে, গরু-চারটে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হবে। অবস্থা প্রতিকূল দেখলে কিছু না-বলেই ফিরে আসবে ওরা।

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। ইয়াকুব মিঞার পুকুর-পাড়ে পৌঁছতেই যুগল বলল, পুতুলদিদি বুঝতে পারছেন?

কি? পুতুল এ-ধার ও-ধার তাকাতে তাকাতে বলল।

কুছু গন্ধ পাচ্ছেননি?

কি?

নাকে·লাগেঠেনি কুছু দাদা, আপনার?

পুতুল ঘন-ঘন নিশ্বাস টানতে থাকে। সাগ্নিকও। অবশেষে একসময় পুতুলের মনে হয় একটা-কিছু গন্ধ যেন নাকে এসে লাগছে। কিন্তু গন্ধটা যে কিসের তা সে ঠিক বুঝতে পারে না।

যুগল হাসতে হাসতে বলছে, কুছু পোড়া গন্ধ লাগেঠেনি?

তা তো পাচ্ছি, কিন্তু—

ভাত রঁাধে শুকাতে দিলে এমনি গন্ধ বারয়নি দিদি?

সাগ্নিক প্রশ্ন করে, ওরা কি হাড়িয়া বসাচ্ছে যুগল?

হেঁ দাদা।

আজ হাড়িয়া বসালে শুক্কুরবারে পাকবে যুগল?

শুক্কুরবারের গুলান আগেই বসছে।

তবে আজ আবার কেন?

যুগল হাসতে-হাসতে বলল, মোদের জাতটারে আপনি অখনো সবটা জানছেননি দাদা। হাড়িয়া খাওয়ার বিপারটা একবার শুরু হলে আর থামতেই চায়নি। শুক্কুরবার শুরু হ'লে কবে থামে সৌটা দেখবেন।

কথা বলতে বলতে ওরা দমনের উঠানে পৌঁছে যায়।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

এই সেই তুলসীর বাড়ি, তুলসীর ঘর, যার প্রতিটি কোণ একদিন তুলসীর মতোই ঝকঝক তকতক করত। তুলসী সহস্র কাজের মাঝেও প্রতিদিন তার ঘর-বারান্দা-উঠোন আর তেঁতুলতলা ঝাড়পোছ করত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত, নিকিয়ে পুছিয়ে যেন ছবি করে রাখত। সেই বাড়ির আজ একি অবস্থা! ঘরের দেওয়াল থেকে বালিমাটি ঝুপঝুপ করে ঝরে পড়ছে, বারান্দায় এক বিঘৎ পরিমাণ ধুলো জমে আছে, উঠোনটা ধুলোবালি আর ডালপালার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। তুলসীর সেই বাড়ি অথচ তার আজকের রূপ কত ভিন্ন। একটা বিরাট শূন্যতা যেন বাড়িটাকে দখল করে নিয়েছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল কেবল বাতাসী আর দমনের ছোট ছেলেটি।

ওদের দেখেই বাতাসী ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। পরক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পূরণ আর দমন। পূরণের হাতে একটা চাটাই। উঠোনের এক কোণে ছায়া দেখে পূরণ চাটাই পেতে দিয়ে ওদের বসতে বলে। ওরা কিন্তু বসে না।

সাগ্নিক আর পুতুল দমনের ক্ষয়ে-যাওয়া কৃশ শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যুগল পূরণের সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলছে ওদের ভাষায়। পুতুল তার একবর্ণও বুঝতে পারছে না। সাগ্নিক অবশ্যই কিছু কিছু বুঝতে পারছে এবং জনান্তিকে পুতুলকেও বোঝাবার চেষ্টা করছে।

যুগল একে-একে সব প্রসঙ্গই উত্থাপন করছে। কত লোককে গিরা পাঠানো হয়েছে, কি কি খাওয়ানো হবে, শ্রাদ্ধের কাজে ঘুঘুরের জেল দেওয়া হচ্ছে কেন, এ-পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়ে গেছে, আর কত খরচ হবে, সব প্রশ্নই তুলছে যুগল। সব প্রশ্নের উত্তরও দিয়ে যাচ্ছে পূরণ। পূরণ যথারীতি সব-কিছুর জন্যই দমনের ইচ্ছা আর জেদকে দায়ী করে যাচ্ছে। আর পূরণের বক্তব্য থেকে সাগ্নিক, যুগল, এমনকি পুতুলও বুঝতে পারছে, ইতিমধ্যে ওরা যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে আর ওদের ফেরানো যায় না, তাতে লাভ না-হয়ে বরং লোকসানই হবে। সুতরাং সে-সম্পর্কে ওরা আর একটি কথাও বলতে পারল না, না যুগল, না সাগ্নিক।

এই সময় হাড়িয়ার আয়োজন দেখবার জন্য পূরণ আবার যুগলকে ঘরের মধ্যে যেতে আমন্ত্রণ জানাল। যুগল আবার সাগ্নিক আর পুতুলকে যেতে বলল। হাড়িয়ার আয়োজন দেখতে যেতে সাগ্নিকের আপত্তি ছিল। কিন্তু পুতুল এসব কখনো দেখেনি, তার আগ্রহেই সাগ্নিকও রাজী। সবাই মিলে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল ওরা, সাগ্নিক আর পুতুল তো বটেই, এমন-কি যুগলও। হাড়িয়া তৈরির বিপুল আয়োজন দেখে ওরা হতবাক। যেন রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি। চারদিকে দেওয়ালের গা-ঘেঁষে খড়ের বিড়ের ওপর অসংখ্য হাঁড়ি বসানো। তার মধ্যে কয়েকটা আবার নতুন, তাতে মালা-ঘুন্‌সি-সিঁদুর পরানো। দুটো হাঁড়ির সামনে খেজুরের পাতার চাটাই

পাতা, একটা চাটাইয়ে গরম ভাত ঢেলে শুকুতে দেওয়া হয়েছে। ভাতগুলোতে বাখর মাখাচ্ছে হামরুর মা। বাখরের পরিমাণ পুরণই ঠিক করে দিয়েছে। হামরুর মা বাখর মাখাচ্ছে আর আপন মনে গজরাতে-গজরাতে কিসব যেন বলে যাচ্ছে।

হাড়িয়া-তৈরির কলা-কৌশল সম্পর্কে সাগ্নিক অবহিত থাকলেও পুতুল এ-সম্পর্কে জানত না কিছুই। সে চোখে বিস্ময় নিয়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। সাগ্নিকও তার পাশে দাঁড়িয়ে। আর যুগল পূরণের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। পূরণ হাঁড়িগুলো গুনে-গুনে দেখাচ্ছিল, আর কোন্‌টা কবে পাকবে সে-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত দিচ্ছিল।

একটু দূরে বসে একটানা গজগজ করে চলছিল হামরুর মা। হাড়িয়ার ওই বিপুল পরিমাণের বিরুদ্ধে আর অযথা এত খরচের বিরুদ্ধেই হামরুর মা-র যত অভিযোগ। সাগ্নিক হামরুর মায়ের বক্তব্য পুতুলকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

এই সময় দমন ছুটে এসে হামরুর মায়ের সামনে দাঁড়ায়, তার হাতে একটা হেলে-লাঠি। ধমক দিয়ে সে হামরুর মাকে থামতে বলল। কিন্তু বুড়ি থামে না, আপন মনে বকছে তো বকছেই। আর ঠিক সেই সময়েই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটে গেল। সাগ্নিক বা পুতুল কেউই এ-ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। দমন তার হাতের হেলে লাঠিটি দিয়ে হামরুর মাকে মারতে শুরু করল। বুড়ি যত বকে, সে ততো মারে। শেষে হামরুর মায়ের আর্ত চিৎকারে সবাই ওদের কাছে এগিয়ে গেল। পূরণ দমনের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিলো। দমন তখনো চোখ লাল করে হামরুর মাকে ধমকে চলেছে।

এ-ঘটনায় সবচেয়ে বিস্মিত হ'ল পুতুল; শুধু বিস্মিত নয়, যেন ভয় পেল।

ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকলো হামরু। সেই পোশাকেই সে ফিরেছে গিরা পাঠিয়ে এখনই ফিরল মনে হয়। হামরুকে দেখে পুতুল, এমনকি সাগ্নিকও, একটু সন্ত্রস্ত হয়—ভাবে, দমন ওর মাকে মেরেছে একথা

শুনলেই হামরু রুদ্রমূর্তিতে জ্বলে উঠবে, শুরু হবে দুই বন্ধুতে মারামারি। তার ফলে দমন হারাবে তার সত্যিকারের বন্ধু আর শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহায্য এবং সহযোগিতা। সাগ্নিক সম্ভাব্য সংঘর্ষের ছবি কল্পনা করে হামরুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু, আশ্চর্য, ওরা দেখল হামরু সব কথা শুনে দমনকে কিচ্ছুটি না-বলে ওর মাকেই উল্টে বকাঝকা শুরু করল। মায় জিউ হয়ে এসব বৈষয়িক ব্যাপারে সে নাক গলাল কেন, হামরু তার মাকে এই যুক্তিতেই ধমকাতে লাগল। পূরণও সমর্থন করল ওকে। দমনের উৎসাহ আর গলার জোরও যেন তখন দ্বিগুণ হ'ল।

অবাক হয়ে সব দেখল সাগ্নিক আর পুতুল, সব শুনল। পুতুল বোধহয় একটু আহতও হয়েছে, সাগ্নিক পুতুলকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে আসে। ওদের পেছনে আসে যুগলও। বাইরে এসে সে-ই প্রথম কথা বলল, টিফিন শেষ হয়েছে দাদা।

পুতুল ব্যস্ত হয়ে বলল, তাড়াতাড়ি চলো যুগল।

যুগল ইতস্তত করে বলে, উয়াদের কুছু বলবেন দাদা?

পুতুল বাধা দিয়ে বলে, না, কিছু বলার নেই, তুমি চলো; চলুন সাগ্নিকদা।

যুগল আর পুতুল পা বাড়াল। এবং শেষে সাগ্নিকও।

ওরা ইয়াকুব মিঞার পুকুরপাড়ে ওঠার পর পেছন থেকে 'মাষ্টরবাবু-মাষ্টরবাবু' বলে ছুটে আসে হামরু। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি রে? সাগ্নিক প্রশ্ন করে।

ইস্কুলের সময় হয়ে গেছেরে হামরু, যা বলবি তাড়াতাড়ি বল্। ব্যস্তভাবে বলল পুতুল।

দমনারে কুছু বললি মাষ্টরবাবু?

না। কি বলব বল্। সাগ্নিকের কণ্ঠস্বর ব্যথিত শোনাল।

উটারে কেমনি যে বাঁচে রাখি। হামরুর কণ্ঠে অসহায়তার যন্ত্রণা যেন।

পুতুল বলল, তোরা একটা কাজ কর, ওর আবার একটা বিয়ে দিয়ে দে।

সাগ্নিক বলল, তাছাড়া বোধহয় কোনো উপায় নেই। তুলসীর কথা ওকে ভুলিয়ে দিতে হবে, তবেই যদি ও স্বাভাবিক হয়।

॥ আ ট ॥

নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে তুলসীর ভাডান শেষ হয়েছে। হামরুর হিসাব মতো প্রায় তিনশো লোক খেয়েছিল। সবাই তৃপ্তি সহকারে খেযেছিল, খুশি হয়ে সবাই তুলসীর আত্মার শান্তি কামনা করেছিল কিনা তা অবশ্য জানে না হামরু।

দাকা আর উতু, ভাত আর তরকারী কেমন হয়েছিল সেটা ওদের কাছে কোনো বিচার্য-বিষয়ই নয়, হাড়িয়া আর জেল দিয়েই ওরা ভোজের কৌলিণ্য বিচার করে। দমন সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। ঘুঘুরের জেল সাধারণত ভাড়ানে কেউ দেয় না। অথচ দমন তাই সবাইকে খাইয়েছে। আর হাড়িয়া? সেটা যেমন উৎকৃষ্ট হয়েছিল, তেমনি সবাইকে যাচাই করে করে খাওয়ানো হয়েছে। অতএব নিমন্ত্রিতদের খুশি না-হওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

দমনের হোংহারবাবা আর হানহারগো, শ্বশুর-শাশুডিও এসেছিলেন। আদরের কন্যার অকালপ্রয়াণে তাঁরাও আঘাত পেয়েছিলেন। পারগানাবাবুর আঘাতটাই ছিল খুবসম্ভব বেশি। ওঁরা আসাতে দমন খুশি হয়েছিল। কিন্তু হায়রে দমনের ভাগ্য! শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে সে কোনো সান্ত্বনা তো পেলই না, বরং ওর হানহারগো যাওয়ার সময়ে এমন একটি কাজ করল যাতে তার দুঃখ-জ্বালা আরো বেড়ে গেল শতগুণ।

তুলসীর মা ফিরে যাওয়ার সময়ে তুলসীর চাঁদির গয়নাগুলো ফেরত

চেয়ে বসল। গয়নাগুলো তো দমনের দেওয়া নয়, দিয়েছিল তুলসীর বাবা-মা, এই যুক্তিতেই ফেরত চাওয়া। দমন ইচ্ছে করলে কোনো-না-কোনো অজুহাতে ওগুলো ফিরিয়ে না-ও দিতে পারত। কিন্তু দমন তা করেনি। যার গয়না সেই যখন ওকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, কি হবে তার গয়না দিয়ে? ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে গয়নাগুলো তুলে দিল তুলসীর মায়ের হাতে।

দমনের বাড়িতে ভাড়ানের ভোজের গৌরবকথা কয়েকদিন সবার মুখে মুখে। তবে তা নিয়ে দীর্ঘদিন মশগুল থাকার অবকাশ ওদের ছিল না। চড়ক-পরব এসে গেছে। পরব নিয়ে সবাই এখন মত্ত।

এবার ওদের চড়কে ঘুরল ট্যাংরার ছোট ভাই মংলা। মংলাকে নিয়েও ওরা সেই একইভাবে মেতে উঠল যেমন করে একদিন ওরা মেতে উঠেছিল দমনকে নিয়ে, যেমন করে ওরা মেতে ওঠে প্রতিবছর এক-এক-জনকে নিয়ে।

দমন ছিল এবার এ-সবের বাইরে, চড়কের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। এমনকি মেলাটাও সে দেখতে যায়নি। চড়কের সব কোলাহল থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সে। দমন যে এমনটি করবে সেটা আর-কেউ না-জানলেও হামরু জানত। তাই সে দমনকে বার করবার জন্য সবরকমে চেষ্টা করল। কিন্তু সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ। দমনকে কিছুতেই বাইরে আনা গেল না। অগত্যা প্রাণের বন্ধুকে বাদ দিয়েই চড়কের সঙ্গে একাত্ম হ'ল হামরু, মত্ত হ'ল উৎসবে।

এ-সময়ে হামরু বা ওদের কারো সঙ্গেই সাগ্নিকের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সাগ্নিক নিজেও অবশ্য এখন একটা অন্য কাজে বিশেষভাবে ব্যস্ত। ব্রজেন ঘোষের বড়ছেলে রমেনের ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। আর মাত্র সপ্তাহুয়েক বাকি। রমেনকে নিয়ে সব সময়ে সে ব্যস্ত।

সাঁওতালপাড়ার পরব একদিন শেষ হ'ল। ওরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হামরুও আবার বন্ধুকে নিয়ে চিন্তিত

হয়। দমনকে কিভাবে পুনরায় কাজেকর্মে সংসারধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, হামরু নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই উপায় অন্বেষণ করে চলল। ভাবনার অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে হামরুও একদিন উপলব্ধি করল, একটা বাপলার ব্যবস্থাই করা দরকার। ওই পথেই হয়তো ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। হাজার ভেবেও সে অন্য কোনো পথ খুঁজে পায় না।

কিন্তু বাপলা বললেই তো আর বাপলা হয় না। অনেক বাধা, অনেক অন্তরায়। দমনের সঙ্গে বাপলায় কোনো কুড়ির আপা-আয়ো কি আজ সহজে সম্মত হবে? আজ কি ওকে কেউ যোগ্য জাঁবায় রূপে স্বীকার করবে? তার বয়েস হয়ে গেছে, দুটো কোড়ার আপা হয়েছে সে। দমনের আপা নেই, আয়ো নেই। তার একটা ডাংরা নেই, দামকোমও নেই। ঘুঙুর-টুঙুর কিচ্ছু নেই। একটা ধানও নেই ঘরে। আছে শুধু মাঠের ওই বিঘে-পাঁচেক বিল।

দমন আজ সাঙ্গা-জাঁরায, দোজবর। এমন পাত্রে কে আর মেয়ে সঁপে দেবে? আর যদি কেউ রাজী হয়ও, তাতেও কি বিয়েটা সহজে হয়ে যাবে? সাঙ্গা-জাঁবায় বলে ওকে গনং দিতে হবে অনেক বেশি। সব খরচই হবে ঢের ঢের বেশি। এত খরচ করা কি ওদের পক্ষে সম্ভব? টাকা কোথায়? দমন তো আজ সহায়-সম্বলহীন। হামরুর অবস্থাও এমন নয় যে টাকা-পয়সা দিয়ে সে ওকে সাহায্য করতে পারে।

সাঙ্গা হ'লে অবশ্য অন্য কথা। সাঙ্গা হলে কোনো খরচই ছিল না বলা চলে। কিন্তু দমন তো তাতে রাজী হবে না। হামরু ভালো করেই জানে—বিধবা, হেরেল-পরিত্যক্তা বা যে কোনো কারণে হেরেলের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কোনো মায়জিউকে সাঙ্গা করে ঘরে আনতে দমন কিছুতেই রাজী হবে না। বিয়েতেই তাকে সহজে রাজী করানো যাবে না, অনেক কাঠখড় হামরুকে পোড়াতে হবে সেজন্য। হামরু জানে বাপলাতে শেষ পর্যন্ত দমন রাজী হলেও হতে পারে, কিন্তু সাঙ্গাতে সে রাজী হবেই না। অতএব সাঙ্গা নয়, বাপলার কথা মনে রেখেই হামরুকে অগ্রসর হতে হবে। হামরু সেই পথেই ভেবে চলে, মাঝে-মধ্যে সুবিধামতো কুড়িরও

খোঁজ নিয়ে চলল।

চড়ক শেষ হওয়ার পর এসব কথা একদিন হামরুই বলেছিল সাগ্নিককে। সেদিন হামরু টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তা ধরে শিউলী মোড় থেকে ওদের পাড়ার দিকে ফিরছিল, দুপুরবেলায়। সাগ্নিক তখন ইস্কুলে ছিল। সে হামরুকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, আর তখনই এসব কথা সাগ্নিককে বলেছিল হামরু।

হামরু চলে যাওয়ার পর পুতুল অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিল।

সাগ্নিক জনান্তিকে বলে, এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় শুনেছি।

পুতুলের গাম্ভীর্য ভাঙল না, তবুও বলল, এবার কিন্তু সত্যি সত্যি সাবধান হওয়ার সময় এসেছে।

সাগ্নিকও আগের ভঙ্গিমা বজায় রেখে বলল, খুবসম্ভব কথাটা আমারই উদ্দেশে ?

অবশ্যই।

কারণটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো ?

হামরুর কথায় মনে হচ্ছে এবার দমনের বিয়ে। সেটা তো ভালো খবর। দমন যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তাতে খুশি হবো আমি।

আমিও।

তাহলে ?

ওরা টাকা কোথায় পাবে ?

হ্যাঁ, টাকাটা সত্যি ওদের কাছে বড় সমস্যা, পুতুল।

সাগ্নিকদা। পুতুলের কণ্ঠে দৃঢ়তা ও স্নিগ্ধতা।

পুতুল!

আমার কি মনে হয় জানেন ?

কি ?

টাকার জন্যে ওদের আবার সেই ব্রজেন ঘোষের কাছেই যেতে হবে, এবং শেষ সম্বল ওই জমিটুকুর দলিল নিয়েই।

পুতুল! সাগ্নিক যেন কেঁপে উঠল।

দু'-এক মিনিট লাগল সাগ্নিকের স্বাভাবিক হতে। পুতুলও এইসময় একটা কথাও বলল না, সাগ্নিককে স্বাভাবিক হতে সময় দিল। তারপর একসময়ে সাগ্নিকের মুখের দিকে তাকিয়ে পুতুল বলল, আমায় কথা দিন সাগ্নিকদা—

কি!

নিজেকে আর আপনি অপমানিত করবেন না।

সাগ্নিক তখনো নির্বাক।

পুতুল বলে চলল, এবার আমাকে সত্যি সত্যি কথা দিন আর আপনি ওইসবের মধ্যে যাবেন না, থাকবেন না।

তোমার কথা মেনে চলতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব, পুতুল। গম্ভীর এবং চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে পুতুলকে কথা দেয় সাগ্নিক।

এর পর কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন। এর মধ্যে সাগ্নিক যেমন ওদের কোনো খবর নেয়নি, তেমনি কোনো খবর এসে ওর কাছে পৌছয়ও নি। সে একমনে এখন দিনরাত কেবল রমেনকে পড়িয়ে চলেছে। তবে সপ্তাখানেক পরে কিন্তু একটা খবর ওর কাছে পৌছে গেল।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও সাগ্নিক সন্ধ্যাবেলায় টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় ঘুরে-ঘুরে স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে লাগাচ্ছিল। মাতাল তখন কোথা থে:ক যেন বাড়ি ফিরছিল। সাগ্নিক তাকে ডাকেনি, তবুও মাষ্টর-বাবুকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। অগত্যা সাগ্নিককে কথা বলতেই হয়, কি রে, কি খবর? কোত্থেকে আসছিস?

বাখরচক থাকতে।

বাখরচক কোথায়?

ইখান থাকতে পাঁচমাইল দখিনে।

সেখানে গিয়েছিলি কেন?

মাতাল তখন ব্যাপারটা খুলেই বলল। ওরা বাখরচকে গিয়েছিল

কাল, মেয়ে দেখতে। হামরুরা কালই ফিরে এসেছে। মাতাল কুটুমঘর ঘুরে আজ ফিরছে।

কার জন্য মেয়ে দেখতে গিয়েছিলি ?

দমনার তরে।

সাগ্নিক মুখে হাসি নিয়ে বলল, ভালো খবর ! তা মেয়ে দেখে তোদের পছন্দ হয়েছে তো ?

মাতালের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, ম্লানকণ্ঠে বলে, মোদের পছন্দটা তো বড় কথা লয় মাষ্টরবাবু।

চকিতে সাগ্নিকের মনে পড়ে হামরুর বলা সেদিনের কথাগুলো। সে প্রশ্ন করল, বাখরচক দেখে গেছে ?

না, পরশু এসবে।

পরশু ওরা এসে দেখে যাওয়ার পর ওদের পছন্দ হ'ল কিনা আমাকে একটু জানিয়ে দিয়ে যাস তো মাতাল !

আচ্ছা !

মাতালকে একথা বলার সময় পুতুলের সেদিনের কথাও তার মনে পড়ল। মনে পড়ল পুতুলকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতিটা। ভাবল, আমি তো খবরটাই নিচ্ছি, ওদের ব্যাপারের মধ্যে তো ঢুকছি না।

আরো কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে মাতাল কোনো খবর দিতে আসেনি। সাগ্নিকও নেয়নি।

পুরো একসপ্তাহ পরে একদিন মাতাল এল খবর দিতে।

সময়টা বিকাল না-বলে প্রায়-সন্ধ্যা বলাই ভালো। সাগ্নিক আর ঘোষ-গিন্নী বারান্দায় বসে রমেনের পরীক্ষা, সম্ভাব্য ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করছিল। আর মাত্র তো সাতদিন বাকি রমেনের পরীক্ষার। সে এখন বাড়িতে নেই, গেছে কলেজে, মেদিনীপুরে, অ্যাডমিট কার্ড আনতে। ঘোষগিন্নী ছেলের পরীক্ষার ব্যাপারে এখন দারুণ চিন্তিত। সাগ্নিকের সঙ্গে তিনি ছেলের বিষয়েই কথা বলছিলেন।

এইসময় মাতাল আর ট্যাংরা এসে দাঁড়াল। বারান্দায় একটা চাটাই পাতা ছিল। সাগ্নিক ওদের বসতে বললে ওরা বসল।

মাতালই প্রথম দমনের বিয়ের কথা তোলে। সাগ্নিক, মাতাল আর ট্যাংরার মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়। ঘোষগিন্নী প্রথমে চুপচাপ থাকেন, একটি কথাও না-বলে সব শুনে যান। কিন্তু এ-অবস্থা বেশিক্ষণ চলার কথা নয়, চললও না। আলোচনা যত এগিয়ে চলে ঘোষগিন্নীর ভূমিকাও ততই স্পষ্ট হতে থাকে। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল ও আলোচনায় ঘোষগিন্নী মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। প্রশ্ন যা করবার তিনিই করছেন, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেই মাতাল আর ট্যাংরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সাগ্নিক তখন শুধু শ্রোতা। সাগ্নিকের কিছু বলার বা প্রশ্ন করবার অবকাশই থাকে না।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে আবির্ভাব ঘটল স্বয়ং ব্রজেন ঘোষের। অতএব সাগ্নিকের আর-কিছু করণীয় নেই, সে শুধু মনোযোগী শ্রোতা।

ঘোষ-দম্পতির প্রশ্ন আর ওদের দু'জনের প্রদত্ত উত্তর—এর ফলশ্রুতি স্বরূপ দমনের বিয়ে-সংক্রান্ত বিষয়টা আরও স্পষ্ট হ'ল, এবং অনেক তথ্যই জানা গেল।

সেই বুধবারেই বাখরচক পাত্র দেখতে এসেছিল। রাজকীয় আপ্যায়ন পাওয়া সত্ত্বেও পাত্র দেখে তাদের পছন্দ হ'ল না। হামরু আর রায়বার দু'জনে মিলে তাদের মন গলাবার অনেক চেষ্টা করল। শেষপর্যন্ত বাখরচক জানাল —গনং বেশি দেওয়া হলে, অন্যান্য দেনা-পাওনা দ্বিগুণ করা হলে, আপ্যায়ন আশাতিরিক্ত ভালো হলে এবং পেড়ার সুযোগ-সুবিধা বাখরচককে চিরকাল বেশি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে, তবেই বাখরচক পেড়া বা কুটুম্বি-তার কথা ভেবে দেখতে পারে। এইভাবে আলোচনা এগুতে-এগুতে একসময় সমস্ত কথা পাকাও হয়ে গেল। পাকা মানে শিউলী গাঁ যদি এখন ওই সব দিতে পারে তবেই বিয়ে হবে, অন্যথায় নয়।

গনং বা দেনা-পাওনার ফিরিস্তি এইরকম: পঁচিশ-ত্রিশ টাকার জায়গায় ওদের নগদ দিতে হবে একশো টাকা। একটা ছোট বাছুরের

বদলে দিতে হবে ত্নটি দামকোম যার দাম কম করে ধরলেও চারশো টাকা। ঘুষুর দিতে হবে ত্নটো। সিমইঙ্গা—সিমশাণ্ডি দিতে হবে ছ'টা। সবই স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ। বিশহাত লম্বা বাপলার শাড়িও দিতে হবে দ্বিগুণ, অর্থাৎ চারখানা। কুড়িকে চাঁদির গয়না দিতে হবে হটে-তিতে-মুতে লুতুতে। এসব ছাড়াও পারহাউ, আঙ্গরোম, আরশি, নেকি, ফিতে উরমাল তো আছেই, অন্যান্য প্রসাধন-সামগ্রীও কুড়িকে দিতে হবে। বরযাত্রীদের আপ্যায়ন নিয়েও কথা হয়েছে। বরযাত্রীদের খাবার আর হাড়িয়া নিয়ে যেতে হবে চারভাগের তিনভাগ। স্বাভাবিক বিয়েতে দায়িত্ব আধা-আধি ভাগ হয়। বরযাত্রী যাবে মাত্র পাঁচজন, তার বেশি গেলে সমস্ত খরচই শিউলী গাঁয়ের, বাড়তি খাবার আর হাড়িয়া শিউলী গাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

এতসব সত্ত্বেও বাখরচক শিউলী গাঁয়ের একটা অনুরোধ রেখেছে। শিউলী গাঁ অনুরোধ করেছিল, গরু এবং নগদ টাকাটা বাখরচক কিছুদিন পরে নিলে ভালো হয়। রায়বারের মাধ্যমেই কথা চালাচালি হয়। শেষ-পর্যন্ত ওই অনুরোধ বাখরচক মেনে নিয়েছে। ঠিক হয়েছে ওগুলো দিতে হবে পুষমাসে, চাউড়ীর ত্নু-হপ্তা আগে।

হামরুয়া হিসাব জুড়ে দেখেছে ওই গরু আর নগদ টাকা বাদ দিয়েও এখন লাগবে পাঁচ-সাতশো টাকা। চাঁদির গয়নাতেই তো চলে যাবে কত টাকা। আর পৌষ মাসে যখন গরু আর নগদ টাকা দিতে হবে তখনো ওইরকম টাকাই লাগবে।

এসব গনং বা দেনাপাওনা দিতে পারলে আগামী শনিবারেই বিয়ে হবে। আপাতত তাই ঠিক হয়েছে। আজ সোমবার। আজ ওদের পাড়ায় মিটিং হবে আর-একটু পরে। ওই মিটিংয়ে স্থির হবে বাখরচকের সঙ্গে শিউলী গাঁ সম্বন্ধ করবে কিনা।

প্রায় পুরো একটা ঘন্টা লেগে গেল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওদের বিবরণ শেষ হতে।

সব শুনে ব্রজেন ঘোষ যেন খুশি হলেন, খুশি হয়ে মাতাল আর

ট্যাংরাকে বিড়ি দিলেন, নিজে একটা ধরালেন, ওদের গুলোও ধরিয়ে দিলেন। মিটিনে যাওয়ার সময় হয়েছে বলে মাতাল আর ট্যাংরা উঠে পড়ল।

ঘোষগিন্নি সরব গবেষণা করে চললেন। তাঁর গবেষণার বিষয়—এত টাকা ওরা জোগাড় করতে পারবে কি? তাঁর বিশ্বাস, এত টাকা ওরা জোগাড় করতেও পারবেনি, আর বাখরচকে দমনার বেহাও হবেনি।

সাগ্নিকের প্রতিক্রিয়াটা একটু ভিন্ন। সে ভাবল, শনিবারে কি করে বিয়ে হতে পারে? টাকা কোথায় ওদের? বিয়ে ভেঙে যাক সেটাও যেমন সে চায় না, আবার বাখরচকে বিয়ে করতে গিয়ে দমন শেষ হয়ে যাক সেটাও চায় না সে। ভাবতে-ভাবতে নিজের ঘরে চলে গেল সাগ্নিক।

সন্ধ্যার ধূসরতা নেমে এসেছে। কানার মা হ্যারিকেন আর ল্যাম্প-গুলো জ্বালিয়ে নির্দিষ্ট সব জায়গায় সেগুলোকে রেখে দিয়েছে, একটা রেখেছে সাগ্নিকের ঘরে, বারান্দায় দিয়েছে একটা। ঘোষগিন্নী উঠে সাঁঝ দেখাচ্ছেন না দেখে কানার মা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে সাঁঝও দেখিয়ে দিয়েছে।

ব্রজেন ঘোষ, ঘোষগিন্নী সাগ্নিক, তিনজনেই যেন এখন ভাবনার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ব্রজেন ঘোষ বারান্দায় তাঁর নির্দিষ্ট ইজিচেয়ারে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঘোষগিন্নীর ব্যাপারটা আবার একটু আলাদা, উনি ভাবনার চেয়ে সরব-গবেষণায় একটু উৎসাহী। আর সাগ্নিক ভাবছে তার নিজের ঘরে বসে। পারুল আর নরেনকে এখন পড়াতে হচ্ছে না। রমেনের পরীক্ষা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলবে। অতএব ঘরে এখন সে একা। রমেন বাড়ি নেই বলে তার অবসর। ভাববার প্রচুর অবকাশ। ব্রজেন ঘোষ, ঘোষগিন্নী এবং সাগ্নিক তিনজনেরই ভাবনার বিষয়বস্তু এক। অর্থাৎ দমনের সম্ভাব্য বাপলা বা বিয়ে।

ব্রজেন ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন, স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, সাঁওতালদের বেহা হ'ল কি হ'লনি, অটা লিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেনে? হঠাৎ কথার সুর পাল্টে ব্রজেন ঘোষ আবার বললেন, যাকগে, অইসব তুমি ভাবতে

যেয়োনি। তার চেয়ে দেখ রমু আসেঠে কিনা! অ্যাডমিট দিয়ে আসতে অর অ্যাতো দেরি হয়ঠে কেনে?

ঘোষগিন্নীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা সবারই জানা। যখন যে-চিন্তা মাথায় ঢোকে তখন সেটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এতক্ষণ দমনের ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে-ভেবে কাহিল হয়ে পড়ছিলেন। স্বামীর মুখে ছেলের কথা শুনে তাঁর ভাবনা এখন দমনকে ছেড়ে রমেনকে নিয়ে। উনি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, ওমা, তাই তো, রাত হয়ে গেল, রমু অখনো ফিরছেনি কেনে?

ব্রজেন ঘোষ স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, তুমি বসে বসে দেখ রমু কখন আসে, মুই একটুকু আসিঠি।

কাই যাওঠো?

সাঁওতাল পাড়াকে, মজুর খুঁজবার তরে।

ব্রজেন ঘোষ সাঁওতাল পাড়ার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন, আর ঘোষগিন্নি ছেলের ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন, এই প্রশ্ন নিয়ে সরব-ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

ঘরের মধ্যে বসে সাগ্নিকও ভাবছে, তবে রমেনের কথা নয়। সে ভেবে চলেছে দমনের বিয়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে। ভাবছে পুতুলের কথা, পুতুল সেদিন ওকে যেসব কথা বলেছিল সেসব কথা। পুতুলকে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে-বিষয়ে। কিন্তু সে কি করবে? সে যে ওদের কথা না-ভেবে পারে না। যেমন এই মুহূর্তের কথাই ধরা যাক। এই মুহূর্তে হাজার চেষ্টা করলেও সে ওদের কথা না-ভেবে পারছে না। পারবেও না।

সাগ্নিকের স্পষ্ট মনে আছে, দমনের বিয়ের কথা সে-ই প্রথম বলেছিল। বলেছিল অবশ্যই দমনকে জীবনধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য। কিন্তু বাখরচকের এই মেয়ের সঙ্গে যদি দমনের বিয়ে হয়, সে কি জীবনকে ফিরে পাবে? সাগ্নিক বিশ্বাস করতে পারে না। তাই পুতুলের মমতাসিক্ত সব উপদেশ আর তার নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখেও সে ভাবল, হামরুর সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার, কথা

বলা দরকার।

এদিকে বারান্দায়-বসে-থাকা ঘোষগিন্নীর সরব ভাবনাও উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে। কিন্তু একা-একা সরব ভাবনা কতক্ষণ চলে। অবশেষে উনি সাগ্নিককে ডেকে বললেন, মাষ্টার, ও মাষ্টার, একটুকু বাইরে আস-না গো।

সাগ্নিক বাইরে এসে দ্যাখে ঘোষগিন্নী স্বামীর ইজিচেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। সাগ্নিককে দেখে ঘোষগিন্নী মাথা তুলে বললেন, রমু অখনো আসেঠেনি কেনে মাষ্টার?

সাগ্নিক একখানা চেয়ারে বসে বলল, অনেকদিন পরে কলেজে গেছে, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, হয়তো ঘুরছে, সিনেমা-টিনেমায়ও ঢুকতে পারে।

অতে অ্যাত রাত হয়ে পড়বে কেনে?

এসে যাবে।

কাই আসেঠে?

এক্ষুনি এসে পড়বে। আপনি অতো ব্যস্ত হবেন না।

ঠিক সেই সময়ে রমেন এসে হাজির। সে উঠোনে পা রাখতেই ঘোষগিন্নী উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান, বললেন, রমু এলি?

রমেন বারান্দায় উঠতে-উঠতে বলে, হ্যাঁ মা।

তর অ্যাতো দেরি হ'ল কেনে?

অ্যাড্‌মিটকার্ড লিয়ে ঝামেলা।

অ্যাড্‌মিটকার্ডের কথা উঠতেই সাগ্নিক জিজ্ঞেস করল, অ্যাড্‌মিটকার্ড পেয়েছ?

না।

না।

আসছেনি, পাইছিনি।

কেন?

জানিনি, কলেজও বলতে পারছেনি।

এর পর রমেন যা বলল তার মানেটা দাঁড়ায় এইরকম : কলেজের সবার অ্যাডমিটকার্ড এসেছে, সুধু ওরটা বাদে। প্রিন্সিপ্যাল এর জন্য লিখবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে বারণ করে দিয়েছেন। আর মাত্র সাতদিন পরে পরীক্ষা। কাজেই কলকাতায় গিয়ে ওটা হাতে হাতে বার করে নিযে আসতে বলে দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল।

হ্যাঁ, নিজেদেরই আনতে হবে, একটামাত্র ছেলের জন্য কলেজ থেকে এখন কেউ যাবে না।

সব শুনে ঘোষগিন্নী কান্নার সুরে বলে ওঠেন, কিটা হবে গো মাষ্টার, ছ্যানাটা মোর পরীক্ষা দিতে পারবে তো ?

সাগ্নিক বলল, কেন পারবে না ? আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। ঘোষমশাই আসুন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা-কিছু ব্যবস্থা করা হবে।

সাগ্নিকের কথা শেষ হতে-না-হতেই ব্রজেন ঘোষ ফিরে এলেন। স্বামীকে দেখেই উদ্বেগাকুল ঘোষগিন্নী উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, হ্যাগো শুনছু, রমুর সৌটা পাইছেনি।

পাইছেনি ! চিন্তিতভাবে ঈজিচেয়ারে বসে পড়েন ব্রজেন ঘোষ।

অ্যাডমিটকার্ড-সংক্রান্ত সমস্ত কথা রমেন সবিস্তারে আবার বলল।

ঘোষগিন্নী কান্না-কান্না সুরে বললেন, মোর ছ্যানার কিটা হবে গো ?

ব্রজেন ঘোষ চিন্তার গভীরতা থেকে মাথা তুলে বলেন, অটা লিয়ে তোমাকে ভাবতে হবেনি। মুই আর মাষ্টার ভাবিঠি। তুমি যাও, ছ্যানারে খাতে দাওগে।

স্বামীর কথায় ঘোষগিন্নী বোধহয় সান্ত্বনা পেলেন না, তবুও ছেলেকে জামা-কাপড় ছেড়ে খেতে আসার কথা বলে উনি রান্নাঘরে চলে গেলেন। রমেনও বেরিয়ে গেল।

ব্রজেন ঘোষ তখনো একমনে ভেবে চলেছেন।

সাগ্নিক ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল, অত ভাবছেন কেন আপনি ?

ভাববনি ? তুমি কি বলোঠো মাষ্টার ?

ভেবে আর কি হবে, একটা-কিছু ব্যবস্থা করুন।

কিটা করব তুমি বলো।

কাউকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন, অ্যাডমিটকার্ড এসে যাবে।

কলকাতায় গেলেই অটা পাওয়া যাবে?

তা কেন যাবে না? অনেকেই এভাবে বার করে নিয়ে আসে।

তাহলে তুমি এক কাজ কর মাষ্টার।

কি?

তুমি ভোরেই বারে পড়।

আমি?

হ্যাঁ তুমি, তুমি ছাড়া আর কে যাবে?

কিন্তু আমার যে একটু অসুবিধা আছে।

মানে?

আমার শরীরটা ততো ভালো নেই।

অ্যাতে তোমার শরীর আরো ভালো হবে। কয়েক দিন ঘুরে আস, দেখবে ভালো লাগবে। এই সুযোগে মায়ের কাছ থাকতে একটুকু ঘুরেও আসতে পার।

আমাকে এবারকার মতো আপনি ক্ষমা করুন।

ব্রজেন ঘোষ মুখটাকে করুণ করে বললেন, তাহলে রমুর আর পরীক্ষা দেওয়া হ'লনি।

কেন হবে না, যে-কেউ একজনকে পাঠিয়ে দিলেই ওটা এসে যাবে।

সৌ লোকটা কে? আমি, সখি, না কি কানার মা?

সখি বা কানার মায়ের কথা ওঠে না। তবে আপনি গেলে হবে না, আমি তা মনে করি না।

ব্রজেন ঘোষ ধূর্ত আর করুণ হাসি হেসে বলল, তুমি মোকে চিনছনি মাষ্টার। মোর মোড়লী কেবল এই শিউলী গাঁয়ে, গাঁয়ের বাইরে গেলেই মোর হাত-পা কাঁপে মরে।

সাগ্নিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, না, না, সেরকম হতে পারে না। তাছাড়া

আপনিই বা যাবেন কেন ? শিবু মাইতি, ধীরেন ঘোষ, লখা দোলুই, ওদের .য-কাউকেই পাঠান, ঠিক বার করে নিয়ে আসবে।

অরা আনে দিবে অ্যাডমিটকার্ড ?

হ্যাঁ, নিশ্চয় এনে দেবে, পাঠিয়ে দেখুন।

ব্রজেন ঘোষের মুখটা যেন আবার করুণ হয়ে যায়। নিচু গলায় বললেন, তা ছাড়া অরা যাবেই বা কেনে ? তুমি অর মাষ্টার, তুমিই যখন যাতে চাওঠোনি, অরা কেনে যাবে ?

বিশ্বাস করুন, আমার শরীরটা ভালো নেই।

বেশ তাহলে যেয়োনি। মুই রমুকে আর অর মাকে বলিঠি—রমুর এবার পরীক্ষা দেওয়া হবেনি।

ব্রজেন ঘোষ সত্যি সত্যি রাগ দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। রান্নাঘরে চলে :গলেন।

শরীর ভালো নয়, এটা অবশ্যই ঠিক নয়। কলকাতায় যেতে যে সাগ্নিকের কোনো বাধা বা আপত্তি আছে তা তো নয়। আসলে সে এ-সময়ে শিউলী গাঁ ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না।

শনিবার দমনের বিয়ের দিন। আজ সোমবার। আজ ওদের মিটিংয়ে ঠিক হবে এ-বিয়ে হবে কি হবে না। হয়তো এতক্ষণে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েও নিয়েছে। এ-সময়ে সাগ্নিক শিউলী গাঁয়েই থাকতে চায়। অন্তত হামরুর সঙ্গে একবার কথা বলার আগে কোথাও যেতে চায় না। তাই সে কলকাতায় যেতে অস্বীকার করেছে। এমন যদি হ'ত একদিনেই কলকাতার কাজ মিটে যেত তাহলে হয়তো চলে যেত। কিন্তু সে-সম্ভাবনা নেই। যাদের ক্ষেত্রে এরূপ হয়েছে সাগ্নিক দেখেছে তিন-চার দিনের কমে তারা অ্যাডমিটকার্ড বার করে আনতে পারেনি। শনিবারের আগের দিনগুলিতে সে বাইরে থাকতে চায় না। হামরুর সঙ্গে তার অনেক কথা আছে। তেমন দেখলে এ-বিয়ে থেকে ওদের বিরত করবার চেষ্টা করবে সাগ্নিক।

কিন্তু তা কি সে পারবে ? দরিদ্র, পরান্নভোজী, পরাশ্রিত একজন মানুষ কতক্ষণ তার অন্নদাতার অনুরোধ তথা আদেশ উপেক্ষা করতে

পারবে? সাগ্নিক নিশ্চিত জানে, এ-অনুরোধ এখানেই শেষ হয়ে গেল না। এবার আসবেন ঘোষগিন্নী, আসবে রমেন, সঙ্গে থাকবেন স্বয়ং ব্রজেন ঘোষ। ওঁরা এমনভাবে অনুরোধ করতে থাকবেন যার মধ্য থেকে ওদের আদেশ, ওদের হুমকি উঁকি দিতে থাকবে। সে-আদেশ, সে-হুমকি উপেক্ষা করা সাগ্নিকের পক্ষে সম্ভব হবে না। কোনোদিনই সম্ভব হয়নি।

ভেবে-ভেবে অবশেষে সাগ্নিক এই সিদ্ধান্তে এল, একান্তই যদি তাকে কলকাতায় যেতেই হয়, তবে সে পরশু যাবে, কাল কিছুতেই না। তার আগে, অর্থাৎ কাল সারাদিন, সে হামরুদের সঙ্গে কথা বলবে, সব খোঁজ-খবর নেবে এবং প্রয়োজন হলে শেষপর্যন্ত এ-বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেবে ওদের।

॥ নয় ॥

সাগ্নিক মনে মনে যা ভাবল বাস্তবে কিন্তু সেটা ঘটল না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তিন দিক থেকে তার ওপর আক্রমণ নেমে এল। রমেনের বারবার আকুল অনুরোধ, সাগ্নিকের হাত ধরে ঘোষগিন্নীর কান্না, সব-কিছুর উপর ব্রজেন ঘোষের নীরব অথচ ক্রূর চাহনি, যার অর্থ এর পরও যদি তুমি যেতে না-চাও তবে এখানে তোমার স্থান হবে না; পত্নী-পুত্রসহ ব্রজেন ঘোষের এই ত্রিমুখী আক্রমণে অবশেষে সাগ্নিক পরাভব স্বীকার করল। তবু সে বলল, তাহলে কাল নয়, আমি পরশু যাব।

কিন্তু তা-ও হ'ল না। ব্রজেন ঘোষ কোনোমতেই তাকে কাল এখানে থাকতে দেবে না, এমনি এক একগুঁয়েমির কাছে সে মাথা নত করতে বাধ্য হ'ল। অতএব পরের দিন ভোরেই তাকে কলকাতার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। বেরিয়ে পড়তে তাকে বাধ্য করলেন ব্রজেন ঘোষ।

হামরুর সঙ্গে তার দেখা হ'ল না, কোনো কথা ওদের মুখ থেকে সে

শুনল না, কোনো-কিছু সে ওদের বলতেও পারল না। অথচ হামরুদের সঙ্গে দেখা করার কী ভীষণ দরকারই-না তার ছিল!

সেবার কয়েক দিনের জন্য উলুবেড়িয়ায় গিয়েছিল সে, ফিরে এসে দেখল এক বিপত্তি ঘটিয়ে বসে আছে ওরা। সাগ্নিকের মন বলছে এবারো তেমনি-কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বিপত্তি বা দুর্ঘটনা কিছু ঘটলে বা ঘটালে সাগ্নিক তা প্রতিরোধ করতে পারবে না ঠিকই, তবুও সে যখন বুঝতে পারছে এক ভীষণ বিপদ হাঁ করে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে, ওর কি উচিত নয় ওদের একটু সাবধান করে দেওয়া? পরামর্শ জুগিয়ে একটু সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া ওর তো আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সে-সুযোগও সাগ্নিক পেল না, কাক-ভোরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন ব্রজেন ঘোষ।

ওর নিজস্ব মতামতটুকুও যদি সে হামরুদের কাছে পৌঁছে দিতে পারত তাতেও সে খানিকটা স্বস্তি পেত। বাসের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে এসব কথা ভাবল। এখনো সে-সুযোগ আছে কিনা সেটাও সে ভাবতে লাগল। ভাবতে-ভাবতেই একসময় তার পুতুলের কথা মনে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিল, দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে যা কখনো নেয়নি, তাকে দিয়ে নেওয়ানো যায়নি। অর্থাৎ সে পুতুলের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

পুতুল দশ বছরে হাজার অনুরোধ-নিমন্ত্রণ করেও সাগ্নিককে কোনো-দিন নিতে পারেনি, না তার বাবার কোয়ার্টার্সে, না স্বামীর বাসায়। সেই সাগ্নিকই আজ অনাহুতভাবে তার বাড়িতে যাচ্ছে, তার স্বামীর কোয়া-র্টার্সে যাচ্ছে, একথা ভেবে সাগ্নিক নিজেই বিস্মিত হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে সাগ্নিককে অতিথিরূপে পেয়ে পুতুল যে অত্যন্ত খুশি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হবে না-ই বা কেন? দু'জনের বন্ধুত্ব যে আন্তরিক।

সাগ্নিক শিউলী প্রাইমারী ইস্কুলে চাকরি নিয়ে আসার কয়েক মাস পরেই আসে পুতুল। অর্থাৎ দু'জনে প্রায় একই সময় থেকে একই

ইস্কুলে কাজ করে চলেছে। যুগল এসেছে তারও চার-পাঁচ বছর পরে। আদিবাসী-প্রধান এলাকার ইস্কুল বলেই আদিবাসী শিক্ষকরূপে যুগলকে পাঠানো হয়েছিল। দীর্ঘ দশ বছর সাগ্নিক আর পুতুল এক সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। একটানা দীর্ঘ দশ বছর! এই সুদীর্ঘ কালের মেলামেশা যদি ওদের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো-কিছুর জন্ম দিয়ে থাকে, তাকে কি অস্বাভাবিক বলা যাবে?

পুতুল যখন চাকরি নিয়ে শিউলী গাঁয়ে আসে তখন তার বয়স ছিল বড়জোর একুশ-বাইশ। সে-সময় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু-হয়ে-আসা অবনী চক্রবর্তী খড়্গপুরে রেলের এক নিম্ন-আয়ের কর্মচারী, ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। তাঁরই বড় মেয়ে পুতুল ইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢোকে, আই-এ পাস করে বি-এতে ভর্তি হয়। এই সময়ে স্পেশাল ক্যাডারের এই চাকরিটি সে পেয়ে যায়। পুতুল সঙ্গে সঙ্গে চাকরিতে যোগ দিল। এখানেই তার বয়স বেড়েছে, অভিজ্ঞতা বাড়ল, হয়তো বা তার পৃথিবীর সীমানাও বেড়েছে। এবং বন্ধুত্বও বেড়েছে সাগ্নিকের সঙ্গে। তারপর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে তার বিয়েও হয়েছে। এখন সে এক ছেলে আর স্বামীকে নিয়ে সুখের দাম্পত্য-জীবন যাপন করছে। বিয়ের পর সাগ্নিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এতটুকুও ম্লানতা প্রবেশ করেনি।

আসলে ওদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বাইরে থেকে যেটা ধরা যায় না। ওরা নিজেরাও ধরতে পারে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। একজনকে নিয়ে অন্যের আগ্রহ ও মমতা অসীম। একজনের শুভখবরের জন্য আর-একজন উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। একজনকে খুশি দেখলে অন্য-জন খুশি হয়। একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করে না, হিংসা করে না, আহত করে না। আসলে ওদের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক আছে যা কখনোই নিজেকে প্রকাশ করে না। যে-সম্পর্ক একান্তই অন্তঃসলিল, জাহির করে না অথচ ফল্গুধারার মতো

গোপনে প্রবাহিত হয়। এ-সম্পর্ক তীর ভাঙে না, পাড় ধসায় না, অথচ স্নিগ্ধ শান্ত চিরপ্রবহমানা গাঁয়ের ছোট্ট শান্ত নদীটির মতো। এই মধুর সম্পর্ক ওদের স্নিগ্ধ করে, দু'জনেই সেই মাধুর্যে মুগ্ধ হয়।

সাগ্নিকের বক্তব্য হামরুদের কাছে পৌঁছে দিতে অতএব পুতুলের চেয়ে বিশ্বস্ত আর কে থাকতে পারে?

রিক্সাতে পুতুলদের কোয়ার্টার্সে যেতে ওর মিনিট পনেরো সময় লাগল। পুতুলের স্বামী নির্মল তখন বাগানের কি-সব চারাগাছে জল দিচ্ছিলেন। সাগ্নিক গেটের কাছে গিয়ে রিক্সা থেকে নামল। পুতুলও সেই সময় ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছিল। সাগ্নিককে দেখে সে আনন্দে আবেগে যেন খানিকটা বিহ্বল। নির্মলবাবু বা সাগ্নিক দু'জনেই একে অন্যের কাছে অপরিচিত। পুতুল সেই অপরিচয়ের বাধা অপসারিত করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকও অতিথিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সাগ্নিক দু'জনের কাউকে ব্যতিব্যস্ত হতে দিল না। পুতুলের বাইরের ঘরে কয়েক মিনিটের জন্য বসল, পুতুলের ছেলেটিকে একটু আদরও করল, নির্মলবাবুর সঙ্গে কিছু কথাও বলতে হ'ল, আর এক কাপ চা-ও খেল। তার বেশি কিচ্ছু না, এর বেশি কিচ্ছু সে ওদের করতে দিল না। তারপর হামরুর উদ্দেশে বলার জন্য পুতুলের কাছে কিছু কথা রেখে সে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। স্টেশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবে। অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত আর নিরুদ্বিগ্ন হয়ে সে খড়্গপুরে রেল-স্টেশনে পৌঁছল।

কলকাতায় গিয়ে অ্যাডমিটকার্ড বার করে আনতে ওর তিনদিন লেগেছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সে অ্যাডমিটকার্ড নিয়ে ফিরে এসেছে। মঙ্গলবার আর বুধবার সে রাত্রে উলুবেড়েতে গিয়ে মায়ের কাছে থেকেছিল। শিউলী গাঁয়ে যখন সে ফিরল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। কিন্তু তার আগেই, বুধবারেই শিউলী গাঁয়ের পৃথিবীতে চরম দুর্ঘটনাটি ঘটে গেছে। সাগ্নিকের সকল ভাবনা, পুতুলকে দিয়ে হামরুর কাছে জরুরিবার্তা পাঠানো, সব প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়েছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি।

প্রাথমিক ধাক্কাটা একটু থিতিয়ে এলে সাগ্নিক নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি শিউলী গাঁয়ে উপস্থিত থাকলে কি ঘটনাটি ঘটত না? নিজের দুর্বলতা-অসহায়তা-অসামর্থ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে সাগ্নিক নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়। বলে, আমি শিউলী গাঁয়ে হাজির থাকলেও ঘটনাটা ঘটতও, অন্তত ঘটবার পথে কোনো বাধা ছিল বলে মনে হয় না। কেননা, ওই দৈন্যপীড়িত আর দুর্ভাগ্যতাড়িত দমনের প্রতি, ওই অসহায় আর নির্বোধ সাঁওতাল মানুষগুলোর প্রতি সাগ্নিকের সহানুভূতি দরদ মমতা যতই আন্তরিক হোক না কেন, সে-ও তো ওই ওদের মতো দৈন্য-ভারাক্রান্ত একটি মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে বিধবা মায়ের চোখের নোনতা জলের স্বাদ নিতে নিতে সে বড় হয়েছে। প্রাইমারী ইস্কুলের সামান্য পয়সার এই চাকরিটা তার আছে বটে, কিন্তু এই সামান্য ক'টি টাকায় যে তাকে একটি পরিবার প্রতিপালন করতে হয়, একটি বেকার ভাইয়ের বোঝা বইতে হয়, বোনের পড়া-শোনার খরচ জুগিয়ে যেতে হয়, অকালবৈধব্য-দগ্ধ-মাতৃহৃদয়ের খবর রাখতে হয়। ব্রজেন ঘোষ নেহাত অনুগ্রহ করে ওকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, আহারের সংস্থান করে দিয়েছেন, তাই সে তার জরাজীর্ণ অস্তিত্বকে কায়ক্লেশে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। নইলে, এই অর্থে যদি তাকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিতে হ'ত, আহারের ব্যবস্থা করতে হ'ত, তাহলে হয়তো কবে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে যেত শিউলী গাঁয়ের মানুষ।

নিজের দৈন্য দ্বারা কি কেউ অন্যের দীনতা ঘুচাতে পারে? নিজের এই দারিদ্র্য, দুর্বলতা, অসহায়তা আর অসামর্থ্যকে সম্বল করে সাগ্নিকও কি দমনের জীবনের দুর্ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে পারে, তা যত মর্মান্তিকই হোক না কেন?

সাগ্নিক যেভাবে নিজেকে ভাবছে ব্রজেন ঘোষ কি সে-সব জানেন না, বোঝেন না? নিশ্চয় জানেন, বোঝেনও নিশ্চয়। তবু কেন সাগ্নিককে কলকাতায় পাঠালেন? ছেলের অ্যাডমিটকার্ড বার করে আনতে?

এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও সাগ্নিকের হাসতে ইচ্ছে করে। সাগ্নিক নিশ্চিত জানে, ছেলের অ্যাডমিটকার্ড না-পাওয়াটা একটা ছুতো মাত্র। অ্যাড-মিটকার্ডের সমস্যাটা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির না-হলে ব্রজেন ঘোষ অন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতেন, আর তারই সমাধান খুঁজতে উনি যেমন করেই হোক সাগ্নিককে শিউলী গাঁ থেকে দূরে কোথাও পাঠাতেনই। ·

কিন্তু কেন? ব্রজেন ঘোষ তো নিশ্চিতই জানেন এক-পয়সা দিয়ে কাউকে সাহায্য করার মুরোদ সাগ্নিকের নেই, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু করতেও পারবে না পরাশ্রিত পরান্নভোজী এই মানুষটি, তবুও কেন তাকে দূরে পাঠানোর এই নির্লজ্জ প্রয়াস? তবে কি ব্রজেন ঘোষ ভেবে-ছিলেন সাগ্নিক শিউলী গাঁয়ে উপস্থিত থাকলে তাঁর হীন উদ্দেশ্য মসৃণ-ভাবে সাধিত নাও হতে পারে? ব্রজেন ঘোষ এসব কথা ভাবতে গেলেন কেন? ওই হামরু-দমনদের প্রতি কেবল সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা বা অধিকার, কোনোটিই সাগ্নিকের নেই। তবে কি সাগ্নিকের সহৃদয়তা সহানুভূতি সমবেদনাকেও ব্রজেন ঘোষ ভয় পান? তাহলে সক্রিয় সমর্থনসহ আর কেউ যদি ওই দমন-হামরুদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারত ব্রজেন ঘোষ তখন কি করতেন? ব্রজেন ঘোষ কি কুঁকড়ে যেতেন, নাকি আরো জটিল কুটিল পথে সমর্থনকারীকে ধ্বংস করার চেষ্টা করতেন?

এত কথা বলা হ'ল অথচ আসল ঘটনা এখনো বলা হয়নি, তাই তো? বেশ এবার সেই কথাটাই বলা যাক।

অ্যাডমিটকার্ড পাওয়া গেছে শুনে ঘোষ-দম্পতি খুব খুশি হলেন। ওঁরা তখন বারান্দায় বসে ছিলেন। রমেন নরেন পারুল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, ওরাও খুশি হয়েছে। সাগ্নিক অ্যাডমিটকার্ড বার করে রমেনের হাতে দিল।

ব্রজেন ঘোষ ছেলের উদ্দেশে বললেন. অ্যাডমিটকার্ড মিলছে এবার

মন দিয়ে পড়াশিখা করগে। সবাই যাও, পড়তে বসগে!

রমেন নরেন পারুল ঘরের মধ্যে ফিরে গেল। ব্রজেন ঘোষ হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ঝামেলা মিটছে?

ঘোষগিন্নীর মুখে খুশির চিহ্ন।

ব্রজেন ঘোষ আবার বললেন, মাষ্টার অনেক খেটেখুটে অটা বার করে আনছে! আজ অরে একটুকু ভালোমন্দ খাতে দাও।

সৌটা মোকে বলে দিতে হবেনি।

এসব কথায় সাগ্নিক কোনোদিনই কান দেয় না, আজও দিলে না। সে নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। ব্রজেন ঘোষ ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, উঠছু কেনে মাষ্টার? একটুকু বস না, কলকাতার গল্প শোনা যাক তোমার কাছ থাকতে!

সাগ্নিক আবার বসল। এখনো সে কাপড়চোপড় ছাড়েনি।

ঘোষগিন্নী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা গল্প কর, মুই তোমাদের তরে চা লিয়ে আসিঠি।

ঘোষগিন্নী রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

ব্রজেন ঘোষ বসে-বসে সাগ্নিকের কাছ থেকে কলকাতার গল্প শুনে চলেছেন।

ঘোষগিন্নী আবার এলেন, ওঁর হাতে কিছু তেলেভাজা আর গরম চা। চা আর খাবার ওদের সামনে নামিয়ে রেখে ঘোষগিন্নী বললেন, তোমরা চা খাতে থাক, মুই রান্নাঘরে যাইঠি, মাষ্টারের তরে আজ মুই লিজের হাতে রান্না করব ভাবিঠি। মুখে প্রসারিত হাসি নিয়ে ঘোষগিন্নী চলে গেলেন।

চা-সহযোগে গল্পের ফাঁকে-ফাঁকে ব্রজেন ঘোষ যেন কিছুটা উশখুশ করতে থাকেন। সাগ্নিকের দৃষ্টি এড়ায় না। ব্যাপারটা বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করবার পর সাগ্নিকের মনে হ'ল ব্রজেন ঘোষ যেন কিছু বলতে চান অথচ সহজে বলতে পারছেন না। সাগ্নিক বিস্মিত হয়, চিন্তিত হয়। অকস্মাৎ তার মনে ভেসে ওঠে, দমনের বিয়ের ব্যাপারটা। তার কি

হয়েছে কে জানে! সাগ্নিক একবার ভাবল, কথাটা ব্রজেন ঘোষকে জিজ্ঞেস করব কি? আবার ভাবে, কি দরকার, তার চেয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে রাস্তায় দাঁড়ালেই তো সব খবর জানা যাবে।

মাষ্টার! সাগ্নিকের ভাবনা খণ্ডিত হয় ব্রজেন ঘোষের অমায়িক কণ্ঠস্বরে। সাগ্নিক আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলে তাকাল।

ব্রজেন ঘোষ কণ্ঠস্বরকে আরো অমায়িক করে ধীরে-ধীরে বললেন, তুমি তো ছিলেনি মাষ্টার, এ-ধাবকে মুই একটা কাম করে ফেলছি।

ব্রজেন ঘোষ এমন ঢঙে কথাগুলো বললেন যাতে মনে হতে পারে সাগ্নিক ছিল না বলে কাজটি করতে তাঁর আপত্তি ছিল।

সাগ্নিক প্রমাদ গোনে, চা খাওয়া তার মাথায় ওঠে, প্রচণ্ড কৌতূহল আর দুর্ভাবনা নিয়ে সে ব্রজেন ঘোষের মুখের দিকে তাকায়।

ব্রজেন ঘোষ একখণ্ড পবিত্র-মার্কা নকল হাসি ঠোঁটে আটকে রেখে বললেন, মোর ইচ্ছা ছিলনি মাষ্টার, তবে বেচারা গরিব মানুষ, হাতে-পায়ে ধরে কাঁদতে লাগছে—

ব্রজেন ঘোষ থামলেন, সাগ্নিকের মুখের জরিপ করলেন সংগোপনে। সাগ্নিকের মুখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ছায়া আরো ঘন হয় যেন। ব্রজেন ঘোষ ওকে দেখতে-দেখতে আবার বললেন, তাই আর অরে ফিরে দিতে পারছিনি। মুখের নকল পবিত্র হাসিকে আরো প্রসারিত করে ব্রজেন ঘোষ বললেন, টাকা অবশ্য মোকে ধার করে লিতে হ'ল।

সাগ্নিকের মুখ তখন আতঙ্কে কালো হয়ে উঠেছে।

ব্রজেন ঘোষ ভূমিকা আর দীর্ঘতর না-করে এবার সরাসরি বললেন, দমনার বিলটা মুই বন্ধক রাখছি মাষ্টার।

কী বলছেন আপনি! সাগ্নিকের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন জ্বলে ওঠে।

দমনার জমিনটা মুই বাঁধা রাখছি।

বাঁধা রেখেছেন?

রাখতে বাধ্য হইছি।

কতো টাকায় বাঁধা রেখেছেন?

সাতশো টাকায়।

পাঁচবিঘে জমি মাত্র সাতশো টাকায়!

জমিন তো মুই খরিদ করিনি মাষ্টার, বাঁধা রাখছি শুধু, তাও বিনাসুদে। য্যাখনই অরা অই সাতশো টাকা ফিরে দিতে পারবে, জমিনটাও অরা ফিরে পাবে। আর য্যাতদিন তা পারবেনি, মুই জমিনটা চাষ করে লিব শুধু। বিল কোনোদিনই মোর হবেনি, অদেরই থাকবে।

ব্রজেন ঘোষের কথা শুনে সাগ্নিক যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলছে। ব্রজেন ঘোষ সেটা বুঝতে পেরে বললেন, এ-লিয়ে তুমি কেনে শুধু-শুধু ভাবতে যাওঠো মাষ্টার?

এর পরও কথা বলতে পারছেন ব্রজেন ঘোষ। সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে সাগ্নিককে অপমান করতেও বাধছে না তাঁর! সাগ্নিক শক্তি সঞ্চয় করতে-করতে বলল, লেখাপড়াটা কিরকম করলেন? সবার আগে সাগ্নিকের মনে এই প্রশ্নটি জেগে ওঠার কারণ ছিল।

সাগ্নিক শুনেছে আদিবাসীদের জমিজমার দলিল হওয়া খুবই মুশকিল, হয়ই না বলা চলে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নাকি হয়, তবে আগে থেকে ডি. এম.-এর পারমিশন নিতে হয়, অনেক-কিছু করতে হয়। সাগ্নিক ভাবল, এই দু-তিন দিনের মধ্যে ব্রজেন ঘোষ হয়তো সে-সব করতে পারেননি, এমনি হয়তো সাদাকাগজে একটা-কিছু লিখে-টিখে নিয়েছেন। তা যদি হয় তবে দমনের বাঁচবার পথ একটা-কিছু থাকলেও থাকতে পারে। অন্যথায় দমনের সর্বনাশ।

কিন্তু ব্রজেন ঘোষের উত্তর শুনে সে তাজ্জব বনে গেল। ব্রজেন ঘোষ ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি ফুটিয়ে বললেন, বিল-জমিন আর টাকা পয়সা লিয়ে কোনো কাঁচা কাজ চলেনি মাষ্টার। তা ছাড়া অটা আবার সাঁওতালদের জমিন, মোকে একটুকু সাবধান থাকতেই হয়।

অর্থাৎ আপনি পাকা-দলিল করে নিয়েছেন?

লিবনি? কি যে বলু মাষ্টার? ব্রজেন ঘোষ হেসে ওঠেন।

তবে যে শুনি কত বাধা, পারমিশন—

ঠিক শুনছ। তবে কি জান্নু মাষ্টার, কথায় বলে টাকা দিলে বাঘের চোখ মেলে, আর দমনার বিলের দলিল হবেনি? ব্রজেন ঘোষ নিজের কৃতিত্বে নিজেই হেসে উঠলেন।

ওর ওই বিকৃত হাসি দেখে সাগ্নিকের যন্ত্রণা শতগুণ বেড়ে গেল। সে যন্ত্রণা-কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করল, দলিলেও কি আপনি ওই টাকাটাই রেখেছেন?

তাই কেউ রাখে মাষ্টার? আইন বাঁচাবার তরে আর মোর টাকার লিরাপত্তার কথা ভাবে মোকে বাজার দরটাই—

সে তো অনেক টাকা!

ব্রজেন ঘোষ হাসতে-হাসতে বলল, অটা লিয়ে তোমাকে ভাবতে হবেনি, মাষ্টার। লিখতে হয় তাই লিখছে, অদের কিচ্ছু বেশি দিতে হবেনি। যাকগে, অটা লিয়ে তুমি ভেবোনি মাষ্টার। তুমি অখন বিশ্রাম লিতে থাক, মুই একটুকু আসিঠি।

ব্রজেন ঘোষ বারান্দা থেকে নেমে গেলেন।

তুলসীর মৃত্যু একদিন সাগ্নিককে বিষণ্ন করেছিল, তার মন সেদিন বেদনায় ভরে উঠেছিল। দমনের গরু-বিক্রির সংবাদে সে ভেঙে পড়েছিল, বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনায় সে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু আজ? আজকের ঘটনা যেন ওর হৃদয়কে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গেল। এই ক্লিষ্ট মানসিকতা নিয়ে সে অনেক কথা ভেবে চলল। ব্রজেন ঘোষ কি আর কোনোদিন জমিটা দমনকে ফিরিয়ে দেবেন? দমন কি আর কোনোদিন জমিটা উদ্ধার করতে পারবে?

সাগ্নিক বুঝল, দুটি প্রশ্নের উত্তর একই, অর্থাৎ না। আরো ভালো উত্তর দিতে পারে ব্রজেন ঘোষের দোতলায়-রাখা লোহার সিন্দুকটা। তার মধ্যে নাকি এরকম অনেক জমির মালিকানা বন্দী আছে বলে সাগ্নিক শুনেছে।

আচ্ছা, হামরুয়া ওর কথার এতটুকু দাম দিল না কেন? পুতুলকে সে

সবকথা বলেই গিয়েছিল। ওরা পুতুলের কথামতো কাজ করল না কেন? পুতুল কি ওদের কাছে সাগ্নিকের বার্তা পৌঁছে দেয়নি? না, তা তো হয় না, সেটা অসম্ভব। পুতুল নিশ্চয় যথাযথরূপে তার সবকথা ওদের কাছে বলেছে। তবুও ওরা এমনটি করল কেন? সাগ্নিকের কথা শুনুক আর না-ই শুনুক, নিজেদের ভালোটাও ওরা বুঝল না! যাকগে, নিজেদের ধ্বংস দেখবার জন্য যখন ওরা এত ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, সাগ্নিক আর ওদের কি করে বাঁচাবে?

এক প্রচণ্ড অভিমান আর ক্ষোভ বুকে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, জামা-কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নেবে বলে নিজের ঘরে গেল। কিন্তু ঘরে গিয়ে বসতে পারে না, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে, তারপর টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে, আর কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় নেমে সাঁওতালপল্লীর উদ্দেশে হেঁটে চলল।

সাঁওতালপল্লীতে গিয়ে সাগ্নিক সোজা দমনের বাড়িতে হাজির হ'ল। হামরু, পূরণ এবং আরো অনেকে বারান্দায় বসে আছে। দমন নেই, সে পাড়ায় গেছে সবাইকে ডাকতে। আজ সে সামাজ ডাকছে। হামরু আর পূরণ গিয়েছিল মেদিনীপুরে চাঁদির গয়না কিনতে, বিয়ের অন্যান্য বাজার করতে। একটু আগে ওরা ফিরে এসেছে, ওদের পরনে বাজারের পোশাক। একটা ঝুড়িতে তখনো বাজারের সামগ্রী বারান্দাতেই রয়েছে। একপাশে একটা কুপি জ্বলছে টিমটিম করে।

সাগ্নিককে দেখে হামরু আর পূরণ উঠে দাঁড়াল, উঠে একেবারে উঠোনে চলে এল সাগ্নিকের কাছে। হামরু বলল, তুই কোখন ফিরছু মাষ্টরবাবু?

সাগ্নিক সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বলল, পুতুল তোদের আমার কথা বলেছিল?

হেঁ।

তবে এ-কাজ করলি কেন? পাঁচ বিঘে জমি সাতশো টাকায় বন্ধক

রেখে দমনের বিয়ে দিচ্ছিস কেন? বিয়ে ভেঙে দিতে পারলিনে?

এর উত্তরে ওরা যা বলল তার সারাংশ এইরকম : দমনকে স্বাভাবিক করতে চাইলে বিয়েটা ছিল অনিবার্য। অন্য কোথাও বিয়ের সম্ভাবনা ছিল না। বাখরচক রাজী হয়েছে, তবে শনিবারে বিয়ে না-হলে অন্য কোথাও মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে। অতএব জমি বিক্রি করা ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না।

সাগ্নিক বলল, তাই যদি হয় তবে ব্রজেন ঘোষের কাছে গেলি কেন? পাঁচ বিঘে একসঙ্গে বন্ধক না-রেখে এক-আধ বিঘে বিক্রি করে কাজ সারলি না কেন?

এর উত্তরে ওরা যা বলল সেটা বহুজনের মুখ থেকে বহুবার সে শুনেছে। দমনের গরু-বিক্রির সময়ে হামরুদের মুখ থেকেও সে শুনেছে। ওই একই ধরনের কথা শুনে-শুনে সাগ্নিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ব্রজেন ঘোষ ছাড়া আর কোনো খদ্দের পাওয়া যায়নি, তাও ব্রজেন ঘোষ জমি কিনতে চাননি, কেবল বন্ধক রাখতে চেয়েছেন। বন্ধক রাখবেন তাও আবার পাঁচ বিঘে জমি একসঙ্গে পেলে, তার কম হলে নয়। বিনিময়ে টাকা দেবেন ওই সাতশো, যা ওদের এখন দরকার বলে তিনি জেনেছেন। সাগ্নিক মনে-মনে বলে, সেই একই খেলা, সেই পুরনো খেলা। তোমার এ-খেলা কি কোনোদিন শেষ হবে না ব্রজেন ঘোষ?

সাগ্নিক আবার প্রশ্ন করল, পৌষ মাসে চাউড়ীর আগে পণ আর গরু দিতে হবে, তখন আবার টাকা কোথায় পাবি?

হামরু উত্তর দিল, ত্যাখন জমিন কুছুটা বিকিয়ে দিতে হবে।

কোন জমি?

দমনের জমিন।

তার আগে জমিটা ছাড়িয়ে আনতে হবে তো?

পূরণ বলে, বজনা ঘোষ বলছে উয়াতে আটকাবেনি।

সাগ্নিকের মুখে ম্লান হাসি। সে বলে, সেদিন কার কাছে বেচবি, কে কিনবে?

হামরু বলে, খদ্দের দিখাতে হবে।

কোথায় পাবি ?

খুঁজে লিতে হবে।

যদি না-পাস ?

পূরণ বলে ওঠে, ত্যাখন বজনা ঘোষ লিজেই লিবে বলছে।

যদি না-নেন, না-নিতে পারেন ?

ত্যাখন খদ্দের খুঁজে দিবে বলছে।

যদি ব্রজেন ঘোষও খদ্দের খুঁজে না-পান ?

এর উত্তর যে কি হবে হামরু বা পূরণ তা জানে না। অতএব ওরা আর কোনো উত্তর দিতে পারল না।

তবে দমনের জমির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাগ্নিক নিশ্চিতরূপে বলতে পারে ওটা আর কোনোদিনই দমনের হবে না, ওই জমি চিরকালের মতো ব্রজেন ঘোষের হয়ে গেছে। শুধু সাগ্নিক কেন, ব্রজেন ঘোষকে যারা বরাবর দেখে আসছে, ব্রজেন ঘোষের বৈভব-বৃদ্ধির পদ্ধতি সম্পর্কে যারা অবহিত তারা প্রত্যেকেই ওই একই কথা বলবে।

হামরু-পূরণের যদি এতটুকু চিন্তাশক্তি থাকত তবে ওরাও অতিসহজে ওই সিদ্ধান্তে আসত না। ওই নাবালকের আশা-ভরসা মনে মনে পোষণ করত না। সাগ্নিক আজ ওদের কাছে সে-সব খুলে বলল না, কোনো পথের সন্ধান বা ওদের মঙ্গলের জন্য কোনো উপদেশও দিল না। না, ওসব বলতে এই রাত্রিবেলায় সে দমনের বাড়িতে আসেনি, সে এসেছে তার শেষ কথাটা ওদের কাছে জানিয়ে দিতে।

সাগ্নিক বলল, শোন হামরু, দমনের জমি যদি তোরা ব্রজেন ঘোষের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারিস তবেই তোদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় থাকবে। আর যদি তা না-পারিস তবে তোদের সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্কই থাকবে না।

জমি ওরা কোনোদিনও আর ফিরে পাবে না জেনেই সাগ্নিক ওকথাটা বলল।

হামরু, পূরণ এবং আর যারা ছিল সবাই এসে করুণ মুখে ঘিরে ধরল সাগ্নিককে। হামরু ওর পায়ে পড়ল। তার চোখে জল। সবাই অসহায়ের মতো বলে উঠল, মাষ্টরবাবু।

সাগ্নিকের চোখেও জল। তার কণ্ঠও করুণ, তবে দৃঢ়। সে বলল, না, আর নয়। অনেক ভুল তোরা করেছিস। বোঝালেও বুঝতে চাসনি। তার জন্য যে কি কষ্ট আমাকে পেতে হয় সেটা তোরা বুঝতেও পারিস না। একটু স্থির থেকে অভিমানের সুরে আবার বলল সে, কেন রে, ভুল করবি তোরা, আর জ্বলে পুড়ে মরব কেন আমি? তোদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার ঘুম চলে যাবে কেন, কেন আমার স্বস্তি-সুখ-শান্তি নষ্ট হবে? এবার আর নয়। যদি জমি ফিরিয়ে আনতে পারিস তবেই আমার কাছে আসবি তোরা, নয়তো কোনো সম্পর্ক নেই।

ওদের সবাইকে ঠেলেঠুলে সাগ্নিক বেরিয়ে এসে টেস্ট-রিলিফের কাঁচা-রাস্তায় উঠল।

॥ দশ ॥

হামরুদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসার পরও সাগ্নিকের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হ'ল না। ওদের ওই সরলতা যা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর, সর্বনাশের শেষ সীমান্তে নিয়ে যেতে পারে ওদের, যেমন আজ দমনকে নিয়ে গেছে। যতই ভাবছে দমনের কথা, সাগ্নিকের মনের অবস্থা ততই যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। দমনের ধ্বংসের ছবিটা যতই সে স্পষ্ট হতে দেখছে ততই সে নিজেকেও বিপন্ন বোধ না করে পারছে না।

রাত্রে যথারীতি সে খাওয়া-দাওয়া করল, যথাসময়ে গিয়ে আশ্রয়ও নিল বিছানায়, কিন্তু ঘুম কোথায়? সারারাত জেগে-জেগে সে দমনের সর্বনাশের শেষ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে যেন।

পরের দিন যথাসময়ে সে ইস্কুলে গেল। ভাবল, পুতুলের সঙ্গে কথা বলে স্বস্তি পাবে। একটু পরে পুতুল এল, ওর পাশে বসল। তারপর সাগ্নিক একটু-একটু করে সব বলে গেল পুতুলকে, যা বলবার জন্য সে গুমরে মরছিল। নীরবে সব শুনল পুতুল, স্পর্শ করতে পারল সাগ্নিকের বর্তমান মানসিকতাকে। সব শুনে, সব বুঝে পুতুলও রীতিমতো ব্যথিত।

সাগ্নিক জানতে না-চাইলেও পুতুল তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছিল সে-সম্পর্কে শোনাল সবিস্তারে।

ইস্কুলে এসে স্বস্তি পাবে ভেবেছিল সাগ্নিক, একেবারে যে পায়নি তাও নয়, কিন্তু ইস্কুল ছুটির পর তার অবস্থা যে কে সেই। ভয় পায় সাগ্নিক। এমনটি তো তার আগে কখনো হয়নি। বরাবরই সে দেখে এসেছে পুতুলের সঙ্গে কথা বলার পর তার মনের অবস্থা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু আজ এমনটি হচ্ছে কেন? দমনের চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য তাকেও কোনো ভিন্ন পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে চায় নাকি?

কিন্তু দমনকে তার নিশ্চিত সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে কি করণীয় থাকতে পারে তার? জগতের কারো জন্যই কি সে কিছু করতে পারে? না, কিচ্ছুটি সে করতে পারে না। নিজের দারিদ্র্য-অসহায়তা-অসামর্থ্যকে অতিক্রম করে উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার কোথায়? জগতের কারো ব্যথা এতটুকু লাঘব করবার সামর্থ্য যার নেই, ওই হামরু-দমনদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে যাওয়াটা তার পক্ষে যে কেবল বেমানান হয়েছে তাই নয়, এতে তার ক্ষতিও হয়েছে যথেষ্ট। পুতুল এই সত্যটাই তাকে বারবার বোঝাতে চেয়েছে। সে নিজেও যে বোঝেনি এমন নয়। তবে আজ বুঝছে আরো মমে-মর্মে। আজ সে মর্মদাহে জ্বলে-পুড়ে শেষ হতে-হতে নিজেকে অনেক কথা বোঝাচ্ছে। হামরু-দমনদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছিন্ন করবার প্রতিশ্রুতি আজ সে নিজের কাছে বারবার ঘোষণা করছে।

তবুও এতটুকু স্বস্তি সে পায়নি। বরং ওদের সম্পর্কে ভাবব না

ভাবব না করেও সে ভাবল অনেক। আর নিজের অন্তর্দাহকে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলল, নিজের মন আর মস্তিষ্ককে কেবল বিধ্বস্ত করেই চলল। কী প্রয়োজন ছিল এর? তবুও এইভাবেই সে কাটাল একটা বিকেল, একটা রাত, আর পরের দিনের সকালটাও।

ইস্কুলে গিয়ে যখন পৌঁছল, ওর চেহারা দেখে পুতুল চমকে উঠল। বলল, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার, সাগ্নিকদা? ভেবে ভেবে কি নিজেকে শেষ করে ফেলতে চান?

না।

তাহলে সব ছাড়ুন তো এবার। সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিন।

সব চিন্তা বলতে?

হামরু-দমন-তুলসী, দমনের বিয়ে আর জমি-বিক্রি—এইসব।

সাগ্নিক করুণ হেসে বলল, ব্রজেন ঘোষ?

তাকেও মন থেকে তাড়াতে হবে।

আর আমার দারিদ্র্য, আমার দুর্বলতা? অসহায়তা, অসামর্থ্য?

পুতুল একমুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, ওদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা আপনি মিলিয়ে দেখছেন কেন? ওসব তো খুবই স্বাভাবিক, নিম্নবিত্ত প্রতিটি মানুষকেই অল্পবিস্তর এমনি সমস্যা জড়িয়ে থাকে।

সাগ্নিক কিছু বলল না, মুখে ম্লান হাসি নিয়ে বসে-বসে পুতুলের উচ্চারিত কথাগুলো মনে-মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

পুতুল স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলতে থাকে, সাগ্নিকদা, আমার অনুরোধ রাখুন, শিউলী গাঁ সম্পর্কে, শিউলী গাঁয়ের মানুষ সম্পর্কে এবার আপনি ক্ষান্ত হ'ন। নির্বিকার হয়ে যান। স্বস্তি পাবেন, শান্তি পাবেন তাহ'লে।

পুতুলের এই মতের সঙ্গে সাগ্নিক চিরকালই একমত ছিল। কিন্তু সে কোনোদিনই দৃঢ়তার সঙ্গে ওই সত্যকে আঁকড়ে ধরেনি। এবার সে দৃঢ় হতে চেষ্টা করবে। শিউলী গাঁ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার হতে চেষ্টা করবে সে। দমন-হামরু বা সাঁওতালদের ভালোমন্দ নিয়ে সে আর ভাববে না। ভাববে না ব্রজেন ঘোষ সম্পর্কেও। সবার ভাবনা থেকে এবার সে মুক্তি

নেবে, মুক্তি নিয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে সে গুটিয়ে ফেলবে। শামুকের মতো নিজের খোলসের মধ্যে এবার নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে সে।

ব্রজেন ঘোষ থাকুন ব্রজেন ঘোষ হয়ে, হামরুরা নিজেদের খেয়ালে ভেসে চলুক, দমন তার নির্মম ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে-কষতে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলুক, শিউলী গাঁ তার চিরাচরিত মামুলি পথ ধরে ছুটে চলুক অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে। সাগ্নিক এসব নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না। সে-ও এগিয়ে যাবে তার নিজস্ব-নির্দিষ্ট পথে। দমনের প্রতি কোনো বাড়তি মমতা নয়, সাঁওতালদের প্রতি কোনো সহানুভূতি-সমবেদনা নয়, ব্রজেন ঘোষের প্রতি কোনোরকম বিদ্বেষ-বিরূপতা নয়, শিউলী গাঁয়ের প্রতি কোনো অন্তরঙ্গতা নয়, কিচ্ছু নয় আর। এবার শুরু হোক সাগ্নিকের নীরব হয়ে যাওয়ার পালা। দমন-হামরু আর গোটা সাঁওতাল পল্লী, আর ব্রজেন ঘোষের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে, সবার সম্পর্কে সব ভাবনা থেকে অবসর নিয়ে এবার সে ফিরে যাবে এক স্বস্তিময় জীবনে। শিউলী গাঁয়ে আর সে নিজেকে প্রকাশ করবে না, বিস্তৃত করবে না।

এইসব ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন, নীরস নিদ্রাহীন কয়েকটা রাত, নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাক্লিষ্ট সময়ের অজস্র ঘণ্টা-মিনিট-মুহূর্ত-পল-অনুপল। অবশেষে একদিন সাগ্নিকের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। সে বুঝল, পথটা বন্ধুর, কাজটা কঠিন, একরকম দুরূহই বলা চলে। সাগ্নিক অনুভব করল, মনে-মনে যত কথাই ভাবা যাক না কেন, বাস্তবে এটা সম্ভব নয়, বিশেষ করে সাগ্নিক এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে তো সম্ভব নয়ই। বরং সে যদি প্রথমদিন থেকেই শিউলী গাঁয়ের জটিল আবর্ত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত এবং সেইভাবে নিজের নীরব অস্তিত্ব গড়ে তুলতে পারত, সেটা হ'ত আলাদা ব্যাপার। কিন্তু একটানা দশ বছর ওদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে, মরমী আপনজনের মতো মেলামেশা করে, আজ যদি হঠাৎ সে সোচ্চারে বলে ওঠে, তার আর ওদের মধ্যে অপরিচয়ের এক সুদৃঢ় দেওয়াল গড়ে তুলবে, আর সেই প্রাচীরের এক-

পাশে এক অন্ধকার কোণে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে, সেটা কি সম্ভব ?

না, সম্ভব না। শুধু সাগ্নিক কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব না। মানুষ যেখান থেকে একটা জীবন শুরু করে, দশ বছরের প্রায় একটি যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে কি আবার সেখানে ফিরে যেতে পারে ? ফিরে গিয়ে সেখান থেকে আবার একটি নতুন জীবন শুরু করতে পারে ? যেখান থেকে সাগ্নিক তার শিউলী গাঁয়ের জীবন শুরু করেছিল, মাঝখানের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালো লাগা-না-লাগা উত্তেজনায় ভরা দশ বছরের অসংখ্য ঋতু-দিন-রাত আর সংখ্যাতীত প্রহর-মুহূর্তগুলোকে অস্বীকার করে, কিংবা মনের পাতা থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে দিয়ে আর কি সে সেখানে ফিরে যেতে পারে ? না, পারে না, সাগ্নিক পারে না, কেউই পারে না।

আর কেউ যদি তবুও তা করতে চায়, করতে যায়, নতুন বিপদে পড়তে হয় তাকে। অহর্নিশির এক দ্বন্দ্ব তাকে কুরে-কুরে খায়। এই মানসিক যন্ত্রণা আজ সাগ্নিককে পর্যুদস্ত করছে, তাকে কুরে-কুরে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত প্রতিজ্ঞা করছে শিউলী গাঁ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে থাকবে, আর আশ্চর্য, সর্বদা শিউলী গাঁ সম্পর্কেই ভেবে চলেছে। প্রতিজ্ঞারা তো আসলে ভাবনাদেরই সন্তান। যতবার প্রতিজ্ঞা ততবার ভাবনা, আর যতবার ভাবনা ততবারই আত্মদহন। এই প্রতিজ্ঞা আর ভাবনার খেলা খেলতে-খেলতেই সে তার গ্লানি আরো বাড়িয়ে ফেলেছে। ওরা হাজারো গুণ তীব্র হয়ে সাগ্নিকের দেহে মনে মস্তিষ্কে নখরাঘাত করছে।

এই ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খেতে-খেতে পরের দিন ইস্কুলে গিয়ে সে পুতুলকে সব বলল।

কিন্তু সাধ্য কী পুতুলের, সাগ্নিকের মনের গুমট দূর করবে ? বুদ্ধিমতীর মতো শুধু বলতে পারল, একটা নতুন পথের সন্ধান করতে হবে সাগ্নিকদা।

কে সন্ধান করবে, আমি ?

আপনি একা কেন? আপনি করুন, আমিও করছি।

বেশ।

ইস্কুল ছুটি হ'ল। বিকাল পার হয়ে গোধূলির ধূলিধূসরতা পেরিয়ে শিউলী গাঁয়ে নেমে আসছে সন্ধ্যার ম্লানতা। সাগ্নিক টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় ঘুরে-ঘুরে ভেবে চলেছে। উত্তীর্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে কাঁচা-রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে দেখল দীঘার সমুদ্র সৈকত থেকে উড়ে-আসা হাওয়া আজ আর মনোরম নয়, তার মধ্যে সে কণামাত্র স্নিগ্ধতা খুঁজে পেল না। সাগ্নিক বুঝল, পথের সন্ধান এখনো দূর-অস্ত।

অতিবাহিত হ'ল আরো-একটি বিনিদ্র-রজনী। স্বস্তিহীন দীর্ঘায়ু এক ছুটির রবিবার। কিন্তু মুক্তির সন্ধান সে পায় না। আরো-একটি নিদ্রাহীন গ্রীষ্ম-রজনীর শেষ প্রহরে এসে মস্তিষ্ক যখন তার দারুণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মন একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়, তখন তার শ্রান্ত অবসন্ন মনে ভেসে ওঠে ট্রান্সফারের কথা, ট্রান্সফার নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা। সাগ্নিক কেঁপে ওঠে। দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম তার ট্রান্সফারের কথা মনে এল, ভাবল ট্রান্সফার নিয়ে শিউলী গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা।

পরের দিন ইস্কুলে গিয়ে সে পুতুলকে ট্রান্সফারের কথা বলল, পুতুল, দেখ তো এটাই বোধহয় আমার মুক্তির পথ!

পুতুল সাগ্নিকের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে সব শুনল। দশ বছরের দীর্ঘ দিনগুলিতে তিলে-তিলে গড়ে ওঠা পুতুলের অনুরক্ত বন্ধুত্ব স্বভাবতই এতে খুশি হয় না। কিন্তু পুতুল হ'ল এমন মেয়ে যে নিজের ভালো লাগার বিনিময়ে সাগ্নিকের কোনোরকম অবক্ষয় দেখতে চায় না। অতএব সাগ্নিকের মুখে ট্রান্সফারের কথা শুনে সে নিজের কথা ভাবল না, সাগ্নিকের কথা ভাবতে-ভাবতেই বলল, এই পথে মুক্তি পাবেন তো ঠিক?

বিশ্বাস, আমার! সাগ্নিক ম্লান হাসল।

হ্যাঁ।

জানি না পুতুল।

কেন জানেন না ?

পালিয়ে গেলে কি মুক্তি মেলে পুতুল ?

সাগ্নিকদা ! পুতুল চমকে উঠল।

এটা কি আসলে পলায়ন নয় পুতুল ?

বিচারটা ওভাবে করবেন না, সাগ্নিকদা।

তবে কিভাবে করব ?

তাহলে তো বলতে হয়, পুতুল চিন্তিত আর করুণভাবে বলে, এখানে থেকে যে-নির্বিকার থাকার চেষ্টা আমরা করছি সেটা তো পলায়ন—

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সাগ্নিক বলে, তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না পুতুল।

সাগ্নিকদা।

আমার যন্ত্রণা তো ওখানেই পুতুল।

আমি বুঝি সাগ্নিকদা।

তাই তো তোমার কাছে এসে মনটাকে মেলে ধরি, সান্ত্বনা খুঁজি।

আমি বলি কি—

বলো, বলো।

আমরা নিম্নবিত্ত গরিব মানুষ, কায়ক্লেশে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখি—

থামলে কেন, বলে যাও।

ওইসব পলায়ন-টলায়ন আমাদের মনে না-আনাই উচিত।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও—

আপনি এখানে একটা আবর্তে জড়িয়ে পড়েছেন।

আবর্ত ! হয়তো তাই। বেশ, তারপর ?

পুতুল সাগ্নিকের মুখে চোখ মেলে বলে চলল, জীবনকে বা জীবনের কোনো পর্যায়ের কোনো ঘটনাকেই অত রূঢ় অর্থে নেবেন না। আমরা জানি জীবনে সমস্যা আছে, থাকবেও, তাই বলে তো সব শেষ হয়ে গেল

ভাবলে চলবে না। আজ একটা সমস্যা এসে আপনাকে পর্যুদস্ত করছে ঠিকই, কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাবে সমস্যাটি আর তত বড় নেই। বা অন্য কোথাও গেলে হয়তো দেখা যাবে ওই সমস্যাটি আর আপনাকে কুরে-কুরে নিঃশেষ করছে না। তা যদি না হ'ত তবে মানুষ পাগল হয়ে যেত, বেঁচে থাকতে পারত না! আজ যে-সমস্যা আপনার মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছে, অন্য কোথাও চলে গেলে ভিন্ন পরিবেশে সময়ের আস্তরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-সমস্যা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে। তখন আপনিও স্বাভাবিক হওয়ার সুযোগ পাবেন। তাই আমি বলি কি—

বলো, বলো পুতুল।

নিজের কথা, বিধবা মায়ের কথা, ভাইবোনদের কথা, সমগ্র অস্তিত্বের কথা ভেবে, এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। অতএব আমার মতে, আপনি ট্রান্সফারের জন্য চেষ্টা করুন সাগ্নিকদা।

পুতুলের কথায় সাগ্নিক বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করতে না-পারলেও কিছুটা যুক্তি খুঁজে পেল। হয়তো খানিকটা সান্ত্বনাও। ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেলেও কি সম্পূর্ণ মুক্তি আসবে? যেখানে যাবে সেখানেও যে ব্রজেন ঘোষ থাকবেন না, হামরু-দমন-তুলসীরা থাকবে না, এমনটি না-ও হতে পারে। পুতুল পরিষ্কার বলল, ওরা থাকবে, তবে আপনি শুরু থেকেই সেখানে সাবধানে থাকবার সুযোগ পাবেন। পুতুলের এ-কথায়ও সাগ্নিক যুক্তি খুঁজে পায়। এই যুক্তিটুকু এবং আংশিক সান্ত্বনাটুকু নিয়ে সাগ্নিক ইস্কুল থেকে ফিরল।

পুতুল হয়তো ঠিকই বলেছে। নতুন জায়গায় গিয়ে প্রথম থেকে চেষ্টা করতে থাকলে তার অক্ষম দুর্বল অসহায় ব্যক্তিত্ব নিজের জন্য এক নির্লিপ্ত তথা ক্লীব বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম হলেও হতে পারে। আর সেই বৃত্তের মধ্যে দিবারাত্রের খেলাকে আবদ্ধ রাখতে পারলে অসমর্থ মানুষ স্বস্তির নিশানা খুঁজে পেলেও পেতে পারে। অতএব দূরের সেই বৃত্তই হোক সাগ্নিকের মুক্তির উপায়।

তবুও সাগ্নিক ভাবল, শেষবারের মতো ভেবে দেখল, সেই ক্লীব বৃত্ত

এখানে, এই শিউলী গাঁয়ে, রচনা করার ন্যূনতম সুযোগও আছে কিনা। না, তা আর সম্ভব নয়। শিউলী গাঁ যে তার দশ বছরের জননী, ধাত্রী। শিউলী গাঁয়ের গন্ধ যে সে দশ বছর সমানে শুঁকছে। এর মৃত্তিকা ওর সর্বাঙ্গে তিলক পরিয়ে দিয়েছে। এখানকার প্রকৃতির শ্যামলিমা আর বৈচিত্র্য—গ্রীষ্মের রূঢ়তা, বর্ষার ক্লেদ, শরতের নির্মলতা, হেমন্তের স্নিগ্ধতা, শীতের রুক্ষতা, বসন্তের কোকিল-ডাকা সকাল-সন্ধ্যা, সবই যে ওর জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। শিউলী গাঁয়ের স্নিগ্ধ বাতাস যে দীর্ঘ দশ বছর ধরে ওর ভেতরের দূষিত বায়ুকে নিষ্কাশন করেছে, ওর প্রাণ-পিণ্ডকে সতেজ করেছে। জীবন হয়েছে পরিপূর্ণ। এই শিউলী গাঁয়ের আঙিনাতেই সে যে অন্তর দিয়ে দেখেছে চিনেছে জেনেছে ওই তুলসী-দমন-হামরুদের মতো মাটির সন্তানদের। এখানেই সে মুখোমুখি হয়েছে তার জীবনের করুণ আর রূঢ়তম অভিজ্ঞতার,—ব্রজেন ঘোষের। এখানেই সে খুঁজে পেয়েছে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুহৃদকে, পুতুলকে। এই মাটিতেই দেখেছে অযুত নিযুত শস্যপ্রাণদের জন্ম-শৈশব-কৈশোর-যৌবন-পরিণতি। এরা সবাই সাগ্নিকের সাথে কথা কয়। এদের সবাইকে অস্বীকার করে নির্লিপ্ততার দুর্গ? হয় না, হতে পারে না। অতএব চিন্তার নদী-সমুদ্র-পাহাড় পেরিয়ে অবশেষে সে ট্রান্সফার নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হ'ল।

দশ বছর একটানা চাকরি করার পর এই প্রথম ট্রান্সফার চাইবে সে। পাবে না কি? মিউচ্যুয়াল ট্রান্সফার বা পারস্পরিক বদলি বলেও তো একটা প্রথা চালু আছে। চেষ্টা করলে সে কি একটা চান্স পাবে না?

খোঁজ-খবর নিতে একদিন সে মেদিনীপুরে গেল। সাব-ইনস্পেক্টর অব স্কুলস-এর অফিসে গিয়ে ট্রান্সফারের জন্য একখানা দরখাস্তও জমা দিল। মিউচ্যুয়াল ট্রান্সফারে ওর আগ্রহের কথাও তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে ভুলল না।

এইভাবে একদিকে সে ট্রান্সফারের কথা ভেবে চলেছে, তার জন্য চেষ্টা করে চলেছে, অন্যদিকে মনটাকে অপেক্ষাকৃত শক্ত করে এক কষ্টসাধ্য

বেদনাময় নির্লিপ্ততার আবেষ্টনী রচনা করে, তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে বাস করছে শিউলী গাঁয়ে, চাকরি করে চলেছে শিউলী প্রাইমারী ইস্কুলে।

শিউলী গাঁ? সাগ্নিকের নির্লিপ্ততায় সে-কি ঘুমিয়ে পড়ল? একজন পরাশ্রিত পরান্নভোজী বাইরের মানুষের নির্লিপ্ততায় সে-কি তার চলার পথ পরিবর্তন করল? না, সে কিছুই বরল না, পরিবর্তনের কোনো ছোঁয়া তার গায়ে লাগল না। ওই তো শিউলী গাঁ এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব-নির্দিষ্ট পথে, যে-পথে যেমন করে সে চলে এসেছে এতদিন, যে-পথে যেমন করে সে চলবে; কে জানে চিরকাল কিনা।

হামরুরা দমনের জমি পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। পারার কথাও নয়। ব্রজেন ঘোষ সে-জমির দখল নিয়ে নিয়েছেন। তাপদগ্ধ বৈশাখী-দিনের প্রথম বর্ষণের সাথে সাথে ব্রজেন ঘোষের লাঙল দমনের জমির বক্ষদীর্ণ করে তাতে বড় বড় অক্ষরে খোদাই করে দিয়েছে ব্রজেন ঘোষের নাম। দ্বিতীয় বর্ষণ-শেষের অনুকূল জো-তে ব্রজেন ঘোষ নিজের হাতে ধান বুনে সে-অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

আর দমন? তার বাপলাও যথাসময়ে হয়ে গেছে। নতুন বউকে পেয়ে সে তুলসীর শোক ভুলেছে কিনা তা কেউ বলতে পারে না। তবে একান্তে তুলসীর কথা ভাববার সময়-সুযোগ বোধহয় সে এখন আর পায় না। ছটকায় পটিয়া পেতে পড়ে থাকার অবকাশও এখন তার নেই।

সে আর তার নতুন বউ দু'জনেই সকালে পান্তা খেয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে। কাজে মানে অন্যের কাজে, অন্যের খেতে-খামারে পুকুরে-বাড়িতে। কোনোদিন দু'জনে একসাথে একজায়গায় কাজ করে, আবার কোনোদিন আলাদা জায়গায় আলাদা হয়ে কাজে যায়। বিকালে দু'জনে ফিরে আসে। একসাথে কাজ করলে একসঙ্গে ফিরে আসে। আলাদা-আলাদা জায়গায় কাজ হলে আগে-পিছে হয়ে যায়। যে আগে ফেরে সে ওই শিরিষমোড়ে দাঁড়িয়ে আর-একজনের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে রাম মাইতির মুদিখানায় ঢোকে। দমন গামছার খুঁট থেকে দুটি

ছোট্ট শিশিবার করে বাড়িয়ে ধরে, দশ পয়সার সর্ষের তেল, দশ পয়সার কেরোসিন কেনে। আর কেনে তিন পয়সার লঙ্কা, দু'পয়সার লবণ, পাঁচ পয়সার মোতিহার আর কিছু কাঁকর-মেশানো মোটা সস্তা চাল বা খুদ। জীবনধারণের একান্ত আবশ্যকীয় এই জিনিসগুলো খরিদ করে গামছার খুঁটে বেঁধে অথবা হাতে ঝুলিয়ে ওরা বাড়ি ফেরে। ঘরে গিয়ে রান্না করে, পান্তা খায়, শোয়, ঘুমোয়। কোথাও কাজ থাকলে বা পেলে পরের দিন এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। না-থাকলে বাড়িতে বসে থাকে, সেদিন পান্তা জোটে কিনা বলা মুশকিল।

তেঁতুলতলার সেই বিশ্রাম? হায়রে! তুলসী নেই, সে-তেঁতুলতলাও নেই। সে-বিশ্রামও আর নেই। আর হাড়িয়া? পরপর কয়েকদিন ধরে দু'জনের কাজ চলতে থাকলে, হাতে টাকা-পয়সা কিছু জমলে, একসঙ্গে কখনো-সখনো দু'জনে কালিয়াচকের হাড়িয়া ভাটিতে গিয়ে দু এক জাম খেয়ে আসে।

অথচ ক'দিন আগে তুলসী যখন বেঁচে ছিল, তখন দমন কেমন ছিল, কেমন ছিল ওর জীবন, জীবনযাপনের রূপরেখা ও ছন্দ? অন্যের কাজে দমন যেত না, তুলসী ওকে যেতেই দিত না। দমন তো সেদিন নিজের চাষবাস গরুবাছুর আর ঘর-গেরস্থালী নিয়ে হিমসিম খেত। দমন সেদিন ওই গামছার খুঁটে বেঁধে বা হাতে ঝুলিয়ে দশ-পাঁচ পয়সার বাজার করত না। তুলসী প্রতি শনিবার কালিয়াচকের হাটে গিয়ে ঝুড়িতে করে সারা সপ্তার বাজার একসঙ্গে করে নিয়ে আসত। না, হাড়িয়া ভাটিতে গিয়ে কালেভদ্রে এক-আধ জাম খেয়ে সেদিন ওকে হাড়িয়ার নেশা মিটাতে হ'ত না। তুলসী ওকে হাড়িয়া ভাটিতে যেতেই দিত না। দমনের জন্য উৎকৃষ্ট হাড়িয়া তৈরি করে তুলসী সবসময়ে ঘরে মজুত রাখত। দমন যখন খুশি খেত, যত পারত খেত।

এইভাবে এগিয়ে চলেছে দমন আর সাঁওতালপল্লী। এগিয়ে চলেছে শিউলী গাঁ। সাগ্নিক? সে এগিয়ে চলেছে কি পিছিয়ে চলেছে তা সে বুঝতে পারে না। তবে ট্রান্সফারের জন্য সে চেষ্টা করে চলেছে। এটাকে

এগিয়ে চলা বললে সে এগিয়ে চলেছে, পিছিয়ে যাওয়া বললে সে পিছিয়ে যাচ্ছে।

দেখতে-দেখতে ইস্কুলে গরমের ছুটি এসে যায়।

শুধু শিউলী প্রাইমারী ইস্কুলেই নয়, এখানকার ছোট-বড় সব ইস্কুলেই বছরে চারটি বড় ছুটি থাকে। গরমের ছুটি, বর্ষা বা চাষের ছুটি, পুজোর ছুটি, বড়দিন বা ধানকাটার ছুটি। একমাত্র পুজোর ছুটি বাদে অন্যান্য ছুটির অধিকাংশ দিন সাগ্নিক এতদিন শিউলী গাঁয়ে কাটিয়ে এসেছে। শিউলী গাঁ তাকে জাদু করেছিল যে। এই প্রথম সাগ্নিক সেই জাদু-গণ্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার দৃঢ় প্রয়াস পেল। প্রায় গোটা গরমের ছুটিটা সে উলুবেড়িয়াতে কাটাল। অবশ্য ট্রান্সফারের খোঁজে মাঝে-মধ্যে সে মেদিনীপুরে এসেছে আর তখন এক-আধ রাত শিউলী গাঁয়েও থেকেছে। তবে আগের মতো নয়, বিদেশী কোনো মুসাফির যেমন কোনো সরাইখানায় রাত কাটায়, কতকটা তেমনিভাবে। এই একমাসের মধ্যে পুতুলের সঙ্গেও তার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।

গরমের ছুটির পর যেদিন ইস্কুল খুলল সেদিন কী প্রবল বর্ষণ! বর্ষা দেখে খুশি হয় সবাই। শুরু থেকে বর্ষার লক্ষণটা শুভ মনে হ'ল সকলের কাছে।

মাঠে-মাঠে শুরু হয় হলকর্ষণের পালা। সবার ঘর থেকে লাঙল বেরিয়ে পড়ে মাঠে। সকাল থেকেই মাঠে-মাঠে চাষীর দল তাদের লাঙল-গরু নিয়ে হাজির। সর্বত্র চলে এই মাটি-ভাঙার পালা, ঘুমিয়ে-থাকা মাটির বুকে আঘাত করে তার ঘুম ভাঙানোর পালা। সবার সব জমিতেই এই সময়ে লাঙল পড়বার কথা।

পরবর্তী বর্ষণ-শেষে শুরু হয় মাঠে-মাঠে ধানবোনা আর বীজতলা তৈরির কর্মকাণ্ড। ধানচাষ দু'ভাবে হয়—বপন আর রোপণ। রোপণের সময় এখন নয়, মৌসুমী বর্ষা না-এলে ধান রোয়া হয় না। তবে যারা বুনতে চায় এই হ'ল তার সময়। এই দ্বিতীয় বর্ষাই হ'ল ধান্যবপনের উপযুক্ত সময়। ব্রজেন ঘোষের জমি অনেক বেশি। রোপণের সময়ে

একসঙ্গে অত জমিতে রোপণের কাজে, বিস্তর অসুবিধা। তাই অনেক জমিতেই ব্রজেন ঘোষ এই সময় ধান বুনে দিলেন। দমনের সেই পাঁচ বিঘেতেও এই সময় ব্রজেন ঘোষ ধান বুনে দেন।

বীজতলা? বীজতলা হ'ল মরসুমী তথা মৌসুমী বর্ষার অনুকূল জোতে রোপণযোগ্য ধান্যশিশুদের জন্মভূমি, ধাত্রীভূমি, শৈশবাগার—চারা তৈরির ক্ষেত্র, খামার। মৌসুমী বর্ষা আসা পর্যন্ত এখানেই ধানের চারারা বড় হতে থাকে।

মৌসুমী বর্ষার শুভাগমন মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় চাষ-পর্বের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড। মাঠ ভরে যায় চাষীতে, লাঙলে, গরু-মহিষে। চাষীরা কেউ লুঙ্গি-পরা, কেউ গামছা-পরা, কেউ-বা হাফপ্যান্ট-পরা। কারো মাথায় টোকা, কারো মাথায় গামছা, কারো মাথায় কিছু নেই। কেউ বিড়ি খাচ্ছে, কেউ শুধু মোতিহার, আবার কেউ-কেউ খৈনিও। কেউ চাষ করে সুস্থ সবল গরু-মহিষ দিয়ে, আর কেউ চাষ করে দুর্বল রুগ্ন গোধনের সাহায্যে। যার যা সম্বল, তাই তো তার মূলধন। সেই মূলধন দিয়েই তো তাকে চাষ করতে হবে। সেই মূলধন নিয়ে সবাই আজ ব্যস্ত, সৃজনের এই বিপুল কর্মযজ্ঞে নিয়োজিতপ্রাণ। সূর্যোদয়ের বহুপূর্বে ওরা গৃহ আর শয্যার মায়া ত্যাগ করে চলে আসে স্বর্গের চেয়েও মহীয়সী অন্নদাত্রী ভূমি-জননীর কর্দমাক্ত আঙিনায়। সূর্যোদয়ের আগে এলেও ওরা ঘরে ফেরে সেই অপরাহ্ণে, গোধূলির ধূলিধূসরতা যখন পৃথিবীতে ম্লান আস্তরণ বিছাতে আরম্ভ করে, যখন ওরা শ্রান্ত বোধ করে।

সকালের বা দুপুরের খাবার ওরা মাঠে বসেই খেয়ে নেয়। বয়োবৃদ্ধরা, মেয়েরা কিংবা কিশোর বালকেরাই বাড়ি থেকে খাবার বয়ে আনে। অ্যালুমিনিয়ামের ডিসে করে গামছায় বেঁধে, হাতে ঝুলিয়ে ভারে করে, অথবা মাথায় করে ওরা খাবার বয়ে আনে। খাবার মানে পান্তা অথবা রুটি। খাবার খেয়ে বেশ-একটু বলীয়ান হয়ে ওরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে, সৃষ্টি আর উৎপাদনের অনিবার্য কর্মকাণ্ডে আবার আত্মনিয়োগ করে ওরা।

একদিকে চলে এই হলকর্ষণ—একদল লোক জলমগ্ন জমির ওপর কর্দমের নরম শয্যা তৈরি করে চলে, অন্যদিকে আর-একদল লোক বীজ-তলা থেকে সযত্নে ধান্য-শিশুদের তুলে এনে সেই কর্দমের শয্যায় তাদের স্থাপন করে চলে সারিবদ্ধভাবে, ছন্দোবদ্ধভাবে, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। পূর্ণোদ্যমে সবাই মগ্ন হয় ধান্য-রোপণের এই শ্রম-সাপেক্ষ পরম রমণীয় উৎসবে।

ইস্কুলে এ-সময়ে দু'তিন সপ্তার লম্বা ছুটি। একে বর্ষার ছুটিও বলে, আবার চাষের ছুটিও। যে-নামেই একে অভিহিত করা হোক না কেন, চাষের কাজে বড়দের সাহায্য করবার ছোটদের তথা ছাত্রদের এই ছুটি, বাড়ির অন্যান্যদের সাহায্য করবার জন্য বড়দের, তথা শিক্ষকদের এই ছুটি।

সাগ্নিক এখানকার লোক না, তার কোনো চাষও নেই। তবুও এই ধান-রোপণ-উৎসব ওর বড় প্রিয়, বড় ভালো লাগে ওর। এই ছুটিতে সে একটি দিনের জন্যও বাইরে যায় না। বসুধার গর্ভসঞ্চারের এই পরম পবিত্রক্ষণে সে প্রাণভরে উপভোগ করত শিউলী গাঁয়ের কর্দমাক্ত মাটির গন্ধ। এবার কিন্তু তা হ'ল না। শিউলী গাঁয়ের মাটির গন্ধ এবার ওকে ধরে রাখতে পারল না। সব আকর্ষণ অস্বীকার করে, সব বন্ধন শিথিল করে ছুটি ঘোষিত হতেই এবার সে উলুবেড়িয়াতে চলে গেল। এবং পুরো ছুটিটাই প্রায় সে সেখানে কাটাল। তার চোখের আড়ালেই তার সবচেয়ে প্রিয় ধান্যরোপণ-উৎসব শেষ হ'ল এবার।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় বর্ষণ-শেষের অনকূল জো-তে যেসব জমিতে সবাই ধান বুনেছিল, সেসব জমির ধানগাছগুলো এতদিন সবার অনাদর আর অবহেলায় একটু-একটু করে বড় হচ্ছিল। মৌসুমী-বর্ষার ধারাবর্ষণে তারা যেন সঞ্জীবনী মন্ত্রের স্পর্শ পায়, তারপর মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। ওইসব জমিতে এই সময় আবার চাষ দিতে হয়। মাটি ভেঙে কিশোর চারাগাছগুলোকে গা মেলবার সুযোগ করে দিতে হয়। ওদের মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য চাই রসদ। সেই রসদের অনেকটাই থাকে মাটির গহ্বরে। সেই মাটির বক্ষ দীর্ণ করে ওদের রসদ আহরণের পরিস্থিতি গড়ে দিতে

হয়। তাই তো সবাই সবার বোনা-জমিতে এই সময় চাষ দেয়। দুই বা তিনবার চাষ দিতে হয়। হাঁা, ব্রজেন ঘোষ তার সব বোনা-জমিতে সঠিক পদ্ধতিতে চাষ দেন। দমনের পাঁচ বিঘেতে চাষ দিতে ভোলেন না ব্রজেন ঘোষ। মৌসুমী-বায়ুতাড়িত বর্ষা আর মরসুমী চাষ পেয়ে দমনের জমির ধানের চারাগুলিও হু-হু করে বাড়তে বাড়তে আকাশ স্পর্শ করবার জন্য ক্রমেই ঊর্ধ্বে মাথা তুলতে থাকে।

কী রোয়া, কী বোনা, সব জমিই একদিন সবুজ বর্ণে রঞ্জিত হয়। খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত বিশাল মাঠে কে যেন বিপুল একখণ্ড সবুজ আস্তরণ বিছিয়ে দেয়। মাঠ ভরে যায় অসংখ্য সবুজ প্রাণের বন্যায়। বিশাল প্রান্তরের বক্ষজুড়ে যেন সবুজের মেলা বসে। বড় মনোরম, বড় স্নিগ্ধ, বড় অনির্বচনীয় এই সবুজের মেলা, সবুজ প্রাণের বন্যা। চারাগুলোর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের দেহে যেন সবুজ সৌন্দর্যের ঢল নামে। গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ সেই ধূসর-লালচে মাটির বুকে যে এত বিপুল সবুজপ্রাণের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে, দুদিন আগে ওই জমিগুলি দেখে কেউ তা অনুমান করতে পারত না। অথচ ওই সবুজ প্রাণগুলি আসলে ওই ধূসর-লালচে জমিরই সন্ততি!

জন্মের পর শৈশব, শৈশবের পর কৈশোর, কৈশোরের পর যৌবন, আর যৌবনের পর পূর্ণতা। সবুজ ধান্যপ্রাণগুলিও প্রকৃতির এই অমোঘ-বিধানের ব্যতিক্রম না। ওরাও একদিন শৈশব-কৈশোরের বিস্তীর্ণ অধ্যায় অতিক্রম করে যৌবনের পথে পা বাড়ায়। শরতের স্নিগ্ধতাই ওদের দেহে যৌবনের রঙ ধরায়।

সাগ্নিকের ইস্কুলে পুজোর ছুটি এসে যায়। প্রতিবার এই পুজোর ছুটিটাই সে উলুবেড়িয়াতে মায়ের সান্নিধ্যে কাটায়। ঘোষবাড়ির ছেলে-মেয়েরা, এমনকি ঘোষ-দম্পতিও ওকে পুজোর ছুটিটা শিউলী গাঁয়ে কাটাতে কত করে বলেন। খড়্গাপুরের রাবণপোড়া-উৎসব দেখতে ওকে অনুরোধ করেন হাজার বার। কিন্তু সাগ্নিক নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ —বছরের নির্দিষ্ট এই ছুটি সপ্তা সে মায়ের কাছেই থাকবে। তাই সে

এতদিন থেকেও এসেছে। সেই সাগ্নিক কিন্তু এবার পুজোর ছুটির অনেকগুলো দিনই শিউলী গাঁয়ে অতিবাহিত করল, অতিবাহিত করতে বাধ্য হ'ল। এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। পুজোর চার-পাঁচদিন সে উলুবেড়িয়াতেই ছিল। কিন্তু বাকি দিনগুলোতে তাকে প্রায়ই মেদিনীপুরে যেতে হ'ল। তাই শেষের দিকের অনেকগুলো রাতও সে শিউলী গাঁয়েই কাটিয়েছিল। ট্রান্সফার যে ওর চাই-ই চাই। মাঠের ধানেরা যত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে, ট্রান্সফার অর্ডারের প্রয়োজন ততই সে বেশি করে অনুভব করছে। সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে ট্রান্সফারের জন্য।

চাষীরা তাদের অন্নদাত্রী ভূমিলক্ষ্মীর বুক থেকে শেষবারের মতো জঞ্জাল পরিষ্কার করে যৌবনপ্রাপ্ত ধান্যদেহের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য নিড়ানীর অন্তিম আঁচড় বুলিয়ে চলে। চলতে থাকে শেষ পরিচর্যা, শেষ সজ্জা। শেষ সম্বল দিয়ে সবাই রূপবতী আসন্নগর্ভা ধান্যকন্যাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করে চলে। ধনাঢ্য চাষীরা তখনো একবার রাসায়নিক সার ছড়িয়ে তাদের শস্যক্ষেত্রকে অধিকতর ফলবতী করতে প্রয়াসী হয়, কীট-পতঙ্গ বিনাশী বিষাক্ত ওষুধ স্প্রে করে ধান্য-জননীদের শস্যরক্ষার ক্ষমতাকে বাড়াবার চেষ্টা করে। ব্রজেন ঘোষের জমিতে সবই হয়। দমনের সেই পাঁচ বিঘেতেও।

শরতের শেষলগ্নে ধানগাছগুলির সবুজ স্বাস্থ্যবতী শীর্ষে মঞ্জরীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। গর্ভভারে স্ফীত হতে থাকে সব ধানগাছের শিষগুলো। প্রভাতে শিশিরসিক্ত হয়ে থোকা থোকা পরিপুষ্ট ধানশিষ অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে বিকশিত হতে থাকে।

আসে হেমন্ত তার স্নিগ্ধ শিশির আর হিমেল বাতাস নিয়ে। গর্ভ-ভারাক্রান্ত ধান্যশীর্ষরা যখন শিশিরসিক্ত হয়ে এই হিমেল বাতাসে দোল খায় চাষীদের বুকও তখন আনন্দ আর আবেগে দুলে ওঠে। ধান্যশীর্ষরা যেন প্রসব-যন্ত্রণায় নত হয়ে পড়ছে। প্রসবিনীর যন্ত্রণা তাদের সবার অঙ্গে-অঙ্গে। একজন-দু'জন করে সবাই প্রসব করতে শুরু করে। এইভাবে সব পূর্ণগর্ভারাই একদিন জননী হয়ে যায়। পূর্ণ হেমন্তে মাঠ ভরে যায়

অগণিত নবজাতকের প্রাণময় বন্যায়।

আসে পৌষ। কচি-কচি ধান্যপ্রাণগুলি একদিন পরিণত প্রাণে পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। প্রান্তর পূর্ণ হয় পাকা ধানের বিকশিত সৌন্দর্যে। পাকা ধানের গন্ধে ভুরভুর করে মাঠের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত। পৌষের সেই গন্ধময় পাকা ধান যেন গানের সুরে সবাইকে ডেকে বলে, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে আয়। এই গান অবশ্য সবাই শুনতে পায় না। যারা পায় তারাও সবাই সমান শোনে না, কেউ শোনে কম কেউ বেশি। আসলে ওই পাকা ধান দেখতে দেখতে যারা ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল দেখতে পায় গানের সুরটা তাদের কানেই ভালো করে পৌঁছয়। যেমন ব্রজেন ঘোষ। আবার, ধানকাটার সঙ্গে সঙ্গে ধানের সাথে যাদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় তারা ওই গানের সুর শুনতেই পায় না বলা চলে।

ব্রজেন ঘোষের ধান এবছর ভালোই হয়েছে। প্রতিবছরই তার ভালো হয়। উনি বর্গা চাষীও নন, গরিবও নন। মহাজনের ঋণ শোধ করতেও তাঁর একটি ধান হাত ছাড়া হয় না। বরং তাঁর ঋণ শোধ করতে অনেকের অনেক ধানই তাঁর গোলায় আশ্রয় নেয়। সদ্‌গোপ-পাড়ার অনেকেরই কিছু-না-কিছু ধান হয়েছে। পূরণ-হামরুদের পাড়া? দু'-একজন ছাড়া আর কারো একছটাক জমি নেই। অতএব পাকাধানের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক শুধু মজুরির। পূরণের বা আরো দু'-একজনের এক-আধ বিঘে করে আছে বটে, তাতে চাষও হয় ঠিকই, তবে সেটা নেহাতই চাষ, তাতে ধান হয় না, সে-ধান ওদের কোনো গানও শোনায় না। নিজের জমিতে চাষ করবার সময়-সুযোগ-মূলধন কোথায় ওদের? জীবিকার্জনের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে করতেই ব্যয়িত হয় ওদের সব শ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা।

দমন? না, দমনের আর কোনো সমস্যা নেই। ব্রজেন ঘোষ তাকে পাঁচ বিঘের বদলে বিশ্ব-নিখিল লিখে দিয়েছেন। লিখে দিয়ে তার সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। সমস্যামুক্ত দমন তার নতুন বহুকে নিয়ে বিশ্ব-নিখিল ঘুরে-ঘুরে মজুর-কামীনের কাজ করে জীবিকা-

র্জন করে চলছিল। অবশ্য মহাপ্রাণ ব্রজেন ঘোষ এক-কালের সুখী দমনের এই পরিণতি দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছেন, তাই তিনি ওদের বিশ্ব-নিখিলকে ছোট করে দিযেছেন! নির্বোধ দমন আর তার নতুন বন্ধুকে অপেক্ষাকৃত কম-মজুরিতে নিজের জমিতে খাটিয়ে নিয়ে মহৎ এবং সুচতুর ব্রজেন ঘোষ ওদের উপকার করছেন। এক-নাগাড়ে ওরা এখন ব্রজেন ঘোষের জমিতে কাজ করে চলেছে। এমনকি তার নিজের সেই পাঁচ বিঘেতেও। জমিটা এখন কার, দমনেরই আছে, নাকি ব্রজেন ঘোষের হয়ে গেছে?

সাগ্নিক? শিউলী গাঁ-কে অস্বীকার করে সে শিউলী গাঁযে চাকরি করে চলেছে! কারো সাথেই বিশেষ একটা মেশে না, কথা বলে না। সাঁওতাল-পাড়াকে সে বেশি করে অস্বীকার করতে চায়। ওদের নিয়েই তার বেশি ভয়। ওদের দেখলে, ওদের কথা শুনলেই ওর মন ওরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, তার নিজের হাতে নির্মিত কাঁচের দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু তা তো সম্ভব না, সে ভালো করেই জানে, দুর্গ ভেঙে পড়লেও তলোযার হাতে বেরিয়ে পড়বার সাধ্য তার নেই। তাই তো সে ওদের এড়িযে চলবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে চলেছে। এইভাবে সে চাকরি করে চলেছে শিউলী গাঁযে! আর শিউলী গাঁয়ের আদিবাসী পাড়ায এক অনাগত অথচ আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করে যাচ্ছে। এইভাবে চলে বড়দিনের বন্ধ পর্যন্ত।

বড়দিনের বন্ধ মানে মোটামুটি ধানকাটার ছুটি। ছুটি তাই একটু আগেই হয় এবং কম করেও দু'-সপ্তা ছুটি থাকে। ইংরেজি আঠারোই ডিসেম্বর, বাংলা দোসরা পৌষ আর সাঁওতালীতে বার গেল পুষ ওরা বড়-দিনের ছুটি ঘোষণা করল। ছুটি ঘোষণা করে সাগ্নিক উলুবেড়িয়াতে চলে গেল। কিন্তু তার বহু-আকাঙ্খিত সেই ট্রান্সফার অর্ডার তখনো সে পায়নি।

॥ এ গা রো ॥

ডালা-ভর্তি পাকা-ফসলের কোনো আহ্বান ওদের কাছে না-পৌঁছলেও পৌষ ওদের কাছে অন্য একটা খবর অবশ্যই পৌঁছে দেয়। সেটা হ'ল পৌষ-সংক্রান্তি, যাকে ওরা বলে শাকরাত। সেই শাকরাত-পরবের বার্তা নিয়ে পৌষ এল শিউলী গাঁয়ের আদিবাসী পল্লীতে।

কিন্তু পৌষ আসার পর অন্যান্য বারের মতো ওদের তুমদা-রেগড়া বেজে উঠল না, সেরেঙ আর এনেচও শুরু হতে পারল না। হবে কি করে? তার বদলে যে বাখরচকের রায়বার এসে গেল তেসরা পৌষ। রায়বার ফরমান জারি করল: বাখরচকের হাড়াম অন্যান্যদের নিয়ে ওই পূর্ব-নির্ধারিত পনেরোই পৌষ বা গেলমোড়ে পুষ শিউলী গাঁয়ে আসবে, হামরুরা যেন গনং এবং অন্যান্য দেনা-পাওনা নিয়ে প্রস্তুত থাকে।

হামরু-পূরণ-দমনরা যেন এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। রায়বারের ঘোষণা শুনে ওদের যেন দুঃস্বপ্ন-দেখা-ঘুম ভাঙল। পাগলের মতো হয়ে গেল ওরা। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ব্রজেন ঘোষের পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ব্রজেন ঘোষ মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে পরমাত্মীয়ের ভঙ্গিমায় ওদের টেনে তুললেন। সখিকে ডাকলেন ব্রজেন ঘোষ। একহাতে ঘোমটা ঠিক করতে-করতে অন্য হাতে বিড়ি টানতে-টানতে বারান্দায় আসে সখি। ব্রজেন ঘোষের ইঙ্গিতে সে বারান্দার এককোণে খেজুরের পাতার একটি চাটাই পেতে দেয়। ব্রজেন ঘোষ হাসিমুখে ওদের বসতে বললেন। ওরা বসল।

সখি এক অদ্ভুত মানুষ। সে ব্রজেন ঘোষের এক জ্ঞাতির ছেলে। অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে ব্রজেন ঘোষের বাড়িতে আশ্রয় পায়। সেই তখন থেকেই সে ঘোষ-বাড়িতে আছে। জন্মের সময়ে তার মধ্যে কিছু কিছু মেয়েলী বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী কালেও সেগুলো শুধু আছে নয়, ক্রমশই বেড়েছে। সে ধুতিই পরে, তবে মেয়েদের মতো

করে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে ; কাছা দেয় না। তার ভীষণ লজ্জা ! এমনকি
সে নাকি কানেও একটু কম শোনে। এসব মেয়েলী গুণ থাকা সত্ত্বে
সে কিন্তু বিড়ির নেশায় প্রচণ্ডভাবে আসক্ত। তবে সখির আর-একটা
বিশেষ গুণ আছে। সে খুব পরিশ্রম করতে পারে আর চাষবাস, গরু
বাছুরের তদারকির সব কাজই করতে পারে নিপুণভাবে। চাটাই পেতে
দিয়ে সখি চলে গেল।

ব্রজেন ঘোষ নিজের ঈজিচেয়ারে বসে, চাদরের ভেতর দিয়ে হাত
ঢুকিয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে অনেকগুলো বিড়ি আর একটা দেশলাই
বার করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে
বললেন, অদেরকে একটুকু চা খাতে দিবেনি ?

ঘোষগিন্নী রান্না ঘরে গেলেন চায়ের কথা বলতে।

হামরুরা বিড়ি ধরায়।

একটু পরে কানার মা ওদের চা পরিবেশন করল। হামরুরা ব্রজেন
ঘোষের পায়ে পড়তে-পড়তে, বিড়ি খেতে-খেতে, চা পান করতে-করতে
আবার বিড়ি খেতে-খেতে ব্রজেন ঘোষকে আনুপূর্বিক সব কথাই বলে
গেল। ব্রজেন ঘোষ পরমাত্মীয়ের মতো স্নিগ্ধদৃষ্টি মেলে অসীম ধৈর্য
সহকারে ওদের সকল কথাই শুনে গেলেন।

সব শোনার পর ব্রজেন ঘোষ নিজেও একটা বিড়ি ধরালেন, জোরে-
জোরে কয়েকটি টান দিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া ছাড়লেন এক সঙ্গে। সেই
ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট আলোয় বসে থাকা হামরুদের দেখতে-দেখতে
ব্রজেন ঘোষ বললেন, জমিন কিনে লিবার কোনো ক্ষমতা অখন মোর লেই,
সৌকথা তরা মোকে বলবিনি।

ওদের মধ্যে ব্যথার কাতরানি উঠল, সেই কাতরানিতে কান রেখে
ব্রজেন ঘোষ বললেন, তবে তরা তো মোর লিজের লোক বটে, তাই—।
ব্রজেন ঘোষ কথা শেষ না-করে নীরবে বিড়ি টেনে যেতে লাগলেন।

থামে যাউঠু কেনে বাবু ? হামরু কথা না-বলে পারল না।

চুপচাপ থাকবিনি বাবু। পুরণও যেন অধৈর্য হয়।

তাড়াতাড়ি বল বাবু। হামরু আকুতি জানায়।

ওদের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে ব্রজেন ঘোষ বললেন, কিছু টাকা দিয়ে এই বিপদ থাকতে যাতে তদের বাঁচানো যায় সৌ-চেষ্টা মুই করব! এই, এই কথা দিইঠি মুই।

ব্রজেন ঘোষের কথার অন্তর্নিহিত মানে ওরা বুঝতে পারল না। ওরা ভাবল ব্রজেন ঘোষ হয়তো ওদের কিছু টাকা দেবে। এই ভেবে ওরা যেন একটু উৎসাহিত বোধ করল। ব্রজেন ঘোষ ওদের উৎসাহিত হতে দেখে বললেন, তাহলে তরা অখন যা, দশ তারিখে আসবি, অ্যার ভিতরে মুই—

দশ তারিক। ব্রজেন ঘোষের কথা শুনে ওরা কেঁপে উঠল।

হামরু বলল, দশ তারিক, উয়ার যে অখনো অনেক দেরি থাকে রয়েঠে বাবু!

ব্রজেন ঘোষ বিজ্ঞের হাসি মুখে নিয়ে জানালেন, এতবড় একটা চাষ তুলছি, ধান কাটছি, ধান ঘরকে লিয়ে আসছি, ঝাড়াই অখনো বাকি রয়ঠে! কত খরচ জানছু তো সবই, দমনা তো লিজের চোখেই দেখছু!

ব্রজেন ঘোষের চাষের হিসাব শোনার মতো মানসিক অবস্থা ওদের ছিল না। ওর কথা শেষ হতে না-হতেই হামরু বলল, পনেরো তারিকে যে লাখরচক গনং লিতে আসে মরবে বাবু।

ব্রজেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তার অখনো অনেক বাকি।

পূরণ বলল, অনেক কাই বাবু, দশ-বারোদিন বাকি!

ব্রজেন ঘোষ পরমাত্মীয়ের কণ্ঠস্বরের সাথে রূঢ়তা মিশিয়ে বলে, টাকাটা মোকে ধার করে লিতে হবে তো রে পাগল।

দমন এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এবার আর সে চুপ করে থাকতে পারল না, বলল, মোকে মারে ফেলবিনি বাবু, বাঁচে রাখিস!

ব্রজেন ঘোষ তার সেই নকল হাসিকে আরো প্রসারিত করে বললেন, পাগলটার কথা শোন তরা! আরে পাগল, তরে বাঁচে রাখতে চাই বলেই না এত কথা বলিঠি, দশ তারিখে তদের আসতে বলিঠি, ধার করে

টাকা আনবার কথা বলিঠি। মোর কথা তুই বুঝতে পারছুনি দমনা ?

হঠাৎ যেন তার দৃষ্টি যায় ওদের সবার মুখের দিকে। সহানুভূতির গলায় ব্রজেন ঘোষ বলে ওঠেন, একি, তরা বিড়ি খাচ্ছ, না কেনে ? খা খা, বিড়ি খা।

ওরা তিনজনে আবার তিনটি বিড়ি ধরিয়ে টানতে থাকে।

একটু পরে হামরু জিগ্যেস করল, তা তুই কত টাকা দিবি বাবু ?

পূরণ জানাল, মোদের আটশো টাকা লাগে মরবে।

ব্র:জন ঘোষ বললেন, মুই তো অটাই ভাবিঠি !

হামরু আবার বলল, দশ তারিকে টাকাটা মোরা পাব তো ?

ব্রজেন ঘোষ অদৃশ্য ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন, ভগবান জানে !

ভগবান জানে ! ওরা আবার ধাক্কা খায়। ভাবে, বজনা ঘোষ ভগবানের কথা বলেঠে কেনে ?

ব্র:জন ঘোষের কথায় ওরা প্রথম থেকেই খুব একটা আস্থা স্থাপন করতে পারছিল না, এখন ওরা যেন হতাশ হয়ে পড়ে।

ব্রজেন ঘোষ ওদের অসহায় অবস্থাটা ধরে ফেললেন, তারপর তাঁর কণ্ঠে নকল আশ্বাস যুক্ত হ'ল, মুই তো বলছি, তদের জন্য মুই চেষ্টা করব ! আর শোন, মুই জোগাড় করতে পারলে তরাও অইদিনে টাকাটা পায়ে যাবি।

হামরু কাতরাতে-কাতরাতে বলল, তুই ঠিক করে বল বাবু !

ব্রজেন ঘোষ নীরব, কোনো কথা বললেন না।

পূরণ বলল, তুই ঠিক করে বল বাবু !

দমন ছুটে গিয়ে ব্রজেন ঘোষের পায়ের কাছে বসে পড়ে, কান্না-জড়ানো কণ্ঠে বলল, বাবু !

ঘোষগিন্নী ছিলেন ঘরের মধ্যে, ছুটে বারান্দায় এসে দমনকে ধমক দেন, এই, এই দমনা, ওঠ অখান থাকতে।

ব্রজেন ঘোষ বললেন, উঠে যা, চাটাইয়ে বসে পড়গে।

হামরুও ডাকল দমনকে। দমন উঠে ওর কাছে গিয়ে বসল।

ব্রজেন ঘোষ ওদের বললেন; তরা কি শুরু করছু বল তো। মুই তো বলছি, তরা দশ তারিখে আয়। তদের টাকার ব্যবস্থা হবে, অদিনই টাকা পায়ে যাবি, তবুও তরা এমনি করছু কেনে? যা অখন সব, ঘরকে যায়ে পান্তা খায়ে শুয়ে পড়্গে। দশ তারিখে মোর কাছকে আসবি। যা অখন সবাই।

হামরু ভেবে দেখল এখন বেশি কিছু বলা যাবে না, বেশি চাপ দেওয়াও যাবে না। তাতে যদি ব্রজেন ঘোষ বিগড়ে যান ওদের সবই পণ্ড হয়ে যাবে। ওরা ভালো করেই বুঝতে পারছে, এ-সময়ে ব্রজেন ঘোষের সাহায্য ও সহযোগিতা ওদের একান্ত দরকার। ওরা আর-কিছু না-বলে উঠে দাঁড়াল আর দশ তারিখের এক অস্পষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে ফিরে গেল সবাই।

ওরা বাড়িতে ফিরে গেল বটে তবে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারল না। দুশ্চিন্তায় রাত কাটাল ওরা।

হামরু রাত জেগে-জেগে যে কথাটা বেশি করে ভাবল সেটা হচ্ছে, মাষ্টরবাবুর সাথকে একবার কথা বলা দরকার।

সেই যে সাগ্নিক দমনের বাড়িতে দাঁড়িয়ে ওদের শেষ কথা বলে চলে এসেছিল, তারপর আর ওদের কোনো খোঁজ-খবর নেয়নি। এতে হামরুদেরও একটু অভিমান হয়েছিল। তাই ওরাও মাষ্টরবাবু-মাষ্টর-বাবু করে সাগ্নিকের কাছে ছুটে যায়নি। কিন্তু আজ হামরু বুঝছে, এটা অভিমান করে বসে থাকবার সময় নয়। মাষ্টরবাবুর পরামর্শ ওদের দরকার।

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে হামরু ইস্কুলে গিয়ে হাজির হ'ল। কিন্তু সাগ্নিককে তখন কোথায় পাবে? বড়দিনের বন্ধ ঘোষণা করে সে তো ক'দিন আগেই উলুবেড়িয়ায় চলে গেছে।

হতাশ হয়ে ওরা বাড়ি ফিরে গেল।

রাত্রে হামরুর বাড়িতে ওরা মিটিং করল। সেই মিটিংয়ে ওরা স্থির

করল দশ তারিখে ব্রজেন ঘোষ টাকা দেবে বললেও তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে থাকা যাবে না। অতএব ওরা নিজেরা অন্য খদ্দেরও খুঁজে দেখবে। সেই সিদ্ধান্ত মতোই ওরা উঠে পড়ে লাগল খদ্দের খুঁজতে।

এইভাবে একদিন দশই পৌষ বা গেল পুষ এসে গেল। কিন্তু ওরা নিজেরা কোনো খদ্দের খুঁজে পায়নি। সন্ধ্যায় হামরু-পূরণ-দমনরা আবার ছুটে গেল ব্রজেন ঘোষের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে শুনল ব্রজেন ঘোষ ওদের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে পারেননি। অবশ্য চোখের জল ফেলতে-ফেলতেই উনি হামরুদের একথা বললেন।

টাকা সংগ্রহ হয়নি শুনে হামরু-পূরণ-দমন আর্তনাদ করে উঠল।

ওদের আর্তনাদ শুনে এবং বিচলিত দেখে ব্রজেন ঘোষের বুকেও নিদারুণ ব্যথা বাজল। তাই তিনি ওদের তিনটি বিকল্প পথের কথা সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন। এই পন্থাগুলির যে-কোনো একটি অবলম্বন করতে পারলেই এই বিপদ থেকে ওরা বেরিয়ে আসতে পারবে। এক, দমনের জমিটা আবার নতুন করে কোথাও বাঁধা রাখতে হবে। দুই, দুই-এক বিঘে জমি বিক্রি করে দিয়ে গনং-সহ সমস্ত দেনা মিটিয়ে ফেলতে হবে। তিন, সবটা জমি একসঙ্গে বিক্রি করে দিতে হবে, গনং এবং দায়-দেনা মিটিয়ে যে-টাকা অবশিষ্ট থাকবে তাই দিয়ে দমনকে ভালো দেখে কয়েক বিঘে জমি কিনে দিতে হবে।

ব্রজেন ঘোষের কথা ওরা শুনছে না, ওরা সমানে আর্তনাদ করে চলেছে।

সে-আর্তনাদে কান না-দিয়ে ব্রজেন ঘোষ বক্তৃতা দিয়ে চললেন। তিনটি বিকল্পের প্রত্যেকটির কি কি লাভ-লোকসান হতে পারে, ব্রজেন ঘোষ সে-সব ওদের বুঝিয়ে দিতে থাকেন।

হামরুদের আর্তনাদ ক্রমেই বাড়ছে। বাড়বারই কথা। পনেরোই পৌষ বাখরচক গনং নিতে আসবে, একটা খদ্দের কোথাও ওরা খুঁজে পাচ্ছে না, ব্রজেন ঘোষ জমি কিনবেন না, এই অবস্থায় বক্তৃতা শুনে কি ওরা সান্ত্বনা পাবে? ওরা ছুটে গিয়ে ব্রজেন ঘোষের পায়ের কাছে

আছড়ে পড়ল, আরো তীব্র এবং করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে থাকল।

ব্রজেন ঘোষ জানালেন, এছাড়া অখন মোদের আর কোনো উপায় থাকছেনি। তরা খদ্দের খুঁজতে লাগে পড় অখন থাকতে। এদিকে মুইও দেখিঠি। খদ্দের একটা লিশ্চয় মিলে যাবে। এই কথা বলতে বলতেই ব্রজেন ঘোষ ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

ওরাও তেমনিভাবে আর্তনাদ করতে-করতে ফিরে গেল নিজেদের পল্লীতে।

এর পর হামরুরা আবার খদ্দের খুঁজতে লেগে যায়। আশপাশের সমস্ত গ্রাম চষে ফেলে, কিন্তু কোথাও কোনো খদ্দেরের সন্ধান পায় না ওরা। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় হামরু-পূরণ-দমন ব্রজেন ঘোষের বাড়িতেও একবার করে আসছে। না, ব্রজেন ঘোষও তখনো কোনো খদ্দের খুঁজে পাননি, যদিও তিনি তখনো আশাবাদী। তিনি জোর দিয়ে ওদের বলে যাচ্ছেন খদ্দের একটা পাওয়া যাবেই।

এইভাবে চলতে-চলতে ইংরেজি উনত্রিশে ডিসেম্বর, বাংলা তেরোই পৌষ আর সাঁওতালীতে গেল পে পুষ কিছু ঘটনা ঘটল।

সকালে হামরু এসে হাসি মুখে খবর দেয়, রাম মাইতির চায়ের দোকান চালায় যে অনিল দোলুই সে এক বিঘে জমি কিনবে বারোশো টাকার বিনিময়ে। ব্রজেন ঘোষ খুশি হয়ে গেলেন অনিল দোলুইয়ের সঙ্গে কথা বলতে, একাই। সন্ধ্যায় হামরু-পূরণ-দমন এসে হতাশায় ভেঙে পড়ে বলল, অনিল জমি কিনবে না।

ব্রজেন ঘোষ অনিলের বাপমায়ের শ্রাদ্ধ করে গালাগালি দিলেন কথা দিয়ে কথা না-রাখার অপরাধে।

এদিকে পনেরোই পৌষও এসে গেছে, মাঝখানে আর মাত্র একটাই দিন। এর মধ্যে জমি বিক্রি করা, ডাংরা-ঘুষুর খরিদ করা সম্ভব নয়। তাই ব্রজেন ঘোষের পরামর্শে স্থির হয়—পরের দিন অর্থাৎ ইংরেজি ত্রিশে ডিসেম্বর, বাংলা চৌদ্দই পৌষ আর সাঁওতালীতে গেল পোন পুষ পূরণ রায়বারকে সাথে নিয়ে বাখরচক যাবে, বাখরচকের হাড়ামের হাতে-

পায়ে ধরে গনং আদায়ের দিন যথাসম্ভব পিছিয়ে নিয়ে আসবে।

পরের দিন ওরা বাখরচক গিয়েছিল। বাখরচক প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না। শিউলী গাঁ হাতে-পায়ে ধরে কান্না-কাটি করাতে তারা একটু নরম হ'ল এবং গনং আদায়ের তারিখ কয়েকদিন পিছিয়ে দিল। তবে স্থির হ'ল, শাকরাত্ত-পোরোবের দশ দিন আগে অর্থাৎ বাংলা বিশে পৌষ আর সাঁওতালীতে বার গেল পুষ অবশ্যই গনং আদায় দিতে হবে, নতুবা চুক্তিভঙ্গের দায়ে শিউলী গাঁকে অভিযুক্ত হতে হবে। শিউলী গাঁয়ের মতিগতি ওদের কাছে ভালো ঠেকছে না। তাই ওদিন ওরা আসবে সদলবলে এবং সশস্ত্র হয়ে। দরকার হলে সেদিন ওরা জোর করে গনং আদায় করে নিয়ে যাবে, বাপলা ভেঙে দিয়ে কুড়িকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। গনং না-পেলে সেদিন ওরা এসবই করবে।

এর পর হামরুরা পাগল হয়ে খদ্দের খুঁজে চলল। হামরু-পূরণ-দমনই শুধু নয়, গোটা সাঁওতাল-পল্লী হন্যে হয়ে যায়। দিনান্তে একবার অবশ্য হামরু আর পূরণ ব্রজেন ঘোষের কাছেও আসে, প্রতিদিনই। ব্রজেন ঘোষ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিদিনই ওদের কথা শোনেন। হাসি মুখে প্রতিদিনই ওদের সঙ্গে কথা বলেন। মাঝে-মাঝে প্রতিশ্রুতিও দিতে লাগলেন এই বলে যে, সব দায়িত্ব ব্রজেন ঘোষ নিজের কাঁধে নিয়ে নিচ্ছেন, জমি উনিই বিক্রি করে দেবেন, উনিই ডাংরা-ঘুষুর সব কিনে দেবেন বিশ তারিখের আগে।

কিন্তু আসলে কিছুই করেন না। হামরুরাও নিরুপায়, তারা সব বোঝে, তবুও ব্রজেন ঘোষের কাছে না-এসেও পারে না।

ইংরেজি তেসরা জানুআরি, বাংলা আঠারোই পৌষ আর সাঁওতালীতে ইরা পুষ হামরুরা একটা ভালো খবর সংগ্রহ করল। রাম মাইতি নিজে দমনের পাঁচ বিঘে জমিই কিনতে রাজী হয়েছে। হামরু ব্রজেন ঘোষের কাছে খবরটি বলল সকাল বেলায়। তারপর সে ব্রজেন ঘোষকে বলল রাম মাইতির গদী ঘরে গিয়ে সব কথা পাকা করতে হবে। সে ব্রজেন ঘোষকে নিয়ে যেতে চাইল। ব্রজেন ঘোষ তখন মেদিনীপুরে যাবেন বলে

তৈরি হচ্ছিলেন। তার বড়মেয়ে হাসির বাচ্চা হবে, মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ব্রজেন ঘোষ মেয়েকে দেখতে গেলেন। ওদের বলে গেলেন যে রাম মাইতির সঙ্গে রাত্রে কথা হবে।

ওরা আবার কান্নাকাটি করল। কিন্তু ব্রজেন ঘোষ কোনোমতেই ওদের কথায় রাজী হয়ে রাম মাইতির গদী ঘরে তখন গেলেন না।

কিন্তু সন্ধ্যায় দেখা গেল কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে রাম মাইতি জমি কিনতে অস্বীকার করলেন। ব্রজেন ঘোষের অনুরোধ, হামরুদের আর্ত কান্না, রাম মাইতির পায়ে পড়ে দমনের বুকফাটা কান্না, কোনো-কিছুই রাম মাইতির মনকে নরম করতে পারল না। সে এখন জমি কিনবে না, স্পষ্ট-উচ্চারণে এই কথা ঘোষণা করে রাম মাইতি ব্রজেন ঘোষের বারান্দা থেকে নেমে গেল।

ব্রজেন ঘোষের বারান্দা উঠোন সাঁওতালদের কান্না আর হাহাকারে আবিল হয়ে উঠল। তারপর একসময় ওরা ব্রজেন ঘোষের পায়ে আছড়ে পড়ে একইভাবে হাহাকার আর আর্তনাদ করতে লাগল। সমস্ত বাড়িটা যেন এক নিদারুণ শোকভূমিতে পরিণত হয়েছে।

চারপাশে এতসব হতে থাকলেও ব্রজেন ঘোষ একটি কথাও বললেন না, মানে বলতে পারলেন না। তিনিও তখন শোকাহত, এমনকি ওই হামরুদের চেয়েও তাঁর অবস্থা আরো করুণ। মুখে কথা নেই বটে, কিন্তু চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ছে। ব্রজেন ঘোষ নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন। এইভাবে, কথা না-বলেও, নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে-করতে ব্রজেন ঘোষ একসময় ওই হামরু-পূরণ-দমনদের নিকটতরজন হয়ে গেলেন। চতুর চূড়ামণি ব্রজেন ঘোষ এই প্রক্রিয়ায় হামরুদের সঙ্গে এমন এক সহমর্মিতা সৃষ্টি করে ফেললেন যাতে ব্রজেন ঘোষের বিরুদ্ধে ওদের বলবার মতো কোনো অভিযোগই থাকল না। সব-কিছু একটু থিতিয়ে এলে ওরা বুঝল—ব্রজেন ঘোষও আজ ওদের মতো একটি ক্ষত-বিক্ষত মানুষ ছাড়া আর কেউ না, ব্রজেন ঘোষও ওদের মতো বিপন্ন এক অস্তিত্ব, তাঁর সঙ্গে ওদের আজ কোনো পার্থক্য নাই। ওরা ব্রজেন ঘোষকে

বিশ্বাস করল। ব্রজেন ঘোষ এমনিভাবে আজও বিজয়ী হলেন।

অবশেষে ওদের মধ্যে আবার আলোচনা উঠল। আলোচনা মানে এক-জনের বলা আর সবার শোনা। ব্রজেন ঘোষ একাই বলে গেলেন, আর ওরা কেবল শুনে গেল। এইভাবে ওরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল।

বাখরচক পরশু আসবে গনং নিতে। মাঝখানে আর একটাই মাত্র দিন। কাল। কাল আবার ব্রজেন ঘোষকে মেদিনীপুরে যেতেই হবে, মরণা-পন্না মেয়েকে দেখতে। অতএব জমি-বিক্রি করে এর মধ্যে বাখরচকের গনং পরিশোধ করা কিভাবে সম্ভব ? অযথা সে-চেষ্টার প্রয়োজনও নেই। তার চেয়ে সবাই মিলে কাল বাখরচক যাবে। অনুরোধ, আবেদন, হাতে-পায়ে ধরা প্রভৃতি উপায়ে বাখরচককে সন্তুষ্ট করে গনং আদায়ের দিনটা আবার কয়েক দিনের জন্য পিছিয়ে আনতে হবে। যেমন করেই হোক এটা হামরু-পূরণকে করে আনতেই হবে। ইতিমধ্যে ব্রজেন ঘোষের মেয়ে নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবে। তখন তাঁকে আর বাইরে যেতে হবে না, বাইরে গিয়ে থাকতে হবে না। তখন ব্রজেন ঘোষ ভালোভাবে চেষ্টা করতে পারবেন এবং খদ্দেরও একটা নিশ্চয় মিলে যাবে। ব্রজেন ঘোষ সব কথা ওদের এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন যাতে ওরা সহজেই বুঝতে পারল, এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

পরের দিন অর্থাৎ ইংরেজি চউঠা জানুআরি, বাংলা উনিশে পৌষ আর সাঁওতালীতে আরে পুষের সকালে ব্রজেন ঘোষ মেদিনীপুরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। হাসপাতালে গিয়ে মেয়েকে দেখবেন, তার পর মেয়ের বাড়ি যাবেন। ঘোষগিন্নী এবং নরেন-পারুলও সঙ্গে গেল। ফিরতে ওদের দু'-চারদিন দেরিই হবে।

হামরুরা ? হ্যাঁ, সকালে সবাই মিলে ওরাও বাখরচকে গেল। হাড়ামের কাছে গিয়ে অনেক আবেদন-নিবেদন, অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করল, কান্নাকাটি করে বাখরচকের হাড়ামের বাড়ির উঠোন ভিজিয়ে দিল। কিন্তু বাখরচকের হাড়াম তাতে একটুও নরম হ'ল না। সে অনড় অচঞ্চল থেকে ঘোষণা করল, ওই বিশে পৌষ বা বার গেল পুষেই গনং

আদায় দিতে হবে। অন্যথায় শিউলী গাঁ যেন তৈরি থাকে, আগের দিন বাখরচক যা যা বলে দিয়েছিল, ওরা তাই করবে। হামরুরা কাঁদতে-কাঁদতে বাখরচক থেকে ফিরে এল।

ফিরল সেদিন সাগ্নিকও। বড়দিনের ছুটির পর সে শিউলী গাঁয়ে ফেরেনি। ফিরল আজ। সে যখন ফিরল তখন শিউলী গাঁয়ে সন্ধ্যা।

॥ বা রো ॥

সাগ্নিক উলুবেড়িয়া থেকে সকালেই বেরিয়েছিল। ট্রেন থেকে খড়্গপুরে নেমে বাসে করে গেল মেদিনীপুর। সাব-ইনস্পেকটর অব ইস্কুল-এর অফিসে গিয়েই সে খবরটি পেল। অর্থাৎ ওর বহু-আকাঙ্ক্ষিত ট্রান্সফার অর্ডার গত পরশু ওরা ইস্কুলের ঠিকানায় পাঠিযে দিয়েছে।

খবরটি শুনে সাগ্নিক খুশি হ'ল।

বড়দিনের বন্ধ ঘোষণা করে সেই যে সে শিউলী গাঁ ছেড়ে এসেছিল, আর ফিরে যায়নি। ছুটির মধ্যে সে বেশ কয়েকবার মেদিনীপুরে এসেছিল ঠিকই, তবে শিউলী গাঁয়ে কোনোদিন যায়নি। ছুটি ঘোষণা করে যাওয়ার সময়ে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল—ইংরেজি একত্রিশে ডিসেম্বর, বাংলা পনেরোই পৌষ আর সাঁওতালীতে গেল মোড়ে পুষ, অর্থাৎ বাখরচক থেকে পণ নিতে আসার পূর্ব-নির্ধারিত দিনে সে কিছুতেই শিউলী গাঁয়ে ফিরবে না, থাকবে না, দমনদের করুণ মুখও সে দেখবে না।

উলুবেড়িয়াতে বসে ভেবে-ভেবে সে আরো একটি সিদ্ধান্তও নিয়েছিল—শিউলী গাঁয়ে সে শূন্য হাতে ফিরবে না, ট্রান্সফার অর্ডার হাতে পেলে বা শিউলী গাঁয়ে গিয়ে ওটি পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকলে তবেই সেখানে ফিরবে, অন্যথায় নয়।

মেদিনীপুরে এসে ট্রান্সফার অর্ডারের খবর শুনে সে ভাবল এবার

তাহলে শিউলী গাঁয়ে ফেরা যেতে পারে। ওখানে গেলেই যখন ট্রান্সফার অর্ডার হাতে পাওয়া যাবে, শিউলী গাঁয়ে ফিরতে তখন আর বাধা কোথায় ? তাছাড়া ইংরেজি একত্রিশে ডিসেম্বর, বাংলা পনেরোই পৌষ আর সাঁওতালীতে গেলমোড়ে পুষও কবে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আজ চউঠা জানুআরি। শিউলী গাঁয়ে যা ঘটবার তা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, হয়তো বা শিউলী গাঁয়ের মানুষ এতদিনে তা ভুলতে বসেছে। অতএব সেখানে ফিরে যেতে আজ আর কোনো বাধা আছে বলে তার মনে হ'ল না। গনং আদায়ের দিন-তারিখ পরিবর্তনের খবর সাগ্নিক জানত না।

মেদিনীপুর থেকে যখন বাসে উঠল তখনও পাঁচটা বাজেনি। কিন্তু এর মধ্যেই নেমে এসেছে গোধূলি। শীতটা আজ একটু বেশি মনে হচ্ছে।

শিরীষ মোড়ে বাস থেকে যখন নামল তখন সোয়া-পাঁচটা বেজে গেছে। দিনটা যে সামান্য একটু বড় হয়েছে সন্ধ্যালগ্নের শিউলী গাঁ-কে দেখে তা বুঝতে পারছে সাগ্নিক।

এই সেই শিরীষ মোড় যার সঙ্গে বলতে গেলে ওর জীবনটাও জড়িয়ে-ছিল দীর্ঘ দশ বছর। এই দশ বছর ধরে শিরীষ মোড় ছিল ওর কাছে একটা ডেস্‌টিনেশন।

বাস থেকে নেমেই সে বিস্মিত আর চিন্তিত দৃষ্টিতে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। শিরীষ মোড় এখন প্রায়-জনশূন্য। হবে না-ই বা কেন ? একে শীতের সন্ধ্যা, তার ওপর আবার সবাই গিয়ে এখন ভীড় করে বসে আছে রাম মাইতির চায়ের দোকানে। এ-সময়ে শিরীষ মোড়ে এক-মাত্র বাসযাত্রী ভিন্ন আর কারো থাকবার কথা নয়।

সাগ্নিক টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। যেতে যেতেও সে তু'পাশে তাকিয়ে দেখতে থাকে। সন্ধ্যার আধা-অস্পষ্টতার মধ্যেও চারদিকে তাকাতে-তাকাতে সাগ্নিকের মনে হ'ল, তু'সপ্তাহের অনুপস্থিতি আর অদর্শনের ফলে শিউলী গাঁ যেন তার কাছে অংশত অপরিচিত হয়ে গেছে। আসলে কি তাই ? শিউলী গাঁয়ের কোনো-কিছুই কি তার কাছে অপরিচিত বা অস্পষ্ট হতে পারে ? তবে কেন তার এমনটি মনে হচ্ছে ?

সাগ্নিক নিজের মধ্যে ডুবুরি নামিয়ে এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকে। আসলে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সে শিউলী গাঁয়ের সঙ্গে তার মানসিক সংযোগ খানিকটা হারিয়ে ফেলেছে। আর তারই ফলে আজ ওর ওরকম মনে হচ্ছে। এই অহেতুক অপরিচিতি-বোধ আসলে সাগ্নিকের ওই মানসিকতারই প্রতিফলন মাত্র

রাম মাইতির গদিঘরের সামনে গিয়ে সাগ্নিক দ্রুত পা চালায়। হঠাৎ অবাঞ্ছিত কারো সঙ্গে দেখা হলে অহেতুক নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাকে। সেটা সে চায় না। অবশ্য বাঞ্ছিতজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তার আপত্তি নেই। আসল কথা, মুখে সে যা-ই বলুক না কেন, দমনের ব্যাপারটা জানবার জন্য ভেতরে-ভেতরে সে দারুণ উদ্বিগ্ন। আদিবাসী পাড়ার কারো সঙ্গে দেখা হলে সে খুশিই হ'ত, কিন্তু তেমন কারো সঙ্গে সাগ্নিকের দেখা হ'ল না।

হাঁটতে-হাঁটতে সে ব্রজেন ঘোষের বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছল। গেটের মধ্যে ঢুকতে গিয়েও সে দাঁড়িয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সাঁওতাল-পল্লীর দিকে তাকাতে থাকে। মনে তার সেই একই প্রত্যাশার আনা-গোনা—ওদের সঙ্গে কারো যদি দেখা হয়ে যায়। কিন্তু না, ওদের কারো সঙ্গে দেখা হ'ল না, কাউকে সে দেখতে পেল না। তবুও সে ওইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

সখি কি-একটা কাজে গেটের কাছে এসেছিল। সে-ই প্রথম সাগ্নিককে দেখতে পায়। সখি উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে, মাষ্টারবাবু!

সাগ্নিকও ওকে দেখে খুশি হয়। ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই সে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বারান্দায় উঠবার সময় দেখা হ'ল কানার মা-র সঙ্গে। কানার মা ওকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়।

সখি আর কানার মাকে দেখে, ওদের আচরণ লক্ষ্য করে আর নরেন-পারুল-সহ ঘোষ-দম্পতিকে না-দেখে সাগ্নিক অনুমান করল ব্রজেন ঘোষ সপরিবার বাইরে কোথাও গেছেন। ঘোষ-দম্পতির যে-কোনো একজনও বাড়িতে থাকলে সখি বা কানার মা এতটুকুও স্বতস্ফূর্ত হতে পারে না।

তবুও সে প্রশ্ন করে, আর সখি এবং কানার মা-র যৌথ বিবৃতি থেকে জানতে পারে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে হাসির বাচ্চা হয়েছে। ওঁরা বেরিয়েছেন নাতি দেখতে। তারপর নাতি-মেয়ে সহ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাবেন এবং সেখানে থাকবেন কয়েকটা দিন।

এসব কথার পর সাগ্নিক ওর চিঠি তথা ট্রান্সফার অর্ডারের কথা পাড়ল। সে-সম্পর্কে ওরা কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু বলতে পারল না। তবে ওদের ধারণা—রমু এসব জানে, রমু বলতে পারে। সে এখন রাম মাইতির চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

কথার মাঝেই কখন কানার মা রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। তারপর সাগ্নিক সখির সঙ্গেই কথা বলল কিছুক্ষণ। একটু পরে কানার মা আবার এল। তার হাতে চায়ের কাপ। সাগ্নিক হাসিমুখে কানার মা-র হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিতে-দিতে আর ভাবতে-ভাবতে সন্তর্পণে এবার দমনের কথাটাও পেড়ে বসল।

কথায় কথায় সখি আর কানার মা অনেক কথাই শোনাল ওকে। সাগ্নিক বুঝতে পারল ইংরেজি একত্রিশে ডিসেম্বর, বাংলা পনেরোই পৌষ আর সাঁওতালীতে গেলমোড়ে পুষ বাখরচক পণ নিতে আসেনি। হামরুরা টাকা জোগাড় করতে পারেনি বলে বাখরচকে গিয়ে পণ দেওয়ার দিন পাল্টে এনেছিল। আগামীকাল বাখরচক আবার আসবে পণ নিতে। সখি এবং কানার মা এটাও বলল যে, টাকা ওরা এখনো জোগাড় করতে পারেনি, আগামীকালও ওরা পণ দিতে পারবে না।

সব শুনে সাগ্নিক বিস্মিত আর চিন্তিত। চিন্তার ঝড় ওঠে তার মনে। এরকম খবর শুনবে এটা সে আগে ভাবেনি। তা ভাবতে পারলে তো সে আজ শিউলী গাঁয়ে আসতই না।

এইভাবে কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নেওয়ার পর সাগ্নিক আর-একটা ব্যাপারে একটু ধারণা করে নিতে চাইল। ওদের টাকার সংস্থান করে দেওয়ার ব্যাপারে ব্রজেন ঘোষের বেশ বড় ভূমিকা থাকার কথা ছিল। ব্রজেন ঘোষ সেই ভূমিকা এবং দায়িত্ব কিভাবে

পালন করছেন, সে-সম্পর্কে সাগ্নিক সঠিক ধারণায় পৌছতে চাইল।

সখি ও কানার মা সবকথা গুছিয়ে বলতে পারে না, হয়তো জানেও না। তবুও অনেক ঘটনাই তো এই বাড়িতে ঘটেছে, অনেক কথাই তো এই বাড়িতে বলাবলি হয়েছে। ওরা দিনের পর দিন সে-সব দেখেছে; শুনেছে, সাধ্যমতো বুঝবারও চেষ্টা করেছে। সখি আর কানার মা সে-সব বিস্তারিত ওকে শোনাল। তার সঙ্গে সাগ্নিক যোগ করল তার দশ বছরের অভিজ্ঞতা, ব্রজেন ঘোষকে জানার অভিজ্ঞতা। দুইয়ের সংমিশ্রণে সাগ্নিক সব বুঝতে পারল। শিউলী গাঁয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাপুঞ্জ, তথা হামরুদের টাকা-সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য ব্রজেন ঘোষের ভূমিকা সম্পর্কে সে মোটামুটি সঠিক ধারণায় আসতে পারল বলে তার বিশ্বাস হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সে বুকের মধ্যে নিদ্রিত সেই অসহায়তার যন্ত্রণাকে পুনরায় অনুভব করল তীব্রভাবে। তার মন বিদ্রোহ করে উঠল। তখনই সে শিউলী গাঁ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইল। এমনকি সে বলেও ফেলল সে-কথা।

সাগ্নিকের কথা শুনে সখি এবং কানার মা দু'জনেই ব্যথা পেল।

সখি বলল, তোমারে যাতে দিবনি মাষ্টারবাবু!

কানার মা বলল, রেতের বিলায় আসছু, না-খায়ে কাই যাবে গো ছ্যানা?

সখি বলল, না-খায়ে তোমারে যাতে দিবনি!

কানার মা যোগ করল, রেতে তোমারে মোরা যাতে দিবনি।

এইভাবে একের পর এক সখি আর কানার মা বলে যায়। এক কথায় ওরা দু'জন আন্তরিকভাবে সাগ্নিককে রাখতে চায়, সাগ্নিক চলে যাক তা ওরা চায় না।

সত্যি কথা বলতে কি, সাগ্নিক তো এই মুহূর্তে ঠিক যেতেও পারছে না। রমেন বাড়িতে না-ফেরা পর্যন্ত সে যায়ই-বা কি করে? চিঠিটা তো তাকে নিয়ে যেতে হবে। অতএব সাগ্নিক নীরব হয়েই রইল। সখি আর কানার মা-র কথায় হ্যাঁ-না কিচ্ছু বলল না। ওর এই নীরবতাকে ওর থাকবার সম্মতিজ্ঞাপন মনে করে কানার মা বলল, তুমি বস বাবু, মুই

রান্নাঘরকে যাইঠি।

কানার মা রান্নাঘরে চলে যাওয়ার পরে সখি আরো কাছে সরে আসে। এ-সখি আগে দেখা সে-সখি নয়। আগে-দেখা সখি ব্রজেন ঘোষের সৃষ্টি, আর এ-সখি হ'ল আসল সখি।

ঘোষ-দম্পতি বিশেষ করে ব্রজেন ঘোষের মতে সখির মধ্যে আদৌ কোনো পুরুষালি বৈশিষ্ট্য নেই। সে কালা, হাবা আর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। তার ওপর বিড়ি খেয়ে-খেয়ে মস্তিষ্ককেও নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। সাগ্নিক মনে করে সখি তা নয়, অন্তত ব্রজেন ঘোষ যতখানি বলেন, ততটা তো নয়ই। আর যেটুকু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে সেটা তো আসলে ব্রজেন ঘোষেরই সৃষ্টি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সৃষ্টি। এটা ঠিক যে সে জন্মের সময়ে কিছু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিল। এরকম তো কত ছেলের মধ্যে দেখা যায়, তাই বলে বয়োবৃদ্ধির পর সে-সব থাকে নাকি? সখির ক্ষেত্রে কেবল সেটা আছে তাই নয়, আরো বেড়েছে। কেন বেড়েছে? আসলে ব্রজেন ঘোষই বাড়িয়েছেন।

অতিশৈশবে সে তার বাবা-মাকে হারায়। ভাগ্যের কুটিল পথ বেয়ে সে একদিন ব্রজেন ঘোষের খপ্পরে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সখি ব্রজেন ঘোষের জ্ঞাতি-ভাইয়ের ছেলে। সখির বাবার সঙ্গে ব্রজেন ঘোষের সম্পর্ক ঠিক সহোদর ভাইয়ের মতো না-হলেও, খুব দূরেরও না। ব্রজেন ঘোষ আজ যে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, সখির বাবার অংশও তার মধ্যে আছে। অংশটা যদিও খুব বড় নয়, তবুও দশ-পনেরো বিঘে জমির মালিকানা সে সহজেই দাবি করতে পারে।

সখির বয়স যখন মাত্র পাঁচ মাস তখন আকস্মিকভাবে মারা যায় ওর মা। ঠিক এগারো মাসের মাথায় ওকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে মারা গেল ওর বাবা। সখির মাতৃকুলে কেউ ছিল না, পিতৃকুলে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ব্রজেন ঘোষ। ব্রজেন ঘোষ ওকে আশ্রয় দেবেন শুনে আর কেউ সাহস করে ওর কাছে এল না। বলা বাহুল্য, সখির বাবার জমি-জমা আর ঘর-বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্বও ব্রজেন ঘোষ নিতান্ত

অনিচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। ঘর-বাড়ি বলতে মাটির ঘর, কেউ বসবাস করে না বলে আস্তে-আস্তে নষ্ট হয়ে গেল। সেখানে এখন ব্রজেন ঘোষের সব্জীর চাষ। আর মাঠের জমি-জমা এখন ব্রজেন ঘোষের জোতের মধ্যে মিশে গেছে।

সখি একটু-একটু করে বড় হতে থাকে। শৈশব পার হতে না-হতেই ওর মধ্যে ওই বিশেষ লক্ষণটি প্রকাশ পায়। ব্রজেন ঘোষ উৎসাহী হয়ে ওকে শাড়ির মতো করে কাপড় পরতে শেখালেন, ঘোমটা দিতে শেখালেন, লজ্জাবতী হতে শেখাতে লাগলেন। কিছুদিন পার হতে না-হতেই ব্রজেন ঘোষ আবিষ্কার করলেন—সখির বুদ্ধি কম, সে কানেও কম শোনে, কথাও ভালো বলতে পারে না, পুরোপুরি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। চতুর ব্রজেন ঘোষ এটাকে একটা সুযোগ হিসাবে নিলেন। ব্রজেন ঘোষ ওকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পুতুল বানিয়ে রাখতে চাইলেন। তার ওপর আবার ওকে বিড়ির নেশায় এমন আসক্ত করালেন যে বিড়ি খেয়ে খেয়ে তার মাথাটা আর কোনোদিন সাফ হতে পারল না। আসল কথা হ'ল, একটু জড়তা নিয়ে সে এই পৃথিবীতে এসেছিল ঠিকই, তবে বাবা-মা বেঁচে থাকলে, আদর-যত্ন পেলে, পাঁচজনের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ পেলে সে হয়তো হয়ে উঠতে পারত একজন স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু হ'ল ঠিক তার উল্টো। প্রথমে অনাহার-অর্ধাহার-অনাদর-অবহেলায় ব্রজেন ঘোষের বাড়িতে পড়ে থাকায় তার দেহ-মন-মস্তিষ্ক কিছুই পরিণত হতে পারল না। পরবর্তীকালে ব্রজেন ঘোষ তাকে স্বাভাবিক হতে দিলেন না। বরং তিনি চাইলেন অপরিণত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এক মাংস-পিণ্ডরূপেই সখি জীবন নির্বাহ করুক। কোনো-কিছু ভোগ করবার মানসিকতাটুকুও যেন কোনোদিন তার মধ্যে না-আসে। অর্থাৎ ব্রজেন ঘোষ যা চেয়েছিলেন সখি আজ তাই-ই হয়েছে। তিনি যে অভিসন্ধি ও পরিকল্পনা এঁটেছিলেন, সখি সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মাত্র।

বিনিময়ে ব্রজেন ঘোষ তাকে কি দেন ? বছরে দু'খানা কমদামি মোটা ধুতি, দিনে তিনবেলা চারটি ভাত আর সস্তাদামের কিছু বিড়ি। এর

বেশি কোনো প্রত্যাশা বা দাবি তার নেই। এর বেশি কিছু সে পায়ও না। প্রত্যাশা বা দাবির পাঠ যে ব্রজেন ঘোষ তাকে উল্টো দিক থেকে শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন এমনভাবে যাতে প্রত্যাশা বা দাবি জানাতে সে লজ্জা পায়, কুণ্ঠিত হয়; প্রত্যাশা বা দাবির কথা সে ভুলে গেছে।

জমির দাবি? এর পরও? হাড়-ভাঙা শ্রমের নামমাত্র মজুরি যে পায় না, নেয় না, চায় না, সে করবে জমির দাবি? না, সেটা আর ওর পক্ষে সম্ভব হয় না, শোভাও পায় না। সেটা সম্ভব হোক আর না-ই হোক, সেটা শোভা পাক আর না-ই পাক, এসব কথা কি সখি কখনো অবচেতন মনেও ভাবে না? ভেবে-ভেবে কি কখনো এতটুকু দুঃখও সে পায় না? ওর মধ্যে কখনো কি কোনো ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে না?

ব্রজেন ঘোষ মনে করেন, না, হয় না।

সাগ্নিক? সাগ্নিকও অবশ্য ওকে দশ বছর ধরে দেখে আসছে, তারও একটা মতামত অবশ্যই আছে। সাগ্নিক মনে করে, তার মনেও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। বঞ্চনার বেদনা নিশ্চয় ওর মনেও অনুরণন তোলে। নইলে অন্যের বেদনা সে বোঝে কি করে? আজ দমনের যন্ত্রণা তাহলে সে বুঝছে কি করে? তবে একথা ঠিক, অপরিণত মস্তিষ্ক আর মানসিকতার জন্য সে সব-কিছু সবসময় সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। নিজের মনকেই তো সে সবসময় স্বচ্ছ করে দেখতে পায় না। সাগ্নিকের দৃঢ় বিশ্বাস, সহানুভূতিসিক্ত আচরণ দেখলে, সমবেদনাভরা ব্যবহার পেলে, সহৃদয়তাময় আনুকূল্য পেলে এই সখিই আবার যে-কোনো শুভমুহূর্তে সম্পূর্ণ না-হলেও অন্তত আংশিক পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, সেই পুনর্জন্ম ওর মধ্যে এনে দেবে কে? তেমন কেউ কি ওর আছে?

সাগ্নিক এসব ভাবে, বোঝে। তাই দরদ-ভরা মন নিয়ে সে সখির সঙ্গে কথা বলে, ব্যবহার করে। আশ্চর্যের কথা, এই সখিও সেটা বুঝতে পারে। ব্রজেন ঘোষ বা অন্যরা ওকে যে-দৃষ্টিতে দেখেন, সাগ্নিক তা দেখে না, সে দেখে ভিন্নতর দৃষ্টিতে। বিনিময়ে এই অপরিণত আর জড়বুদ্ধি-

সম্পন্ন আধা-নর আধা-নারী সখিও সাগ্নিককে ভিন্নরূপে গ্রহণ করে, সে ওকে বিশ্বাস করে। হ্যাঁ, এই একটিমাত্র লোককেই সখি বিশ্বাস করে। এই একটিমাত্র লোকের কাছেই সখি সহজ সরল একজন মানুষ হয়ে ওঠে

কানার মা রান্নাঘরে চলে যাওয়ার পর সখির ভেতরের সেই সহজ সরল মানুষটি সাগ্নিকের আরো কাছাকাছি আসে। কানার মা-র সামনেও সে সাগ্নিকের সঙ্গে সহজ ভঙ্গিতেই কথা বলছিল, তবে এত সহজ হতে পারেনি। এতক্ষণ সে অকপটে মনের সব দরজা খুলতে পারছিল না। এবার খুলে দিয়েছে। হামরুল্লা কবে কবে টাকার জন্য এ-বাড়িতে এসেছে, ব্রজেন ঘোষ তাদের কবে কি বলেছেন, যতটুকু তার মনে ছিল, যতটুকু সে বুঝেছে, সবই সে সাগ্নিককে বলে গেল। এমনকি অনিল দোলুই বা গতকাল রাম মাইতিকে নিয়ে যে-নাটক হয়ে গেল, সেটাও সে সাগ্নিককে বলতে ভুলল না। সব শুনে সাগ্নিক পাথর হয়ে গেল।

রমেন ফিরল আরো অনেক পরে, রাত তখন আটটা হয়ে গেছে। হঠাৎ মাষ্টারমশাইকে দেখে সে যেন একটু সংকোচ বোধ করল। সাগ্নিক ওর দিকে তাকাল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই রমেন বলল, রাম মাইতির গদিঘরকে কাল চোর ঢুকছে, সোকথা চালাচালি হ'ল, মুই দাঁড়ে-দাঁড়ে শুনছি। রমেনের বক্তব্যের মধ্যে কৈফিয়তের সুর ছিল। দু'দিন বাদে তার পার্ট-টুয়ের টেস্ট-পরীক্ষা, মাষ্টারমশাই যদি জিজ্ঞেস করেন পরীক্ষার আগে পড়াশোনা না-করে আড্ডা দিয়ে চলেছ কেন, তাই বোধহয় এই কৈফিয়ত।

সাগ্নিক একটু হাসল, রমেনের পড়াশোনা প্রসঙ্গে কিচ্ছু বলল না। তবে সে তার ট্রান্সফার অর্ডারের কথাটা তুলল। সাগ্নিক আশ্চর্য হয়ে শুনল রমেনও সে-সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না। পোস্টম্যানের সঙ্গে এক সপ্তার মধ্যে তার দেখাই হয়নি। তবে ট্রান্সফার অর্ডার যে বাড়িতে দিয়ে যায়নি এ-সম্পর্কে সে নিশ্চিত।

রমেনের কথা শুনে সাগ্নিক পড়ল আর-এক চিন্তায়। চিঠিটা এখনো এল না কেন? পোস্টম্যানকে তো সে বলে রেখেছিল অর্ডারটি আসার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন এসে দিয়ে যায়। অথচ রমেন বলছে দিয়ে যায়নি। ব্যাপারটা তাহলে কি হতে পারে!

সাগ্নিক ভেবে দেখল তুটো ব্যাপার হতে পারে। এক, চিঠিটা হয়তো এখনো কালিয়াচক পোস্টাফিসে এসে পৌঁছয়নি। তুই, চিঠিটা পোস্টাফিসে এসে পৌঁছলেও পোস্টম্যানটি হয়তো জেনেছে সাগ্নিক এখানে নেই, তাই সে চিঠিটি ডেলিভারী দিতে আসেনি। নিজের হাতে জরুরী চিঠি বিলি করে কিছু বকশিশ আদায় করবার আশায় এরকম কখনো-সখনো করে থাকে ওরা। সাগ্নিক এসব ভাবল বটে, কিন্তু কোনো স্বচ্ছ ধারণায় আসতে পারল না। পোস্টম্যানের সঙ্গে কথা না-বললে সেটা বোঝাও যাবে না।

সাগ্নিক ভাবতে লাগল। ওদিকে রাতও বেড়ে চলল। সাগ্নিক ভাবে, রাত্তিরটা কোনোক্রমে এখানে কাটিয়ে সকালে পোস্টম্যানের সঙ্গে দেখা করে, ট্রান্সফার অর্ডারের খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর শিউলী গাঁ ছেড়ে চলে যাবে, না কি সে ফিরে যাবে এখন এই রাত্রেই? যদি সে এখনই ফিরে যায় তাহলে তো ট্রান্সফার-অর্ডারের খোঁজে কাল বা পরশু তাকে আবার আসতে হবে।

এই রাত্রে ফিরে যাবেই বা কি করে? যদি বাস না-পায়, যদি এখন ট্রেন না-থাকে, তাহলে তো আবার প্লাটফর্ম বা পথেঘাটে রাত কাটাতে হবে। তার ওপর রয়েছে আবার কানার মা এবং সখির বারংবার অনুরোধ। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে অবশেষে সে রাত্তিরটা শিউলী গাঁয়ে কাটিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে চলল নিজের ঘরের উদ্দেশে। এতক্ষণ সে ঘরে ঢোকেনি, বারান্দায় বসে ছিল, ঘরে ঢুকবেই না ভেবেছিল।

কানার মা কখন ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে গেছে। বিছানার দিকে তাকিয়ে সে বুঝল, কানার মা ওটাও ঝেড়ে রেখে গেছে পরিপাটি করে। সাগ্নিক জামা-কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে বসল আর আকাশ-

পাতাল ভেবে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর শীত ধরে যায়, সে বিছানায় শুয়ে লেপটা গায়ের ওপর টেনে দেয়। তারপর শুয়ে-শুয়ে ভাবনা, আর কিনারাহীন ভাবনা।

রাত যখন সাড়ে-ন'টা, সাগ্নিকের সমস্ত ভাবনা তুটি প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হ'ল। এক, আজ রাতে তার এখানে, এই শিউলী গাঁয়ে থেকে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা। তুই, আগামীকালের সকালে শিউলী গাঁয়ের মুখোমুখি হওয়া তার উচিত হবে কিনা। মুখোমুখি হতে সে পারবে তো!

সাগ্নিকের চিন্তা খণ্ডিত হয় কানার মা-র অনুপ্রবেশে। কানার মা দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, জায়গা করছি, খাতে আসগো ছ্যানা। খাওয়ার ইচ্ছা সাগ্নিকের ছিল না, তবু উঠে রান্নাঘরে গেল, খেতেও বসল। রমেনও পাশে বসে খাচ্ছিল। সে বলল, যাওয়ার সময় বাবা একটা কথা বলছে স্যার।

সাগ্নিক মুখ তুলে তাকাল।

রমেন আবার বলল, অরা না-ফেরা পর্যন্ত আপনি যাবেননি।

সাগ্নিকের প্রশ্ন, আমি যে আসব তা ওঁরা জানলেন কি করে?

রমেন বলল, জানতনি। বলছে আপনি যদি আসেন —

সাগ্নিক আর-কিছু বলল না, নীরবে খাওয়া শেষ করে আবার নিজের ঘরে ঢুকল। চেয়ারে বসে কাটাল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় আশ্রয় নিল লেপের মধ্যে।

লেপের তলায় শুয়ে-শুয়ে ভাবছে সাগ্নিক। রাতের বয়সও বাড়তে লাগল। সাগ্নিক শুয়ে-শুয়ে রমেনকে ঘুমোতে দেখল। গরু-বাছুরের তদারকি শেষ করে সখিও একসময় শুতে গেল, ঘুমিয়ে পড়ল। কানার মাও একসময় রান্নাঘরের যাবতীয় কাজ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল সদ্‌গোপ-পাড়া। এবং বোধহয় গোটা পৃথিবীও। নিজের ঘরে লেপের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে সাগ্নিক সবাইকে ঘুমোতে দেখল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না সে নিজে, ঘুম এল না তার।

শিউলী গাঁয়ে আজ তাকে আসতে হ'ল, রাত কাটাতেও হচ্ছে! যে-দিনটিকে অস্বীকার করবে বলে, যে-দিনটিতে শিউলী গাঁয়ে উপস্থিত

থাকবে না বলে সে নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই একত্রিশে ডিসেম্বর, বাংলা পনেরোই পৌষ আর সাঁওতালীতে গেলমোড়ে পুষ যে কখন তার অজ্ঞাতে ইংরেজি পাঁচই জানুআরি, বাংলা বিশে পৌষ আর সাঁওতালীতে বার গেল পুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল তা সে জানত না। জানলে অবশ্যই আজ সে শিউলী গাঁয়ে আসত না। তারিখ দুটো আলাদা হলে কি হবে, আসলে তো ওরা একই দিন, একই ক্ষণ। এই দিন আর ক্ষণটিকে নিয়ে ছিল যত দুশ্চিন্তা, যত ভয়। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সেইদিন আর সেইক্ষণেই তাকে শিউলী গাঁয়ে আসতে হ'ল, রাত কাটাতে হ'ল! এইভাবে তাকে সেই দুশ্চিন্তা আর ভয়ের মুখোমুখি হতে হ'ল!

সাগ্নিকের ঘুম আসে না। রাত বেড়েই চলল। তার চিন্তারা পাখা বিস্তার করে চলেছে। সে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়, ভাবে, একবার কাঁচারাস্তা থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাল্টায়। চৌকির নিচেয় রাখা গ্লাসে হাত রাখে জল খাবে বলে। আবার হাত সরিয়ে নেয়। ভাবে, কতদিনের বাসী জল কে জানে, খেয়ে কাজ নেই। এইভাবে রাত দশটা, এগারোটা, এগারোটা থেকে বারোটা। বারোটার পর একটা, দুটো। সাগ্নিকের ভাবনাগুলোর ছায়াও ক্রমশ বড় হতে হতে দৈত্যের আকার নিতে থাকে।

সাগ্নিক নিজেকে সেই একই প্রশ্ন করে, আগামীকালের শিউলী গাঁ-কে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? আগামীকাল যদি একটি বিশেষ দিন বিশেষক্ষণ হয়ই তাতে তোমার কি? আগামীকাল যদি এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে শিউলী গাঁয়ে আবির্ভূত হয়, সেজন্য তোমার এই দুশ্চিন্তা কেন? আগামীকালের সম্ভাব্য ইতিহাস সম্পর্কে তুমি রাত জেগে এত ভেবে চলেছ কেন? তুমি তো কবেই নির্বিকল্প জগতে চলে গেছ। তুমি তো এখন দমন-তুলসী-হামক সম্পর্কে, ব্রজেন ঘোষ সম্পর্কে, শিউলী গাঁ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার, নির্লিপ্ত। তাহলে তোমার এই রাত-জাগা কেন?

বড় রূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি হ'ল সাগ্নিক। ইংরেজি একত্রিশে ডিসেম্বর,

বাংলা পনেরোই পৌষ আর সাঁওতালীতে গেলমোড়ে পুষ যদি তার অজ্ঞাতে পাঁচই জানুআরি, বিশে পৌষ আর বার গেল পুষে পরিণত না হ'ত, তাহলে কি আজ তাকে এ-প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ত ? হয়তো হ'ত, হয়তো হ'ত না। কি হলে কি হ'ত, আর কি না হলে কি হ'ত না, সেকথা থাক। সরাসরি জবাব দাও সাগ্নিক।

সাগ্নিক সরাসরি এবং স্পষ্ট জবাবই দেবে। হ্যাঁ, স্পষ্ট এবং সত্য জবাব। এ-প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সে মিথ্যা বলবে কি করে? নিজের কাছে কি কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে ? না, এই একটি মাত্র জায়গা যেখানে হাজার চেষ্টায়ও মিথ্যা বলা যায় না। অতএব সাগ্নিকও আজ নিজের কাছে সত্য ঘোষণাই করবে। সাগ্নিক, তুমি কান পেতে শোনো, ইংরেজি পাঁচই জানুআরি, বাংলা বিশে পৌষ, সাঁওতালীতে বার গেল পুষের আগের রাত্রির গভীর অন্ধকারে মুখ রেখে সাগ্নিক তোমার কাছে সত্য ঘোষণা করছে।

ইংরেজি পাঁচই জানুআরি, বাংলা বিশে পৌষ আর সাঁওতালীতে বার গেল পুষের আগের রাত্রের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সাগ্নিক তার অস্তিত্বের কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে, একদিকে আমি নির্বিকার থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, অন্যদিকে শিউলী গাঁয়ে যা ঘটবার তার সবই ঘটে গেছে। নীরব থেকে আম সব দেখেছি, শুনেছি, ভেবেছি, বুঝেছি, জেনেছি। এর নাম কি নীরবতা, নির্লিপ্ততা, নির্বিকারত্ব ? এইভাবে নীরব থাকার কি মানে হয় ? আমার নীরবতায় আমিই জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছি।

এই হ'ল সাগ্নিকের নীরবতার স্বরূপ। সকলের ক্ষেত্রেই বোধহয় এমনিই হয়।

অথচ এই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়, এই চেতনাশূন্য যুক্তিহীন মস্তিষ্ক আর এই বিব্রত বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে সে সুখী হতে না-পারলেও ভেবেছিল খুশি হবে। এইভাবে খুশি থেকেই সে শিউলী গাঁ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য ট্রান্সফার-অর্ডারটি সে যথাসময়ে পেল না। তার দুর্ভাগ্য তাকে আগামীকালের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছে নাকি ?

সাগ্নিক আবার নিজেকে প্রশ্ন করে, এবার তুমি কি করবে? ওই আগতপ্রায় বিশেষ দিনের, বিশেষ ক্ষণের ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রাক্কালে তোমার ভূমিকা এখন কি হবে? ওই স্পন্দনশূন্য ক্ষত-বিক্ষত হৃদযন্ত্র নিয়ে, ওই অচৈতন্য মস্তিষ্ক-কোষ নিয়ে, ওই বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে, তুমি কি আগামী সূর্যোদয়ের আগেই শিউলী গাঁ ত্যাগ করবে, নাকি আগামী-কালের সূর্যোদয়কে এখানে থেকেই প্রত্যক্ষ করবে, মুখোমুখি হবে আগামী-কালের, আগামীকালের ইতিহাসের?

কঠিন প্রশ্ন। সাগ্নিকের জীবনের দুরূহতম প্রশ্নও বলা যায়। জীবনে কোনোদিনই তাকে এত জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি। অতি অল্প-বয়সে পিতৃহীন হয়ে অসহায়া-বিধবা মায়ের সন্তানরূপে যে-জীবনকে সে এতদিন বহন করে নিয়ে এসেছে সেটা ছিল ক্লেশ, যন্ত্রণা আর সংগ্রামে পূর্ণ। জটিল সমস্যার মিছিল দেখেছে সে নিজের জীবনের চার পাশে। ওর জীবনকে কেন্দ্র করে তারা একের পর এক আবর্ত রচনা করেছে। জীবনে বহুবার তাকে বহু কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু আজকের এ-প্রশ্ন আরো কঠিন, আরো জটিল।

ওই তো রাত্রের শেষ প্রহরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কো-কো ডাক শুরু করেছে মোরগরা। গাছে-গাছে দুটি-একটি রাতজাগা পাখির কলরব শোনা যাচ্ছে। টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তা দিয়ে কারা যেন মাঠ থেকে ধানের আঁটি মাথায় করে বয়ে নিতে শুরু করেছে। রাত্রের আয়ু ঢলে পড়ছে নতুন সূর্যোদয়, একটা নতুন সকালের দিকে।

কিন্তু সাগ্নিক তো এখনো তার প্রশ্নের কোনো উত্তর পায়নি। এখনো সে প্রশ্নজর্জর।

আগের প্রশ্নের উত্তর দিতে না-পারলে কি হবে, আকস্মিকভাবে সে নিজের উদ্দেশে আবার একটা প্রশ্ন ছুঁড়ল: আগামীকালের সূর্যো-দয়কে যদি এখানে থেকেই প্রত্যক্ষ করতে হয়, আগামীকালের ঐতি-হাসিক মুহূর্তের মুখোমুখি হয়ে যদি ওকে দাঁড়াতেই হয়, তাহলে এ-রাত কোন রাত? এ-রাত কি তারই প্রস্তুতিক্ষণ, প্রস্তুতিলগ্ন?

এবার রাত শেষ হচ্ছে। ওই তো মোরগদের দ্বিতীয় ডাকও শোনা যাচ্ছে। আদিবাসীপল্লী, মুসলমান-বস্তি আর সদগোপ-পাড়ার মোরগ-মুরগীরা একসাথে কো-কো শব্দে রাত্রির অবসান ঘোষণা করছে। প্রত্যুষের পাখিরা ঘুম-ভাঙানিয়া কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠছে। টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় শোনা যাচ্ছে মানুষের পথ-চলার নিয়মিত পদধ্বনি। ওই তো প্রতিদিনের মতো সখি উঠে গরু-বাছুরদের তদারকিতে লেগে পড়ল, কানার মা রান্নাঘরে তার দৈনন্দিন কর্মসূচি অনুসরণ করতে লেগে গেছে। সদ্‌গোপ-পাড়া জেগেছে, সবাই জেগেছে, জেগেছে শিউলী গাঁয়ের পৃথিবী।

রাতের আয়ু এবার সত্যি সত্যি শেষ হয়ে গেল।

॥ তে রো ॥

সাগ্নিক কোনো স্পষ্ট উত্তর পেল না, দিল না। রাত শেষ হয়ে গেল। পুব-আকাশে রক্তজবা রঙ নিয়ে আবির্ভূত হ'ল অন্ধকার-বিনাশী মহাসূর্য। দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয় পৃথিবী। শিউলী গাঁ-ও।

সাগ্নিক হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে একখানা চেয়ারে বসল। পরনে ধুতি-শার্ট, গায়ে চাদর, চুল অবিন্যস্ত, সারা শরীরে রাত্রি-জাগরণের ও দুশ্চিন্তার ক্লান্তি।

কানার মা চা নিয়ে এসে সাগ্নিকের পাশে দাঁড়াল। সাগ্নিক চায়ের কাপটা নিল তার হাত থেকে। রমেন এই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এসে একেবারে টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় নেমে গেল। ওকে দেখে সাগ্নিক ভাবল, ওকে কি একবার কালিয়াচক পোস্টাফিসে পাঠাব? পরক্ষণেই আবার ভাবল, না, দরকার নেই। চায়ের কাপে সে চুমুক দিল।

রমেনকে দেখতে-দেখতে কানার মা বলল, বাবু অখন ব্যারায়ঠে,

ঘুরবে সৌ দুপুরে। লিখাপড়া কিচ্ছু করেঠেনি।

সাগ্নিক কিচ্ছু বলে না, নীরবে চা পান করে চলে।

বাড়িতে এখন আর কেউ নেই, শুধু কানার মা আর সাগ্নিক। কানার মা আরো একটু আন্তরিক হতে চায়। সাগ্নিককে দেখতে-দেখতে সে আন্তরিক সুরে বলল, রেতে ভাল ঘুম হয়নি বাবু?

সাগ্নিক এবারো কোনো উত্তর দিল না।

আজ এখানকে থাকঠো গো ছ্যানা?

সাগ্নিক নীরবে একটু হাসল শুধু, কিচ্ছু বলল না।

য্যাখনই যাও দুপুরে না-খায়ে কিন্তু যাতে পারবেনি ছ্যানা!

নীরব আর ম্লান হাসি দিয়ে সাগ্নিক সম্মতি জানাল।

তা অথন কি খাবে গো ছ্যানা? চারটা মুড়ি খাও।

এখন কিছু খাবো না কানার মা!

সৌটা হযনি ছ্যানা!

পরে খাবো, বলছি তো।

কানার মা আর-কিছু বলল না, নীরবে দাঁড়িয়ে সাগ্নিকের চা-খাওয়া দেখে যেতে থাকে। সাগ্নিক চা-খাওয়া শেষ করে কাপ-ডিস নামিয়ে রাখল। কানার মা সাগ্নিকের সব আচরণ লক্ষ্য করে যাচ্ছে। একসময় সে বলে ওঠে, একটুকু কথা বলব গো ছ্যানা?

বলো।

রেতে ঘুমোওনি কেনে?

ঘুমিয়েছি তো!

না।

ঘুমটা ভালো হয়নি, এই আর কি!

কানার মা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল, তারপর আবার বলল, লিজের শরীলটা শুধু-শুধু কেনে ক্ষয় করঠো বাবু?

অ্যাঁ! কানার মা-র কথা শুনে সাগ্নিক যেন আঁতকে ওঠে।

কানার মা আরো অন্তরঙ্গসুরে বলল, তোমার দুখটা মুই বুঝছি গো

ছ্যানা! কিন্তু তুমি কিচ্ছু করতে পারবেনি।

কানার মা! সাগ্নিক আবার চমকে ওঠে।

চমকাবারই কথা। রান্নাঘরের মধ্যে আবদ্ধ চিরনির্বাক কানার মা-র মুখে একথা শুনে সবারই চমকে ওঠার কথা। সাগ্নিক বিস্মিত দৃষ্টিতে কানার মা-র মুখের দিকে তাকাল।

কানার মা আবার বলল, দমনারে তুমি বাঁচে দিতে পারবেনি, কেউ পারবেনি। বজনা ঘোষরে তুমি আজও চিনছুনি ছ্যানা। সোটা যারে একবার ধরে, অরে আর ছাড়েনি, অরে কেউ বাঁচে দিতে পারেনি।

সাগ্নিক চূড়ান্ত বিস্ময় চোখে নিয়ে কানার মাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

কানার মা আর-কিছু না-বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সাগ্নিক ভাবে, হঠাৎ কানার মা-র মুখে একথা কেন? ব্রজেন ঘোষ সম্পর্কে কানার মা-র কোনো মন্তব্যই এর আগে সে তো শোনেনি, ভালোও না, মন্দও না। সেই কানার মা-র মুখে আজ এই কথা, ব্রজেন ঘোষ সম্পর্কে এই মূল্যায়ন কেন? তার মানে ব্রজেন ঘোষকে কানার মা চেনে, ভালোভাবেই চেনে। হয়তো তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই চিনেছে। সেটা কি?

কানার মা নিজের মুখে কোনোদিন কিছু না-বললেও, সাগ্নিক অনেকের মুখ থেকেই শুনেছে—শিউলী গাঁ বা আশপাশের বহু মানুষের মতো কানার মা-র ভাগ্যও নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন ব্রজেন ঘোষ। এমনকি আজকের কানার মা-র ওই রাঁধুনিবৃত্তি, পরিচারিকার কাজ ব্রজেন ঘোষেরই দান। আজ, এই মুহূর্তে ব্রজেন ঘোষ সম্পর্কে কানার মা যে কঠোর মন্তব্য করল, তার মধ্য দিয়ে কি কানার মা-র সেই ভাগ্যই কথা কয়ে উঠল? কানার মা-র করুণ জীবনের পশ্চাতে ব্রজেন ঘোষের যে কালো হাত লুকিয়ে ছিল, কানার মা-র মন্তব্য কি প্রকারান্তরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? নইলে কানার মা-র বুক ফেটে ওই হাহাকার-ভরা কথাগুলো বেরিয়ে এল কেন? সাগ্নিক কানার মা-র কথাই ভেবে চলল।

সাগ্নিক একবার ভাবল, কানার মাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়—কানার মা, ব্রজেন ঘোষকে তুমি চিনেছ?

কিন্তু সাগ্নিককে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে হ'ল না, কানার মা তার আগেই উত্তর দিল, বজনা ঘোষকে মুই ভালো করেই চিনছি গো ছ্যানা। অরে মুই চিনবনি তো কে চিনবে? কানার মা-র কণ্ঠে ক্ষোভ আর বেদনা স্পন্দিত হয়। সে বলে চলল, মুই যে আজ অর দোরকে দাসীবাঁদীর কাম করে মরিঠি, মোর ছ্যানাটা যে আজ অন্যের ঘরকে বাগালের কাম করে মরেঠে, কার তরে গো ছ্যানা, কার তরে? ওই অর তরে, অই বজনা ঘোষের তরে। বজনা ঘোষ মোকে লিজের বাড়ির দাসী করছে, মোর ছ্যানাকে অন্যের ঘরকে বাগাল করছে।

সাগ্নিক অপলক বিস্ময়ে কানার মাকে দেখল, মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনল।

কানার মা ওখানেই থামল না। এরপর সে যে-কাহিনী বলে গেল সে-কাহিনীর জন্ম হয়েছে এখানকার অনেক ঘরেই। হয়তো ভবিষ্যতেও হবে

কানার বাবার অবস্থা খুব খারাপ ছিল না, তবে লোকটা ছিল যেমনি মদ্যপ তেমনি আল্‌সে। কানার বাবার তেরো-চোদ্দ বিঘে জমি ছিল। কিন্তু আজ কানার মা-র বা কানাইয়ের এক ছটাকও নেই। সবটা জমিই আজ ব্রজেন ঘোষের দখলে। কানার বাবার জীবদ্দশাতে নিয়েছিল ছয় বিঘে, কানার বাবা নাকি নিজেই বিক্রি করেছিল।

সবচেয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছেন ব্রজেন ঘোষ কানার বাবা মারা যাওয়ার পর। কানার বাবা নাকি ব্রজেন ঘোষের কাছ থেকে মরবার আগে দু'হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, ধার নিয়েছিল বাকি আট বিঘে জমি ব্রজেন ঘোষের কাছে বাঁধা রেখে। কানার বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানার মা-র কাছ থেকেও সাদা-কাগজে টুকু নিয়ে বাকি আট বিঘে জমির বায়না নামা লিখে নিয়েছিল ব্রজেন ঘোষ। তখন থেকে সেই বাকি আট বিঘে জমিও ব্রজেন ঘোষের। ব্রজেন ঘোষ অবশ্য বলেছিলেন, কানার মা টাকাটা জোগাড় করতে পারলেই জমিটা ব্রজেন ঘোষ ফিরিয়ে দেবেন।

কানার মা-র পক্ষে দু'হাজার টাকার সংস্থান করা সম্ভব হয়নি, জমিটাও অতএব এতদিন ফিরে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। আর কোনোদিনই হয়তো উঠবে না।

কানার মা-র স্থির বিশ্বাস, ব্রজেন ঘোষ সেদিন মিথ্যা বলেছিলেন। কানার বাবা কিছুতেই ব্রজেন ঘোষের কাছ থেকে অত টাকা ধার করতে পারে না। এত টাকা ব্রজেন ঘোষ অমনিভাবে কাউকে ধার দেন নাকি? এত টাকা দূরে থাক, একটি পয়সাও উনি কাউকে ধার দেন না। কানার বাবা কেন, ব্রজেন ঘোষ নিজের বাবাকেও এক পয়সা ধার দিতেন না। কানার বাবার মতো এক মাতালকে ব্রজেন ঘোষ দু'হাজার টাকা ধার দিয়ে দিলেন তা আবার হয় নাকি? জমি বন্ধক রাখার কথা একদম বাজে কথা। লিখাপড়ি না-করে ব্রজেন ঘোষ টাকা দেনেওয়ালা লোক নন। কানার বাবা কোথাও টুকু দিয়ে যায়নি, কিচ্ছু লিখে দিয়ে যায়নি। তা যদি যেত তবে আর কানার মায়ের টিপসহি নেওয়ার কোনো দরকার হ'ত না! আসলে কানার বাপ ব্রজেন ঘোষের কাছ থেকে কোনো টাকা নেয়নি, ব্রজেন ঘোষ টাকা দেননি। ওভাবে ব্রজেন ঘোষ কাউকে টাকা দিতেন না, মাতালদের তো নয়ই। টিপ দেওয়ার আগে কানার মা তার এই বিশ্বাসের কথা অনেককে বলেছিল, বিচার চেয়েছিল। ওর কথা শুনে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল।

বিচার? ব্রজেন ঘোষের বিচার কে করবে? অবশেষে সে বাধ্য হ'ল টিপ দিতে। বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কেঁদে ফিরল। আজও কাঁদছে। কানার মা-ও।

কানার মা সেদিন শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে কানার কাকাদের ঘরে, বেনেবাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু তারা বেশি দিন এই অসহায়-সম্বলহীন আপদ পুষতে চাইল না। অগত্যা কানার মা ছেলের মুখ চেয়ে দাসীবাঁদীর কাজ বেছে নিল। এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে করতে অবশেষে একদিন সে তারই ভাগ্যনিয়ন্তা ব্রজেন ঘোষের বাড়িতে ঝিয়ের কাজে বহাল হ'ল।

আরো পরে যখন ঘোষ-দম্পতি কানার মা-র সততা আর নিষ্ঠা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন, পুরনো কথা কানার মা ভুলে গেছে বুঝতে পারলেন, তখন ওর পদোন্নতি হ'ল। সে হয়ে গেল রাঁধুনি। কানাইটা একটু বড় হতে না-হতেই ওকে বাগদী-বাড়িতে বাগালের কাজে বহাল করল।

কানাইটা যখন আরো-একটু বড় হ'ল, অর্থাৎ কাজকর্ম বেশ একটু করতে শিখল তখন ওর কাকারা বংশের মান-মর্যাদার কথা ভেবে কানাইকে বাগদী-বাড়ি থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজেদের বাড়িতেই বাগাল রাখল। কানার মা জানে ওসব বংশ আর মান-মর্যাদা সব বাজে কথা। আসলে কানাই যখন কাজ করার উপযুক্ত হতে লাগল, তখন তার চতুর কাকারা ওকে টেনে নিতে চাইল। তাই ওসব বাহানা। সে যা-ই হোক কানাই কাকাদের বাড়ির কাজে লাগল আর তখন থেকেই কানাই বেনেবাড়িতে একটানা কাজ করে চলেছে। কানাই তার মায়ের একমাত্র আশা। কানার মা সেই আশাকে বুকে নিয়ে বসে আছে। কানার বড় হওয়ার অপেক্ষায়। বড় হয়ে সে যদি কিছু করতে পারে! কথাগুলো বলতে বলতে কানার মা একসময় কেঁদেই ফেলল।

সাগ্নিক বিচলিত হ'ল ঠিকই, কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না, ক্লান্ত চোখে শুধু ওর কান্না দেখল।

কানার মা কান্না চাপতে-চাপতে বলল, তুমি কিছু মনে করনি ছ্যানা! কথাগুলান মনে আসছে তাই বলছি, কাউকে তো কোনোদিন বলতে পারিনি।

কানার মা ঠিকই বলেছে। সে কোনোদিন কারো কাছে এসব কথা বলেনি। সাগ্নিক যেটুকু শুনেছে তাও অন্যের মুখ থেকে। তার দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এসব সাগ্নিক শিউলী গাঁয়ে আসার অনেক আগের কাহিনী। তবে এই মুহূর্তে সাগ্নিক কানার মা-র মন স্পর্শ করতে পারছে বলে তার মনে হ'ল। কানার মা-র বুকের চাপা ব্যথাও সে উপলব্ধি করতে পারছে।

সাগ্নিকের নীরব ভাবনার মাঝে কানার মা নিজেকে স্বাভাবিক করার

চেষ্টা করছিল। এখন সে অনেকটাই সফল, চোখ দিয়ে এখন আর জল পড়ছে না। কানার মা বলল, এবার তোমার তরে চারটা মুড়ি লিয়ে আসিঠি—

এখন থাক কানার মা, পরে খাবো।

পরে আবার কখন খাবে? অইকথা বলনি ছ্যানা। অনেক বেলা অখন, রেতে তোমার ঘুম হয়নি, তারপর যদি না-খায়ে থাক শরীল খারাপ করে লিবে। তুমি বস, মুই আসিঠি। কানার মা রান্নাঘরে চলে গেল।

সাগ্নিক সেখানে বসে কানার মা-র অদৃষ্ট ভাবতে লাগল।

একটু পরে কানার মা ফিরে এল, হাতে মুড়ির ডিস আর জলের গ্লাস। সাগ্নিকের সামনের লম্বা বেঞ্চটার ওপর ডিস আর গ্লাস রেখে দিয়ে কানার মা বলল, খায়ে লাও বাবু।

সাগ্নিকের খাবারের প্রতি আদৌ কোনো রুচি নেই, তবুও কানার মাকে আহত করতে চায় না, বলল, রেখে যাও, আমি খেয়ে নেব।

হ্যাঁ, খায়ে লিবে, ফেলে রাখবেনি। মুই অখন রান্নাঘরকে যাইঠি। কোনার মা চলে গেল।

সাগ্নিক মুড়ির থালায় হাত দেয় না, তেমনি বসে থাকে চুপচাপ।

বেলা বেড়ে চলল। এমনি করেই বেড়ে চলল পাঁচই জানুআরি, বিশে পৌষ আর বার গেল পুষের বয়স।

একটু পরে সখি ফেরে মাঠ থেকে। সে আগে রান্নাঘরে ঢোকে, পান্তা খায়, তারপর বিড়ি টানতে টানতে সাগ্নিকের কাছে এসে দাঁড়ায়। সাগ্নিক নিরুজ্জ্বল হাসিমুখে ওর সঙ্গে কথা বলে। সাগ্নিকের কাছে এলে সখি আর বধির থাকে না, কথাও বলে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে। ওর লজ্জা? না, লজ্জাবোধ খুব-একটা নেই এখন। সাগ্নিকের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে সখি একবার ঘোমটা ঠিক করতে-করতে বলে ফেলল, মুই সাঁওতাল-পাড়া থাকতে আসছি মাষ্টারবাবু।

সাগ্নিক উৎসাহী হয়, উৎকর্ণ হয়।

সখি আবার বলল, বাখরচকের ভয়ে হামরুরা কাঁপে মরছে—

তাহলে টাকা ওরা পায়নি, তাই-না সখি ?

সখি ওপর নিচে ঘাড় নাড়ল।

সাগ্নিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। টাকা যে ওরা পায়নি বা পাবে না, একথা সবাই জানে। সাগ্নিকও। ব্রজেন ঘোষ যে ওদের টাকা পেতে দেবেন না, সাগ্নিক সেটাও জানে। তবুও তার বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

সাগ্নিক আর-কিছু বলল না, চুপ করে ভাবতে থাকে। সখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, শেষে একটু ইতস্তত করে বলল, একটুকু অদের পাড়াকে যাবেনি বাবু ?

সখির কথায় সাগ্নিক চমকে উঠল, যেমন উঠেছিল কিছুক্ষণ আগে কানার মা-র কথা শুনে। এই নারী-বেশী নর, এই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নরদেহের মানবিক চেতনাবোধের পরিচয়ে সাগ্নিক চমকে ওঠে। দমন আর তাদের সাঁওতাল-পল্লীর আগতপ্রায় দুর্যোগ এই নারী-বেশী সখির মনেও যে বেদনার সঞ্চার করেছে এটা দেখে সে বিস্মিত না-হয়ে পারে না। আবার মুগ্ধও হয়। দমনের দুর্ভাগ্যময় জীবনের প্রতি সখির এই মমত্ববোধ দেখে মুগ্ধ হওয়ারই তো কথা। সখির মুখের দিকে তাকিয়ে সাগ্নিক বলল, না সখি, আমি ওখানে যাব না।

সখি যেন হতাশ হ'ল।

সাগ্নিক সেটাও বুঝতে পারল, বলল, ওখানে গিয়ে কি হবে ? আমি তো কিছুই করতে পারব না, বরং—সাগ্নিক কথা শেষ করল না, চুপ করে গেল।

সখি হয়তো ব্যপারটা বুঝল, হয়তো বুঝল না। সে তেমনি হতাশায় বলল, মুই যাইঠিবাবু। গরুগুলানরে ব্যার করে লিতে হবে, গোহল ফিকতে হবে।

আচ্ছা এস।

সখি চলে গেল।

শিউলী গাঁয়ের সূর্য আরো ওপরে উঠেছে। ব্রজেন ঘোষের বারান্দায় বসে সাগ্নিক সেই উর্ধ্বগামী সূর্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারছে। এইভাবে ইংরেজি পাঁচই জানুআরি, বাংলা বিশে পৌষ আর বার গেল পুষের বয়স বাড়তে বাড়তে একসময় সে সাড়ে-নটায় গিয়ে পৌঁছয়।

সেই সময়ে টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তা ধরে পুতুল আর যুগলকে এক-সঙ্গে আসতে দেখা গেল। সাগ্নিক বসে-বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ওরাও দূর থেকে সাগ্নিককে দেখতে পেয়েছিল, তাই ইস্কুলে না-গিয়ে সরাসরি ব্রজেন ঘোষের বাড়িতেই ঢুকল ওরা।

সাগ্নিক জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, এস এস।

ওরা বারান্দায় উঠল।

সাগ্নিকের চেহারা দেখে পুতুল চিন্তিত হয়, সে বসল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সাগ্নিককে দেখছে।

যুগল চেয়ারে বসতে-বসতে বলল, আপনি কোখন ফিরছেন দাদা?

কাল সন্ধ্যায়। পুতুল, বোসো।

খবর সব ভালো? যুগলের প্রশ্ন।

হুঁ। ম্লান হাসল সাগ্নিক।

শরীল ঠিক থাকছে? পুনরায় যুগলের প্রশ্ন।

হ্যাঁ। পুতুল, তুমি বসলে না।

পুতুল এতক্ষণে বসল। বলল, রাত্রে একটুও ঘুমোননি বুঝি?

সাগ্নিক কিচ্ছু উত্তর দিল না, মুখের ওপর সেই ম্লান হাসিটুকুর ছায়া।

পুতুল সাগ্নিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে খানিকটা আপন মনে বলে ওঠে, ভুলটা আমারই—

কি? সাগ্নিক বুঝতে পারে না পুতুল কি বলতে চায়।

এখানকার ব্যাপারটা আমারই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

কিটা? যুগল অবাক হয়।

যুগলের কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে পুতুল আগের সুরেই বলতে থাকে, কিন্তু আমি তো জানতাম ট্রান্সফার অর্ডার পেলে তবেই আপনি

শিউলী গাঁয়ে ফিরবেন। আগেই এসে পড়বেন কে জানত!

আমি আগেই এসে পড়িনি, পুতুল।

তবে? ট্রান্সফার অর্ডার পেয়েছেন?

না, ওটা নিতেই আমি এসেছি।

এখানে?

ওঁরা ইস্কুলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কবে পাঠিয়েছেন?

দু'তারিখে।

আর আজ হ'ল—

পাঁচ তারিখ। যুগল পাদপূরণ করে।

বিশে পৌষ আর বার গেল পুষ। সাগ্নিক বলল।

আজও এল না কেন? পুতুলের গলায় প্রশ্নসূচক স্বগতোক্তি।

সাগ্নিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমি আগেই আসিনি, হঠাৎ এসে পড়িনি। আমি ট্রান্সফার অর্ডার হাতে পাব ভেবেই এখানে এসে ছিলাম। দমনের জীবনের ওই করুণ পরিণতি আমি নিজের চোখে দেখতে চাইনি পুতুল।

আবার সেইসব কথা! পুতুলের কণ্ঠে উদ্বেগ।

ব্রজেন ঘোষকেও এই নিষ্ঠুর খেলায় জয়ী হতে দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আমার ছিল না পুতুল।

সাগ্নিকদা।

সাগ্নিক গম্ভীর হয়ে আবার বলল, অবশ্য ওদের দিন পাল্টে আনার খবরটা আমি জানতাম না, জানলে কিছুতেই আসতাম না।

পুতুল ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করতে চায়, বলল, নিন, উঠে পড়ুন। নিজেও উঠে দাঁড়াল সে।

সাগ্নিক ওঠে না, বসে-বসেই বলল, কোথায়?

পুতুল বলল, ইস্কুলে চলুন, সময় হয়ে গেছে।

না।

না মানে, ইস্কুলে যাবেন না?

সাগ্নিক দৃঢ় হয়ে বলল, আমি তো যাবই না, অনুবোধ করব— তোমরাও যেয়ো না। আমি বলি কি, ইস্কুল আজ বন্ধ করে দাও।

পুতুল চুপ করে রইল, কিচ্ছু বলল না। কিন্তু যুগল কিছুটা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কেন দাদা?

সাগ্নিক একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, যুগল আজ ইংরেজি পাঁচই জানুআরি, বাংলা বিশে পৌষ আর সাঁওতালীতে বার গেল পুষ!

উয়াতে কি হ'ল দাদা?

আদিবাসী-পাড়ার ছেলেমেয়েদের এমনিতেই তোমরা আজ পাবে না।

কিন্তু ইস্কুল তো খুলে রাখে দিতে হবে দাদা!

না।

দাদা!

ইস্কুল খোলা রেখে ও-পাড়াব কলঙ্কের ইতিহাস নিয়ে এ-পাড়ার ছেলেমেয়েদের মুখর হতে দেওয়া যায় না যুগল। কথা বলতে-বলতে সাগ্নিক উত্তেজিত হয়। সে আবার বলল, না-না, সেটা ঠিক হবে না, সেটা আমি তোমাদের করতে দেব না যুগল।

যুগল এবার নির্বাক, আর-কিছু সে বলতে পারে না।

সাগ্নিক যে আদিবাসী-পাড়ার মানুষদের খুব ভালোবাসে, এ-তথ্য সকলেরই জানা। যুগলেরও অজানা নয়। যুগল বহুদিন তার বহু প্রমাণই পেয়েছে। সে-ভালোবাসার গভীরতাও সে অনেক দিনই অনুভব করেছে। কিন্তু সেই ভাগী যে পাঁচই জানুআরি, বিশে পৌষ আব বার গেল পুষে এসে সাগ্নিককে এতখানি আলোড়িত করবে, যুগল একটু আগেও সেটা উপলব্ধি করতে পারেনি। সেই উপলব্ধিই এই মুহূর্তে যুগলকে মুগ্ধ করল। অবাক-বিস্ময়ে শুধু সাগ্নিককে দেখতে লাগল।

সাগ্নিকের কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আগেব ভঙ্গিতেই বলে চলল, এই দিনটি আসবার আগে আমি শিউলী গাঁ ছেড়ে চলে যেতে পারলাম না, এই দিনটিতেই আবাব আমাকে শিউলী গাঁয়ে ফিরে

আসতে হ'ল, এটা আমাব কি দুর্ভাগ্য। সাগ্নিকের কণ্ঠে এখন তীব্র ক্ষোভ, তীব্র যন্ত্রণা!

পুতুল নীরবে এতক্ষণ সাগ্নিককে দেখছিল আর নানা কথা ভেবে যাচ্ছিল। সাগ্নিকের তাকানো, কথা বলা, আচরণ সব দেখে পুতুলের যেন একটু কেমন কেমন মনে হচ্ছে। এখন যেন তার একটু অপরিচিত মনে হচ্ছে সাগ্নিককে। যেন বহুদূর থেকে অপরিচিত সুরে কথা বলছে। সাগ্নিককে যেন সে ধরতে পারছে না, বুঝতে পারছে না, যেন অন্য-কিছু সাগ্নিকের ওপর ভর করেছে। সে যে কি ভাবছে, কি করতে চাইছে পুতুল যেন তার এক বর্ণও বুঝতে পারছে না।

পুতুল চেয়ারটাকে সাগ্নিকের আরো কাছে টেনে নিয়ে বসল, তারপর মরমী কণ্ঠে ডাকল, সাগ্নিকদা!

বলো পুতুল।

আপনি এমন করছেন কেন?

কেমন করছি?

আপনি বুঝতে পারছেন না?

পুতুল!

অতদূর থেকে কথা বলছেন কেন?

তুমি দুঃখ পাচ্ছ তা আমি জানি, পুতুল।

আপনি একটু স্বাভাবিক হন।

আমার আচরণ যদি তোমাকে দুঃখ দিয়ে থাকে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, পুতুল।

আবার সেই অস্বাভাবিকতা।

পুতুল!

বলুন।

পৃথিবীতে যদি আমার মায়ের পর কেউ আমার আপনজন থাকে, তবে সে তুমি!

এসব কথা কেন সাগ্নিকদা?

কোনোদিন তো এসব কথা বলিনি—

আজও থাক।

না, আমায় বলতে দাও পুতুল। আমার মায়ের পর আর কেউ যদি আমার মঙ্গলকামনা করে সে-ও তুমি। আমার মঙ্গলকামনায় সর্বদাই যে তুমি অস্থির হও, সেটাও আমি জানি পুতুল!

এসব কথা থাক, সাগ্নিকদা!

আমার জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য তুমি যে সব সময়ে একটা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছ সেটাও আমার অজানা নয়।

পুতুল অস্বস্তি বোধ করে। এসব কথা সে শুনতে চায় না। কোনোদিনই এসব কথা তাকে শুনতে হয়নি। পুতুল বুঝতে পারছে কথাগুলি বলছে এক অপরিচিত সাগ্নিক দত্ত, তার একান্ত অন্তরঙ্গ সাগ্নিক দত্ত কখনোই এ-ধরনের কথা বলে না। পুতুল অস্বস্তি চাপতে না-পেরে তবুও বলল, এসব কথা এখন নয় সাগ্নিকদা।

কিন্তু যার উদ্দেশে পুতুল কথাগুলি বলল তার কানে গেল না কিছুই। সে আপন মেজাজে আগের সুর ধরেই বলে চলেছে, তুমি যত কথা আমাকে বলেছ, যত উপদেশ আমাকে দিয়েছ, আমি জানি সবই সেই প্রদীপের শিখাকে আরো স্নিগ্ধ করেছে। বিশ্বাস করো পুতুল, তোমার সব উপদেশের মধ্যেই আমি যুক্তি খুঁজে পেতাম, সেই মতো চলারও আমি চেষ্টা করতাম।

আমি জানি, সাগ্নিকদা!

কিন্তু—

কি?

আমি স্বস্তি পাইনি।

তাও আমি জানি, সাগ্নিকদা!

বিশ্বাস করো পুতুল, তোমার উপদেশ যা আমার কাছে এক মহৎ-প্রেরণা, যা আমার বাঁচার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তাও আমাকে স্বস্তি দিতে পারেনি, শান্তি দিতে পারেনি, সুখ দিতে পারেনি।

কিন্তু আমার তো আর কিছু করার ছিল না।

আবার তুমি কি করবে? যা করেছ সেটাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর তো কিছু করার ছিল না, নেই।

পুতুলের অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে। সেই অস্বস্তি নিয়েই এবার সে বলল, এসব কথা এখন কেন উঠছে, সাগ্নিকদা?

উঠছে এই কারণে যে আজ তোমাকে আমি অন্য একটা কথা বলব।

অন্য কথা! কি কথা? আর তার জন্য এত ভূমিকাই বা কেন?

মানে, আমিই তোমাকে একটা অনুরোধ করব, সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুরোধ!

পুতুল উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, কি সেটা বলেই ফেলুন-না।

একটু সময় সাগ্নিক নীরব হয়ে রইল। যেন ধ্যানের জগতে প্রবেশ করল। পুতুল অপলকে ধ্যানমগ্ন সাগ্নিককে দেখছে। এইভাবে কাটল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় সাগ্নিক গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমি তোমাকে অনুরোধ করব বলছিলাম না?

হ্যাঁ। কি অনুরোধ বলুন, সাগ্নিকদা!

পুতুল, আজও তুমি অমনি করে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ো, উপদেশ দিয়ো, কিন্তু—

কি?

পুতুল, আমার অশান্ত মন আজ যদি তোমার কোনো উপদেশ না-মানতে পারে, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো, পুতুল!

এই আপনার অনুরোধ?

শুধু এইটুকুই, পুতুল!

সাগ্নিক ও পুতুলের বন্ধুত্ব সম্পর্কে যুগল ওয়াকিবহাল। তাই এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। পুতুল যে এই মুহূর্তে সাগ্নিককে বুঝতে পারছে না এবং তার জন্য যে পুতুল অসহায় বোধ করছে, সেটাও যুগল কিছুটা অনুমান করে। তাই সে পুতুলকে উদ্দেশ্য করে বলল, সকাল থাকতে দাদা কুছু খাচ্ছে কিনা খোঁজ লিন তো পুতুলদিদি!

পুতুল একটু নড়ে বসল। হয়তো কিছু-একটা করবার সুযোগ পেয়ে সে-ও স্বাভাবিক হতে চাইল। পুতুল কানার মাকে ডাকল।

কানার মা ছিল রান্নাঘরের বারান্দায়। পুতুলের ডাক শুনেই সে ছুটে এল। সখি কোথায় ছিল, সে-ও ছুটে এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ায়।

পুতুল কানার মাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মাষ্টারবাবু সকালে কি খেয়েছেন কানার মা ?

কানার মা ম্লান মুখে বলল, শুধু এক কাপ চা, আর কিচ্ছু লয়।

শুধু চা ?

মুড়িও দিছিনি দিদিমণি, কিন্তু বাবু খায়নি। অই তো মুড়িগুলান পড়ে থাকছে। মুড়ির থালা তখনো লম্বা বেঞ্চটার ওপর পড়ে ছিল। কানার মা হাত দিয়ে সেটি দেখিয়ে দেয়।

পুতুল মুড়ির থালার দিকে তাকিয়ে বলল, একি ছেলেমানুষী শুরু করেছেন ?

খেতে ইচ্ছে হয়নি পুতুল !

বাচ্চাদের মতো কথা !

খেতে ইচ্ছে না-হলে কি করব বলো।

তবুও খেতে হয়।

খাবো।

এখনো খাননি কেন ?

সখি আর কানার মাও এখন খেয়ে নেওয়ার জন্য সমস্বরে অনুরোধ জানাল।

ঘটনাটি ঘটল ঠিক এই সময়েই।

চোদ্দ-পনেরোজনের এক সাঁওতাল পুরুষ-জনতা টেস্ট-রিলিফের কাঁচা-রাস্তা ধরে সাঁওতাল-পল্লীর দিকে এগিয়ে যেতে-থাকে। তাদের প্রায় সবার হাতেই তীর-কাঠ, গুলতি, লাঠি ও আরও অন্য অস্ত্র। সাগ্নিক বসে বসেই ওদের দেখতে পায়, সবার আগে। সে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল, বারান্দা থেকে উঠোনে মেমে হাঁটতে হাঁটতে টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তার

ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ওর পেছনে-পেছনে পুতুল, যুগল, এমনকি সখি আর কানার মা-ও কাঁচারাস্তার ধারে গিয়ে সাগ্নিকের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাগ্নিক ওই সশস্ত্র জনতাকে দেখে আপন মনে প্রশ্ন করল, ওরা কারা ?

যুগল উত্তর দেয়, মনে হয়ঠে বাখরচক— !

আর ওরা ? শিরীষমোড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল সাগ্নিক।

পাকা-সড়কের দিকে এতক্ষণ কেউ তাকায়নি। সাগ্নিকের কথা শুনে সবাই সেদিকে তাকাল। দেখল, শিরীষমোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আরো-এক বৃহত্তর দল, তারাও সশস্ত্র। যুগল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, উয়ারাও বাখরচকের হয়ে মরঠে—।

বিস্মিত সকলেই। তবে পুতুলের বিস্ময়টা বোধহয় সবচেয়ে বেশি। তার বিস্ময়টা কতকটা আতঙ্কের মতো চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। পুতুল জিগ্যেস করল, ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন যুগল ?

যুগল বলল, উয়ারা উইখানকেই দাঁড়ে থাকবে, দরকার হলে এধারকে আসবে।

পুতুল আবার বলল, কিন্তু এতলোক কেন ?

ম্লান হেসে যুগল বলল, এসব আপনি বুঝবেননি, পুতুলদিদি।

ওরা তীর-কাঠ আর লাঠিসোটা নিয়ে এসেছে কেন ? পুতুল আবার জিগ্যেস করল।

যুগল কিছু বলবার আগেই হামরুদের পাড়া থেকে একটা আর্ত-চিৎকার ভেসে এল।

সাগ্নিকের অস্থিরতার কোনো মাত্রা নেই। সে কাঁচারাস্তার ধার থেকে সরে এল, উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে আবার নিজের চেয়ারে বসল। পুতুল, যুগল, সখি আর কানার মা-ও ওকে অনুসরণ করে ফিরে এল।

শিরীষমোড়ে সে-সময় অপেক্ষারত সেই সশস্ত্র জনতাও যুদ্ধং দেহি উল্লাস ও উত্তেজনায় সাঁওতাল-পল্লীর দিকে ধেয়ে আসছে। সবাই বিস্ময়ে ও আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

সদ্‌গোপ-পাড়ার কয়েকটি ছেলেমেয়ে বই-খাতাপত্র হাতে নিয়ে

উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ওরা ইস্কুলে গিয়েছিল। মাষ্টারমশাই-দিদিমণি-দের দেখতে না-পেয়ে খোঁজ নিতে এসেছে আজ ইস্কুল ছুটি কিনা! পুতুল জানিয়ে দেয়, ইস্কুল ছুটি। ফিরে গেল ওরা।

সাগ্নিকের কোনোদিকে লক্ষ্য নেই। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে-তাকিয়ে ওই ধাবমান সশস্ত্র জনতাকে দেখছিল। ওরা ব্রজেন ঘোষের বাড়ি অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। সাগ্নিক বিশেষভাবে অস্থির হয়ে যুগলকে লক্ষ্য করে বলল, যুগল!

বলুন দাদা! সাগ্নিকের ডাকে সাড়া দিল যুগল।

তোমাকে একটা কথা বলব যুগল?

বলুন-না দাদা।

মানে একটা অনুরোধ করব, রাখবে ভাই?

পুতুল বিস্মিত হয়ে সাগ্নিকের মুখের দিকে তাকাল।

যুগল বলল, কেনে রাখবনি? আপনি বলুন দাদা।

সাগ্নিক অনুনয় আর দৃঢ়তা মিশিয়ে বলল, দেখ যুগল, আমরা তো মানুষ! পাশে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে চলেছে, একবার বোধহয় আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত, একটু খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার!

দাদা!

আমার অনুরোধ, তুমি একবারটি ওখান থেকে ঘুরে এস ভাই।

পুতুলও যেন ওকে একটু শান্ত করার একটা সুযোগ পায়। যুগল কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই সে বলে ওঠে, আমিও তাই বলি, তুমি একবার হামরুর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জেনে এস ভাই।

সাগ্নিক গভীর মমতায় বলল, এই বিপদের দিনে একবার যদি ওদের খোঁজ-খবরটা আমরা নিতে না-পারি, লোকে আমাদের কি বলবে, মানুষ বলবে কি?

পুতুল অনুরোধের সুরে বলল, তুমি আর দেরি কোরো না যুগল, ঘুরে এস ভাই!

যুগল এতক্ষণ কিছুই বলেনি, সে মুগ্ধনেত্রে পর্যায়ক্রমে সাগ্নিক

আর পুতুলকে দেখছিল। সাগ্নিকের প্রতি সেমুগ্ধনেত্র রেখে যুগল এবার বলল, আপনি বলছেন য্যাখন মুই যাইঠি, তবে কোনো লাভ হবেনি, আপনি দেখে লিবেন, দাদা।

সাগ্নিক ব্যস্ত হয়ে বলল, লাভ-লোকসানের কথা এখন থাক যুগল, তুমি দেখেই এস।

যুগল উঠে দাঁড়ায় কিন্তু যায় না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সাগ্নিককে দেখতে থাকে।

সাগ্নিকও উঠে দাঁড়ায়, যুগলের কাঁধে হাত রেখে বলে, আর একটা কথা যুগল—। সে আর বলতে পারে না, গলাটা যেন কেঁপে ওঠে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। তারপর আবার বলতে শুরু করে। এবার তার কণ্ঠস্বর মরমী অথচ দৃঢ়তা মাখানো। সে বলে চলল, যুগল, আমার অবস্থা বা সামর্থ্য সম্পর্কে নিশ্চয় তোমার কিছুই অজানা নয়, পুতুলের সামর্থ্যও তুমি বুঝতে পারো, তোমার নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতা তো তুমি নিজেই জানো। সাগ্নিক একটু-ক্ষণের জন্য থামল।

যুগল প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চোখে সাগ্নিকের দিকে তাকিয়ে আছে।

সাগ্নিক এর পর কি বলে সে-কথা শোনার আগ্রহে পুতুলও সাগ্নিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাগ্নিক আবার বলতে থাকে—অর্থাৎ আমাদের কারো অবস্থাই এমন নয় যে আমরা ইচ্ছা করলেই একটা-কিছু করে ফেলতে পারি। কিন্তু যুগল, বেচারা দমন যে আমাদের চেয়েও হতভাগ্য! শুধু আমাদের চেয়েই বা বলি কেন, ওর চেয়ে দুঃখী মানুষ এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে বোধ করি আর একটাও নেই। সাগ্নিকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়, তবুও সে বলে চলল, ওর জন্য যদি কিছু করা যায় তুমি সেই চেষ্টা করে এস ভাই। যুগলের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সাগ্নিক বলল, আমার এই একান্ত অনুরোধটুকু তুমি রাখো ভাই।

পুতুলও আন্তরিকভাবে বলল, আমিও তোমাকে সেই অনুরোধ করছি

যুগল। দমনকে উদ্ধার করার একটা উপায় তুমি বার করো ভাই।

যুগল অবাক অথচ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখতে লাগল।

সাগ্নিক একই ভঙ্গিতে বলে চলল, তুমি যে ব্যবস্থা নেবে, যা করে আসবে, আমি তাই মেনে নেব যুগল। তুমি যা আমাকে দিতে বলবে আমি তাই দেব, আমার যা আছে সব দেব, সর্বস্ব দেব, আমি কথা দিচ্ছি যুগল!

পুতুল বলল, তুমি যা দিতে বলবে আমিও তাই দেব। তুমি দমনকে বাঁচাও ভাই।

যুগলের ঠোঁট নড়ে উঠল। সে বলল, মোদের সমাজকে তো আপনারা জানেননি দাদা—। কোনো কুছু করার সুযোগ আর থাকেঠে কিনা মুই অখনই বলতে লারিঠি। তবে উয়াদের প্রতি আপনাদের ভাগীর কথা মনে রাখে, আপনাদের সম্মান রাখবার তরে মুই চিষ্টা করব। সাগ্নিকের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর ওদের দু'জনের প্রতি গভীর মমতায় যুগল টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তায় নেমে গেল।

সাগ্নিক ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

পুতুল ওর আরো কাছে সরে এসে বলল, যুগল যখন গেছে ব্যবস্থা একটা-কিছু হয়েই যাবে। এবার কিছু খেয়ে নিন আপনি।

সাগ্নিক নিরুত্তর।

পুতুল বলে, এভাবে চলে না সাগ্নিকদা, এবার কিছু খান।

সাগ্নিক তেমনিভাবে জবাব দেয়, খাবো পুতুল, নিশ্চয় খাবো।

পুতুল বলল, কানার মাকে তাহলে খাবার দিতে বলি— ?

অই যে অইখানকে মুড়ি আছে দিদিমণি। মুড়ির থালা দেখিয়ে দিয়ে কথা বলল এক কোণে-দাঁড়িয়ে-থাকা সখি।

কানার মা বলে ওঠে, অইগুলান আর খায়ে কাজ লেই দিদিমণি, মুই লতুন করে লিয়ে আসিঠি।

সাগ্নিক বাধা দিয়ে বলে, থাক কানার মা, দুপুরে রান্না হয়ে গেলে একেবারে ভাত খেয়ে নেব। তুমি বরং আমাদের জন্য একটু চা করে নিয়ে

এসো কানার মা!

হঠাৎ সাইকেলের ক্রিং-ক্রিং শব্দ শুনে ওরা সচকিত হ'ল। পরক্ষণেই সাইকেল-সহ কালিয়াচকের পোস্টম্যান এসে দাঁড়াল উঠোনে। এবং বারান্দায় উঠতে উঠতে বলল, মাষ্টারমশাইয়ের চিঠি আছে। একখানা চেয়ার দখল করে হাসিমুখে সাগ্নিকের উদ্দেশে পিয়ন আবার বলল, বোধ-হয় আপনার ট্রান্সফার অর্ডার, মাষ্টারমশাই!

সাগ্নিক নির্বিকারচিত্তে চিঠিটি হাতে নেয়, খোলে, পড়ে এবং হস্তান্তরিত করে পুতুলের হাতে। পুতুল আগ্রহভরে চিঠিটি পড়তে থাকে।

পোস্টম্যান অবাক হয়ে বসে থাকে। বসে-বসে ভাবতে থাকে চিঠিটির জন্য আগে সাগ্নিকের মধ্যে যে আবেগ-অধীরতা-আগ্রহ দেখেছিল, চিঠিটি পাওয়ার পর তার কিছুই ওর আচরণে দেখতে পেল না। সে ভেবে এসেছিল, চিঠিটি পেয়ে মাষ্টারমশাই খুব খুশি হবেন, আর চা-সহযোগে কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করা যাবে। কিন্তু এরকম নিস্পৃহ লোকের সঙ্গে কি কোনো গল্প হয়! তবুও সে কথা শুরু করে—বাড়ির কাউকে দেখিঠিনি তো?

পুতুল বলল, বাড়ি নেই।

কাই গেছে?

পুতুল আবার বলল, মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন।

পোস্টম্যান আবার চুপ করে যায়। পুতুল চিঠিটি সাগ্নিকের হাতে দেয়। সাগ্নিক তেমনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ওটি পকেটে পুরে রাখে। পোস্টম্যান সাগ্নিকের এই নিস্পৃহতা আবার লক্ষ্য করে বলল, আপনার শরীল খারাপ লয় তো মাষ্টারমশাই?

সাগ্নিক ঘাড় নেড়ে জানায়, না।

তবে কোনো খারাপ খবর কিছু?

সাগ্নিক ওই একই ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল।

পিয়ন চলে যেতেই পুতুল বলল, ওর সঙ্গে একটু ভালোভাবে কথা বললেন না?

সাগ্নিক নির্বিকার, গম্ভীর এবং নীরব হয়েই বসে রইল।

পুতুল কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হ'ল না, তার আগেই হামরুদের পাড়া থেকে একটা হট্টগোল ভেসে আসছে। সাগ্নিক উৎকর্ণ হ'ল। পুতুলও। ওরা দু'জনেই নীরবে কানখাড়া করে আছে। হট্টগোলটা কিছুক্ষণ পরে আর শোনা গেল না।

পুতুল সাগ্নিকের মুখে চোখ রেখে বলল, এবার আপনি স্বাভাবিক হতে পারছেন না কেন? ট্রান্সফার অর্ডার তো এসে গেছে, এখন আর ভাববার কি আছে?

পুতুল!

বলুন!

ব্যাপারটা তো আমার ট্রান্সফার নয়। দমনও নয়।

তবে কি ব্রজেন ঘোষ?

হয়তো ব্রজেন ঘোষও না।

তবে?

আমি ঠিক জানি না পুতুল।

সাগ্নিক আবার এক অপরিচিত জগতে চলে যায়। পুতুলও আবার আহত বোধ করে, অসহায় বোধ করে। সাগ্নিকের ওই শেষের কথাটিই পুতুলকে বেশি করে ব্যথাহত করল। পুতুলের মনে হয়, সাগ্নিক বোধহয় সত্যি সত্যি তার নিজের কাছেও এখন স্পষ্ট নয়। তবে এটা ঠিক, মনে মনে সাগ্নিক এই মুহূর্তে অনেক পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, মরুভূমি-বনভূমি এবং চড়াই-উতরাই পার হচ্ছে। কে জানে সব পার হয়ে সে কোনো সবুজ উপদ্বীপে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে কিনা! আহত হয়েও পুতুল এসব কথা ভাবল।

এই সময়ে দু'কাপ চা আর কিছু তেলেভাজা নিয়ে হাজির কানার মা। পুতুল চা আর খাবারের প্লেট ধরে নেয়। সে এক কাপ চা আর তেলেভাজার বাটি সাগ্নিককে ধরে দেয়। বলে, চা খান, তেলেভাজাও খেয়ে নিন।

সাগ্নিক চায়ের কাপ তুলে নেয়। পুতুলের তাগাদায় প্লেট থেকে তেলে-ভাজা নিয়েও খেতে থাকে। পুতুল চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, মনে-মনে কি যে আপনি ভেবে চলেছেন, আমি তা বুঝতে পারছি না।

এমন-কিছু তো ভাবছি না!

ভাবছেন না?

বিশ্বাস করো, কিছু না-ভাববার চেষ্টা করছি।

তবুও তো ভেবে চলেছেন!

পুতুল!

আমরাও যে কষ্ট পেতে পারি সেটা একবার ভেবে দেখছেন না?

সাগ্নিক চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, বিশ্বাস করো পুতুল, তুমি কষ্ট পাও এমন কিছুই আমি করতে চাই না।

নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে আমাদের তাহলে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

প্রচ্ছন্ন রাখছি নিজেকে? আমি?

তা নয় তো কি?

ভুল, পুতুল, ভুল। সাগ্নিক ম্লান হাসল।

নিজেকে অস্পষ্ট করে রেখেছেন কেন?

বিশ্বাস করো পুতুল, তোমার কাছে আমি অস্পষ্ট থাকতে চাই না।

স্পষ্ট হচ্ছেন কোথায়?

কিভাবে সেটা হতে পারি তুমি বলে দাও। বলো, কিভাবে তুমি আমাকে দেখতে চাও।

আমি দেখতে চাই সুস্থ আর স্বাভাবিক সাগ্নিক দত্তকে।

পুতুল!

হ্যাঁ, আমি তাই দেখতে চাই।

সাগ্নিক এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর ম্লান অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, এবার তুমি তাই দেখতে পাবে পুতুল।

মানে! পুতুল যেন আঁতকে ওঠে। সে আবার সাগ্নিকের সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

সাগ্নিক আগের রেশ ধরেই বলে চলল, আমি কথা দিচ্ছি পুতুল সাগ্নিক দত্ত সত্যি সত্যি যা, এবার আমি তাই হবো, হতে চেষ্টা করব।

সাগ্নিকদা! পুতুলের কণ্ঠ চিরে নে একটা চাপা আর্তস্বর বেরিয়ে এল। সাগ্নিকের কথার মধ্যে যেন সে এক নতুন ও ভিন্ন সুর শুনতে পেল। এ-সুরও পুতুলের কাছে অস্বভাবিক আর অপরিচিত মনে হ'ল। সাগ্নিক যেন তার চেনা-জানার বাইরে চলে যাচ্ছে, পুতুলের মনে হ'ল। তাই তো তার গলা চিরে ওই করুণ স্বর বেরিয়ে আসছে। কিন্তু পুতুল আর-কিছু বলতে পারল না।

যুগল ফিরে এল। সাগ্নিক ওকে দেখে ব্যগ্র হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাগ্নিকের দেখাদেখি পুতুলও। যুগলের ম্লান মুখ দেখে ওরা শঙ্কিত হ'ল।

সাগ্নিক ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল, কি হ'ল যুগল ?

যুগল প্রথমে কোনো কথা বলল না।

পুতুল ওকে নীরব দেখে জিজ্ঞেস করল, কি খবর নিয়ে এলে যুগল ?

যুগল ম্লানমুখে বলল, খবর ভালো লয়।

কি হয়েছে বলো। সাগ্নিক আর ধৈর্য ধরতে পারছে না

কিচ্ছু হ'লনি দাদা !

যুগল !

কোনো উপায় লেই, দাদা !

কি হয়েছে তুমি বলো-না ! পুতুলও যেন অধৈর্য হয়।

বেহা ভাঙে গেল !

যুগল ! সাগ্নিক তীব্র আর্তনাদের সুরে বলল। পরক্ষণেই সে বসে পড়ে, যেন প্রচণ্ড এক আঘাতে সে রীতিমতো আহত।

বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কথা শুনে পুতুল, কানার মা, এমনকি সখিও আহত বোধ করে। কানার মা তো রীতিমতো হায় হায় করে ওঠে। সবাইকে শুনিয়ে যুগল বলল, অরা বেহা ভাঙে দিয়ে দমনরু হুরে লিয়ে যায়ঠে।

তুমি কিছু করতে পারলে না ? অতিকষ্টে বলতে পারল সাগ্নিক।

না।

কেন ?

অরা গনং জোগাড় করতে পারছেনি

সেটা তো আমরা জানি। পুতুল কথা বলল।

তুমি কি করে এলে ? সাগ্নিক আবার কথা বলল।

কুছু করা সম্ভব ছিলনি দাদা, মোকোরদোমা বহুৎ কঠিন।

কঠিন বলেই না তোমাকে পাঠানো হয়েছিল ?

দাদা।

কি ?

উটা সাত-আটশো টাকার বিপার—

আর ক'দিন পরেই তো আমরা মাইনে পেতাম—

পুতুল বলল, সবই না-হয় ওদের ধরে দিতাম!

যুগল বলল, মোদের তিনজনের একমাসের মাইনেতে কুছু হতনি!

সাগ্নিক বলল, তার পরের মাসেরও দিতাম!

পুতুল যোগ করল, দরকার হলে তার পরের মাসেরও দিতাম।

যুগল জবাব দেয়, সবই হ'ত সৌ বাকির বিপার, বাকি উয়ারা আর রাখতনি, এক পয়সাও লয়। সবই আজ দিতে হ'ত।

তুমি কথা দিলেও রাখত না যুগল ?

না।

আমি, পুতুল, তুমি—আমরা একসঙ্গে কথা দিলে ?

উয়াতেও উয়ারা আজ রাজী হতনি।

কেন ?

মোদের সামাজের এইসব বিপারগুলান আপনারা তো ঠিকঠাক জানেননি দাদা!

এর পর যুগল এক অনতিদীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে ওদের সমাজের এই বাকি-পণ-আদায় এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত রীতি-নীতি সাগ্নিক আর

পুতুলকে বুঝিয়ে বলতে লাগল।

গনং বাকি রাখা বা থাকা ওদের সমাজের এক স্বীকৃত প্রথা! খুব-সম্ভব সম্প্রদায়টি গরিব বলেই এই প্রথার প্রয়োগ খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে বাকি গনং আদায় দেওয়া বা নেওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু রীতি-নীতি, প্রচলিত ধ্যানধারণা বিবেচিত হয়।

বাকি গনং আদায়ের দিন বিয়ের আগেই নির্ধারিত হয়। তবে অনিবার্য কারণে গনং আদায়ের দিন পিছতে পারে, একাধিক দিনও পিছতে পারে। দুই গাঁয়ের মধ্যে যদি সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ থাকে, দুই গাঁয়ের হাড়ামের মধ্যে যদি পারস্পরিক বোঝাপড়া ঠিক থাকে তবে তো কথাই নেই, সহজেই দিন পিছিয়ে যেতে পারে। তা যদি না-ও থাকে, সেক্ষেত্রেও দিন পিছতে পারে। কিন্তু কোনোক্রমে যদি কন্যাপক্ষের মনে এই বিশ্বাস দানা বাঁধে যে পাত্রপক্ষ গনং আদায় দেওয়ার ব্যাপারে সৎ আচরণ করছে না বা গনং আদায় দিতে চায় না, সেক্ষেত্রে পাত্রীপক্ষ আর পাত্রপক্ষকে বিশ্বাস করতে পারে না, দিন পিছতেও খুব একটা রাজী হয় না। শিউলী গাঁ সম্পর্কে বাখরচকের মনে সেই অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে বসে গেছে।

তাছাড়া আর-একটা ব্যাপারও আছে। দিন পিছক আর নাই পিছক নির্ধারিত দিনে, কন্যার গাঁয়ের হাড়াম গনং নিতে এসে গেলে আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো উপায়ই নেই। সেদিন তাকে গনং বুঝিয়ে দিতেই হবে। যেমন করেই হোক সেদিন সে গনং বুঝে নিয়ে যাবেই। সহজে না-পেলে চেষ্টা করবে জোর করে কেড়ে নিতে। তাতেও যদি গনং বুঝে না-পায় তবে তারা বাপলা ভেঙে দিয়ে কুড়িকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেই। কেউ তাদের ঠেকাতে পারবে না। কারণ এর মধ্যে তখন মান-সম্মানের প্রশ্ন এসে যায়। কন্যাপক্ষ ওইসব করতে পারলেই নিজেদের সম্মানিত মনে করে। অন্যথায় সমাজে মাথা নত হয়ে গেল বলে মনে করে ওরা।

বাপলা ভেঙে দিয়ে কুড়িকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে পাত্রপক্ষের চূড়ান্ত অসম্মান হয় ঠিকই, তবে এখানেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। এর পরও

যদি পাত্রপক্ষ গনং যোগাড় করে নিয়ে কন্যাপক্ষের হাড়ামের কাছে যায়, তবে তারা আবার বহু ফিরে পায় এবং কুটুম্বিতাও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এরকম বহু ঘটনা ঘটে এদেরে সমাজে।

এবার বলুন দাদা, উয়ার পর কি আর বাখরচক আজ গনং না-লিয়ে ফিরে যাতে পারে? এই প্রশ্নের মাধ্যমে যুগল তার বিবৃতি শেষ করল।

সাগ্নিক যুগলের ওই বিবৃতি শুনল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। তবে অন্যান্য সবাই ঠিকভাবে শুনল। সব শুনে সাগ্নিকের দিকে তাকিয়ে পুতুল বলল, ঠিক আছে, আমরা টাকা যোগাড় করে দেব, আর সেই টাকা নিয়ে দু'-একদিনের মধ্যেই হামরু আর দমন বাখরচকে গিয়ে নতুন বউকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

কিন্তু হামরু আর দমনের এই অপমান? সাগ্নিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

পুতুল ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলল, তা আর কি করা যাবে!

সাগ্নিক দৃঢ় হতে চায়, তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে আবার বলল, কেন এই অপমান? কেন এমনটি হ'ল? কে এর জন্য দায়ী?

পুতুল আতঙ্কিত হয়। সাগ্নিককে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে; বলল, এসব এখন বলবেন না সাগ্নিকদা!

কিন্তু পুতুলের কথা ওর কানে গেল বলে মনে হয় না। সে আগের সুর ধরেই বলে চলল, ওদের চাঁতুবঙ্গা? ওদের সরলতা, যার অপর নাম নির্বুদ্ধিতা? নাকি অন্য কেউ, অন্য কোনো শক্তি? কে দায়ী?

সাগ্নিকের প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারল না, এমনকি পুতুলও না। তার আগেই টেস্ট-রিলিফের কাঁচারাস্তা থেকে বহু মানুষের কোলাহল ভেসে আসছে। যুগল সেদিকে তাকিয়ে বলল, অই যে দমনার লতুন বহুরে লিয়ে বাখরচক ফিরে যায়ঠে।

সবাই কাঁচারাস্তার দিকে তাকাল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সবাই দেখল দমনের বউকে মাঝখানে রেখে বাখরচকের সশস্ত্র জনতা মিছিল করে শিরীষমোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সাগ্নিক একপলকে একটুখানি দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল, চেয়ারের হাতলের ওপর মুখ রাখল সে।

পুতুল, যুগল, সখি আর কানার মা ওই বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখছে করুণ চোখে।

আরো কিছুক্ষণ পরে মিছিল যখন শিরীষমোড় ত্যাগ করে দক্ষিণ-দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল, পাকা-সড়কের দিকে তাকিয়ে আর যখন ওদের দেখা গেল না, তখন সবার লক্ষ্য গেল সাগ্নিকের প্রতি। পুতুল, যুগল ওর কাছে এগিয়ে গেল। পুতুল ডাকল, সাগ্নিকদা!

সাগ্নিক মাথা তুলল। সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল একটু আগে ওর চোখ দিয়ে জল ঝরেছে। তবে সকাল থেকে ওর মুখে ম্লানতার যে আবরণ জড়িয়ে ছিল তা যেন এখন অপসারিত। ওর চোখে-মুখে-চোয়ালে যেন দৃঢ়তার বলিরেখা ফুটে উঠছে। ওর কণ্ঠস্বরও যেন এখন অনেক স্বচ্ছ, বলিষ্ঠ, অথচ অংশত পরিচিত।

পুতুল বিস্মিত হয়, আবার তার ভালোও লাগে। সে আবার ডাকল, সাগ্নিকদা!

সাগ্নিক এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়, বলে, না।

পুতুল বুঝতে পারে না সাগ্নিক কি বলতে চাইছে। সে জিজ্ঞেস করল, কি সাগ্নিকদা?

সাগ্নিক এবার আরো স্পষ্ট করে বলল, না, এ চলতে পারে না, চলতে দেওয়া যায় না। সাগ্নিক যেন এক-পা এগিয়ে গেল।

আরো এগিয়ে চলল সাগ্নিক। বারান্দা থেকে নামার সিঁড়ির কাছে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে ব্রজেন ঘোষের ঘরের ভেতরে একবার দৃষ্টি ফেলল। পরক্ষণেই আবার অনুচ্চ সিঁড়ি দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। পুতুল, যুগল, এমনকি সখি আর কানার মা-ও ওর কাছে চলে এসেছে। কিন্তু ওদের দিকে সাগ্নিকের খুব একটা ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। সে আপন মনে এক-পা দু-পা পায়চারিও করে। তার পা-

দুটি যেন দৃঢ় আর দীর্ঘ মনে হয়। তার শরীরও যেন ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে।

সবকিছু ছাড়িয়ে সাগ্নিকের দীর্ঘ শরীরের দীর্ঘ মস্তক যেন আকাশ ছুঁতে চায়। সেই দীর্ঘ শরীর যেন গোটা বাড়িটার ওপর ছায়া ফেলেছে। সাগ্নিকের মেরুদণ্ড এখন সম্পূর্ণত ঋজু, চোয়াল এখন একদম শক্ত, কণ্ঠস্বর এখন স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ, উচ্চারণ স্পষ্ট এবং ক্ষুরধার। অদৃশ্য ব্রজেন ঘোষের উদ্দেশে সে বলে উঠল, শোনো ব্রজেন ঘোষ, তোমাকে খুশি করতে আমি শিউলী গাঁ ছেড়ে যাচ্ছি না। এই দেখ, আমি ছিঁড়ে ফেলছি আমার ট্রান্সফার অর্ডার।

পকেট থেকে ট্রান্সফার অর্ডারটি বার করে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল সাগ্নিক। সে আবারও বলল, ব্রজেন ঘোষ, এতদিন ছিলে তুমি প্রতিপক্ষহীন, প্রতিবাদবিহীন। এবার থেকে আমিই তোমার প্রতিপক্ষ, প্রতিবাদ। ওই হামরু, দমন, সখি, কানার মা-দের আর তুমি শোষণ করতে পারবে না। এখন থেকে আমরা সবাই তোমার প্রতিপক্ষ।